স্বয়ম্ভু শিব

দীপ্তিময় রায়

23.1
দীপ্তি/স্ব
B26869

সঞ্জয় প্রকাশন ।। ১৪এ টেমার লেন কলিকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ

গৃহদেবতা ৺হরিরামেশ্বরের উদ্দেশ্যে

ও শিবভক্তবৃন্দের কর কমলে।

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষের গ্রামে-গঞ্জে পাহাড়ে-পর্বতে বনে-প্রান্তরে মন্দিরে গৃহকোণে পরমেশ্বব শিব তাঁর আপন বৈভব নিয়ে বিরাজিত রয়েছেন। দেবাদিদেব মহাদেবের সত্তা হিসাবে আরাধিত হচ্ছেন তাঁব প্রতীকরূপ শিবলিঙ্গ সর্বত্র। শিবকে ঘিরে সুপ্রাচীন আদিকাল থেকেই নানা কাহিনী, কিম্বদন্তী আর অলৌকিক কথা ছড়িয়ে আছে আমাদের জন-কথায়, কাব্য-মালায় আর পুরাণ কথিকায়। শিব ঠাকুর পূজা-পার্বন উৎসবেব মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেব সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন মহিমময় পরমেশ্বর হিসাবেও আবার ঘরের মানুষ হিসাবেও। সত্যম্ ও সুন্দরম্, শান্তম্ ও অদ্বৈতমকে সংযুক্ত করে মহেশ্বর ভূমা চেতনার আলোকে যেমন আমাদের উদ্ভাসিত করছেন তেমনই অন্যদিকে কুসংস্কারের বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে, আচার-বিচারের সঙ্কীর্ণতার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সঙ্কোচনের মধ্যে শিব-ভাবনার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। অমঙ্গল থেকে উদ্ধারেব আকাঙ্খায় শিব পূজিত হচ্ছেন. বিপদ থেকে রক্ষার আকুলতায় শিব স্তুত হচ্ছেন আবার পরম মুক্তির আকাঙ্খায় শিবত্ব লাভ মানসে শিব আরাধিত হচ্ছেন। শিব-ভাবনাকে নিতান্ত অন্ধ সংস্কার মনে করে কোথাও বা অহমিকার মিথ্যা আস্ফালনের বুদবুদ্ উত্থিত হয়ে শিবকে অস্বীকার করাও হচ্ছে।

'শিব' ধারণা যদি কেবলমাত্র একটা সংস্কারই হয় তবে আবাহমানকাল ধরে এই সংস্কারকে আমরা কি জন্য পূজা করে আসছি? অনাদিকাল ধরে শিব-ভাবনা যে ভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে হিন্দুধর্মে আর অন্য কোন দেবতার ক্ষেত্রে তা হয়নি।

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষের গ্রামে-গঞ্জে পাহাড়ে-পর্বতে বনে-প্রান্তরে মন্দিরে গৃহকোণে পরমেশ্বর শিব তাঁর আপন বৈভব নিয়ে বিরাজিত রয়েছেন। দেবাদিদেব মহাদেবের সত্তা হিসাবে আরাধিত হচ্ছেন তাঁর প্রতীকরূপ শিবলিঙ্গ সর্বত্র। শিবকে ঘিরে সুপ্রাচীন আদিকাল থেকেই নানা কাহিনী, কিম্বদন্তী আর অলৌকিক কথা ছড়িয়ে আছে আমাদের জন-কথায়, কাব্য-মালায় আর পুরাণ কথিকায়। শিব ঠাকুর পূজা-পার্বন উৎসবের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন মহিমময় পরমেশ্বর হিসাবেও আবার ঘরের মানুষ হিসাবেও। সত্যম্ ও সুন্দরম্, শান্তম্ ও অদ্বৈতমকে সংযুক্ত করে মহেশ্বর ভূমা-চেতনার আলোকে যেমন আমাদের উদ্ভাসিত করছেন তেমনই অন্যদিকে কুসংস্কারের বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে, আচার-বিচারের সঙ্কীর্ণতার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সঙ্কোচনের মধ্যে শিব-ভাবনার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। অমঙ্গল থেকে উদ্ধারের আকাঙ্খায় শিব পূজিত হচ্ছেন, বিপদ থেকে রক্ষার আকুলতায় শিব স্তুত হচ্ছেন আবার পরম মুক্তির আকাঙ্খায় শিবত্ব লাভ মানসে শিব আরাধিত হচ্ছেন। শিব-ভাবনাকে নিতান্ত অন্ধ সংস্কার মনে করে কোথাও বা অহমিকার মিথ্যা আস্ফালনের বুদ্বুদ্ উত্থিত হয়ে শিবকে অস্বীকার করাও হচ্ছে।

'শিব' ধারণা যদি কেবলমাত্র একটা সংস্কারই হয় তবে আবাহমানকাল ধরে এই সংস্কারকে আমরা কি জন্য পূজা করে আসছি? অনাদিকাল ধরে শিব-ভাবনা যে ভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে হিন্দুধর্মে আর অন্য কোন দেবতার ক্ষেত্রে তা হয়নি।

স্বয়ম্ভু শিব কিভাবে কখন মানুষের বোধে আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের সে ইতিহাস জানা নেই। সৃষ্টির ঊষাকাল থেকেই মানবের মনে জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতির সঙ্গে জাগরিত শক্তি চেতনার আলোক ধারায় পরমেশ্বরের ভাবনা মূর্ত হয়েছিল আর তারই পথ ধরে শিব-ভাবনা উদ্ভাসিত হয়েছে।

আমাদের এই চিন্তাকেও হয়ত একেবারে অলীক বলে ফেলে দেওয়া যায় না যে সুপ্রাচীন আদিম যুগে জগৎ কল্যাণের জন্য আবির্ভূত কোন অতি মানস সত্তা সম্ভবত নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে শিবরূপ পরিগ্রহ করেছেন।

হিন্দুধর্মে শিব-ভাবনার ধারাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জাগতিক বিভিন্ন শক্তির বিকাশ, জন্ম-জীবন-মৃত্যু রহস্য, প্রকৃতির রূপ-রূপান্তর মানব মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা জাগাল তখনই শিব-ভাবনার সূত্রপাতও হয়েছিল। শিব-কল্পনা হয়ত বেদের অনেক আগের কালের হয়তবা আর্যেতর যে সভ্যতা বৈদিক যুগের আগে যখন ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল সে যুগের। বৈদিক যুগে মহাশক্তির ক্রমবিকাশ প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তির মধ্যে উপলব্ধ হয়েছে তারই পরিণতিতে বহুদেবতাবাদ, সর্বেশ্বরবাদ। অতি দেবতাবাদ, একেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের উদ্ভব। এই উপলব্ধিই রূপ দিয়েছে রুদ্র দেবতার ভাবনাকে যিনি সূর্যের প্রচণ্ড তেজের মধ্যে, প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। কিম্বা শৈব মতাবলম্বী অ-নার্য কোন জাতি বা অ-নার্য দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য জাতি বা তাদের দেবতাদের বিরোধে শিববীর্যের প্রচণ্ডতায় হার মেনে তাঁকে রুদ্ররূপে কল্পনা করেছে আর্যরা। অথবা বৈদিক শিব অনুগামী নিবৃত্তি মার্গীদের সঙ্গে প্রবৃত্তিমার্গীদের বিরোধে শিব প্রভাবে প্রবৃত্তিমার্গীরা নত হওয়ায় হয়ত শিব রুদ্ররূপে কল্পিত।

প্রকৃতির শান্ত রূপ প্রত্যক্ষ করে একটা মঙ্গলের বা কল্যাণের চিন্তাও জন্ম নিল মানুষের মনে। হয়ত এইভাবে রুদ্র হলেন মঙ্গল বিধায়ক শিব। শিব সংহারের দেবতা হিসাবেই উপলব্ধ ছিলেন, মঙ্গল চেতনাও তাই তাঁকে কেন্দ্র করে জাগল।

তারপর বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ সন্ধিক্ষণে পরমেশ্বরের তিনটি বিশেষ অভিব্যক্ত রূপ অনুভূত হল ; ব্রহ্মা—সৃজন দেবতা, বিষ্ণু—পালন দেবতা ও মহেশ্বর—সংহার দেবতা। জগৎলীলায় একই ঈশ্বরের এই তিন অভিব্যক্ত রূপ। মহেশ্বর অর্থাৎ শিব হলেন বিভেদের ও বহুত্বের সংহারক। জগৎলীলায় ঈশ্বর বহু হয়েছেন এক হবেন বলে, এই একত্বে আনায় মহান কাজ শিবের। তাই তিনি মহেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব। কিন্তু একই মহান

ঈশ্বরের তিন বিভিন্ন সত্তা ক্রমে শিবে আরোপিত হল এবং শিব পরমেশ্বর রূপে প্রতিভাত হলেন। শিব অনুগামী ঋষিকুল প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের ধ্যানের মধ্যে শিব-দর্শন করলেন—শিব যিনি মঙ্গল বিধায়ক সর্বশক্তিমান ভগবান, বিশ্ব নিয়ন্তা বিশ্বভূপ। জগতের মধ্যে তিনি ওতঃপ্রোত, জগতই তাঁর অবয়ব। শিব অনুগামীরা নিবৃত্তিমার্গীও সংস্কার মুক্ত ছিলেন। প্রবৃত্তিমার্গীদের সঙ্গে স্বভাবতই তাদের মতের অমিল হয় ও বিরোধ বাধে। কিন্তু শিব প্রভাবে বৈদিক প্রবৃত্তিমার্গীরাও শিববাদী হল। আর তার সঙ্গে শিব ভাবনারও ঘটল পরিবর্তন।

পৌরাণিক যুগে মহাদেব মূর্তি পূজা ও তাঁর প্রতীক শিব-লিঙ্গের উপাসনার দ্বারা আরাধিত হতে লাগলেন। সত্যম্ সুন্দরম্রূপে মানব কল্যাণের জন্য সর্বত্র তাঁর প্রচার হতে লাগল। লিঙ্গায়েৎ শৈব সম্প্রদায় তাঁদের ধ্যানলব্ধ মূর্তি শিবলিঙ্গের আরাধনা ও প্রচার করলেন। জগন্নিবাস শিব স্বয়ং বিভিন্নরূপে বিভিন্নভাবে জগৎ কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হলেন তাঁর লীলা সম্পাদন মানসে। শৈব ধর্মের সৃষ্টি হল যেটি হিন্দুধর্মের প্রধানতম শাখা। শিববাদীরা দেশের সবত্র শিবের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করলেন। শিব ভাবনার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির সঙ্গে কত লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি হল ভক্তির ও জ্যোতির্ময় সত্যোপলব্ধির আঙ্গিনায়। শিবের শক্তির কল্পনা করা হল জগজননী মহামায়ারূপে—যিনি পরমাপ্রকৃতি পার্বতী। শিব পরমব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়রূপে স্থিত রয়েছেন, শক্তি তাঁরই লীলাচঞ্চল রূপ। মানুষের ধারণায় দিগন্ত আরও প্রসারিত করে উপলব্ধ হল অর্ধনারীশ্বর রূপ। শিব অদ্বয়তত্ত্বের প্রতীক আর উমা তাঁর শক্তির প্রতীক। ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ হলেও, ব্রহ্মনাম রূপাতীত। কিন্তু মন বুদ্ধির অতীত হলেও তাঁকে সাকার ও তাঁর শক্তিকে পৃথক ভাবে পার্বতীরূপে কল্পনা করবার আসল কারণ হল যে, এরূপ না করলে আমরা প্রায় সবাই সেই অদ্বয়তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে অপারক হব। আমাদের ধারণার অবলম্বন চাই এবং সেটাই নামরূপ বিশিষ্ট শিবমূর্তি।

এরূপ কোন অবলম্বনের মধ্য দিয়ে মনকে ঈশ্বরের রূপ ভাবনায় একাগ্র করতে পারলেই সেই তৈরী শুদ্ধ মনে পূর্ণরূপে সত্য বা পরমব্রহ্ম প্রকাশিত হন। আর তখনই উপলব্ধ হয় শিব

শক্তির অর্থ ও শিবশক্তির অভেদাত্ব। সেই আবাঙ্‌মনস গোচর ঈশ্বরকে আমাদের মনের নাগালে এনে দিয়েছে অ-রূপের এই সকল রূপ কল্পনাগুলি যা তাঁরই অভিলাষে সাধকের ধ্যান লব্ধ বিগ্রহ। বিভিন্ন শাস্ত্রে এগুলি পাওয়া গেলেও আসলে এই রূপ কল্পনা তাঁরই। আমাদের ঈশ্বর লাভ করাবার জন্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই শিবের এই রূপ গ্রহণ। এ তাঁরই লীলা বিলাস।

শৈবধর্মের প্রভাবের জন্য আদিম অন্যান্য বহু ধর্মমত ও তাদের রীতি পদ্ধতি পরিবর্তিত ও শিব গুণান্বিত হয়ে শৈবধর্মের অঙ্গীভূত হয়েছে।

হয়ত এ কারণেই শিবলিঙ্গকে অনেকে বলে থাকেন যে এ প্রতীক অনার্যদের ভাবনার মূর্ত রূপ।

ক্রমে চিন্ময় মহেশ্বর তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে শিব হয়ে গেলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে সাংসারিক জীবনের হাসি কান্নার অংশীদার হয়ে আমাদের গৃহ প্রাঙ্গণে নেমে এলেন। কারণ আমাদের ধারণার দিগন্তকে যতদূর কেন প্রসারিত করা যাক না, যতক্ষণ না আমরা মন ও বুদ্ধির পারে যেতে পারছি ততক্ষণ আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা করতে হলে তাঁকে মনুষ্যরূপে বা মানুষের মন বুঝতে পারে এমন কোন কাল্পনিকরূপে এবং বিশেষ করে মনুষ্য গুণবিশিষ্ট বলে ভাবা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

শিব আরাধনার নানা আচার বিচার—অজ্ঞানতা জনিত কুসংস্কার—স্বার্থপর কামনা ও সঙ্কীর্ণতা এ সকল অকাম্য বস্তুগুলি ভূমা চেতনার পাশে পাশে জেগে উঠেছে. কিন্তু সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ বা শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমের ধারণা নিয়েই জীবন-জগৎ চলছে। পরমদেবতার কাছ থেকে আমাদের এই চেতনা লাভ। জীবের মধ্যে শিবকে দেখা ও স্বয়ং শিব হওয়াই মানব জীবনের সাধনা তার সে পূজার ভক্তি উপাচার গ্রহণ করবার জন্য ভারতের সর্বত্র শিব নানারূপে নানা নামে বিরাজ করছেন।

শিবরূপে পরমেশ্বর ভারতীয় জীবনের পরম কাণ্ডারী। মানব জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব উজ্জ্বল হয়ে আছে—সংসার জীবন যাত্রায়—জীবনদায়িনী ঔষধিতে—নৃত্যগীতে—যোগে ধ্যানে—স্বরূপোলব্ধিতে—সর্বত্র।

ভারতীয় জাতিকে যুগে যুগে কত উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে

চলে আসতে হয়েছে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে। বর্তমান সময়েও তার বিশ্বাসের আকাশে দুর্যোগের শেষ নেই। কিন্তু দেবাদিদেব মহেশ এ জাতির চিত্তাসনে সর্বদা একই ভাবে সমাসীন। তাঁর আসন থেকে তাঁকে সরাবার কত চেষ্টা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মমত, বিভিন্ন মতবাদ, জড়-বিজ্ঞান, যুক্তি-তর্ক প্রভৃতি শিবের ধ্যানাসন একবার না একবার নাড়া দিয়ে গেছে এবং এখনও দিয়ে চলেছে কিন্তু নিবাত নিষ্কম্প শিব তেমনই আমাদের জীবনে অটল হয়ে আছেন।

শিবারাধনাকে পুতুল পূজা বলা হয়েছে, জ্ঞানহীনতা, অন্ধ কুসংস্কার ও প্রগতির পরিপন্থী বলা হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু তবু ভারতের হৃদয়াসন থেকে শিবকে কেউ সরাতে পারেনি—কখনও পারবে না। তিনি জগন্নিবাস শিব, জগৎ সংসার তাঁর লীলা ক্ষেত্র। শিবই আমাদের জনম-জীবন-মরণ বিধাতা। তাঁকে অস্বীকার করলেও তিনি আছেন।

ঘোরা-অঘোরা রূপের অভিব্যক্তি নিয়ে শান্তম-শিবম-অদ্বৈতমেব ব্যঞ্জনায় শিব ভুবনময়।

পরমেশ্বরকে কিভাবে শিবরূপে ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা জীবনে গ্রহণ করেছেন সেই সুন্দর স্বর্গীয় ছবি দেখে আমি অবাক হয়েছি। সত্য কত বিচিত্র আমাদের এই শিব-ভাবনা! শিবেরই করুণায় প্রাণের ভক্তি অর্ঘ তাঁর চরণে নিবেদন করে আমার শিব-কথা লেখার এই প্রয়াস। শিবের যেমন আদি নেই, অন্ত নেই তেমনই শিব কথারও শেষ নেই। তাঁরই সামান্য ভক্ত হয়ে তাঁর কথা লেখার সাহসী হয়েছি ভারতের সর্বত্র তাঁর প্রভাব রয়েছে তা প্রত্যক্ষ করে। এ বইটি কেবল ধর্ম কথা নয় বরং এটিকে বলা যেতে পারে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস ও কল্পকথার মিলিত ফসল। আমার উপলব্ধির আলোকে বিশ্বেশ্বর মহাদেবের কথা যতদূর সম্ভব বিশদ করে লেখনীর মুখে বলতে চেয়েছি। পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগলে কৃতার্থ হব। পরিশেষে বলতে চাই বইটির যেটুকু সৌন্দর্য তা সবই সেই সত্য-সুন্দর শিবেরই কৃপালব্ধ আর যা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি তা আমার অক্ষমতাজনিত।

ওঁ নমঃ শিবায়

—লেখক

রায়বাড়ি রায়পাড়া
গরিফা, ২৪ পরগণা
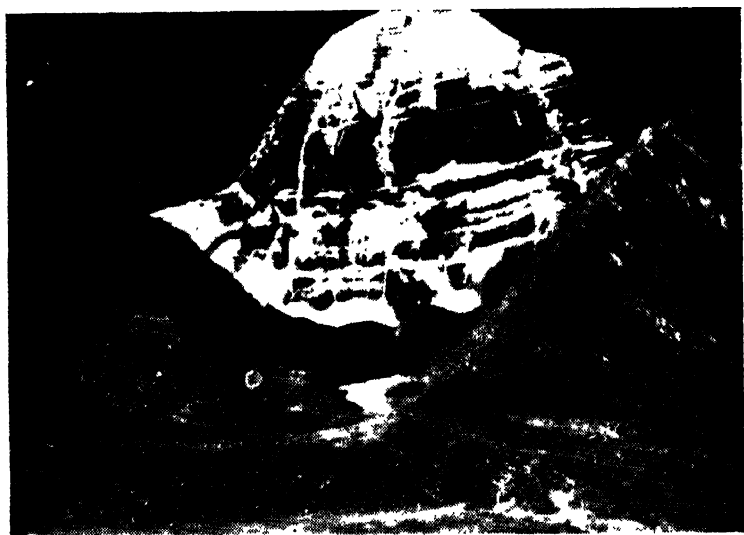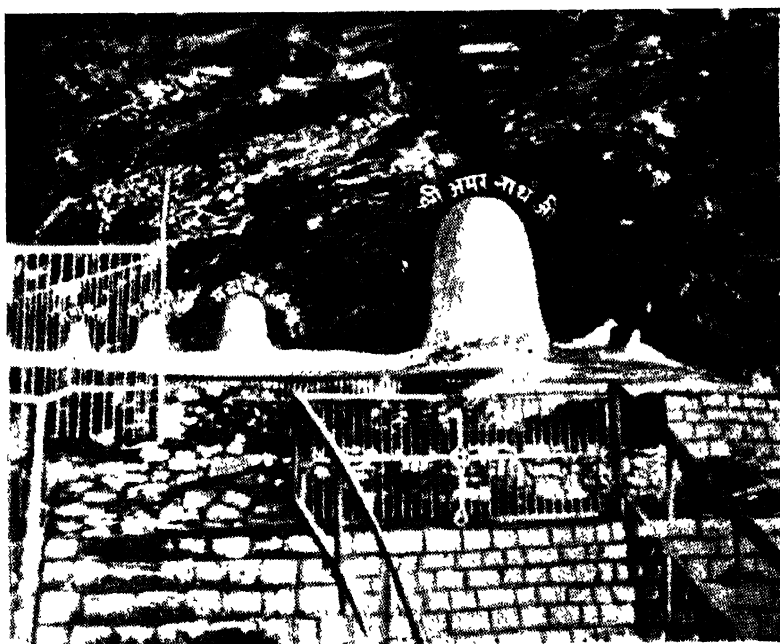
শ্রী কৈলাস

শ্রী অমরনাথ

কেদারনাথ মন্দির

গোপুরম—রামেশ্বর মন্দির

অর্ধনারীশ্বর মূর্তি —ঘারাপুরী গুহামন্দির

মহাদেবের মন্দির—খাজুরাহো

শ্রীনটরাজ

লিঙ্গরাজ মন্দির—ভুবনেশ্বর

শ্রী কেদারনাথ

তুঙ্গনাথ দেবের মন্দির

শ্রী তারকেশ্বর
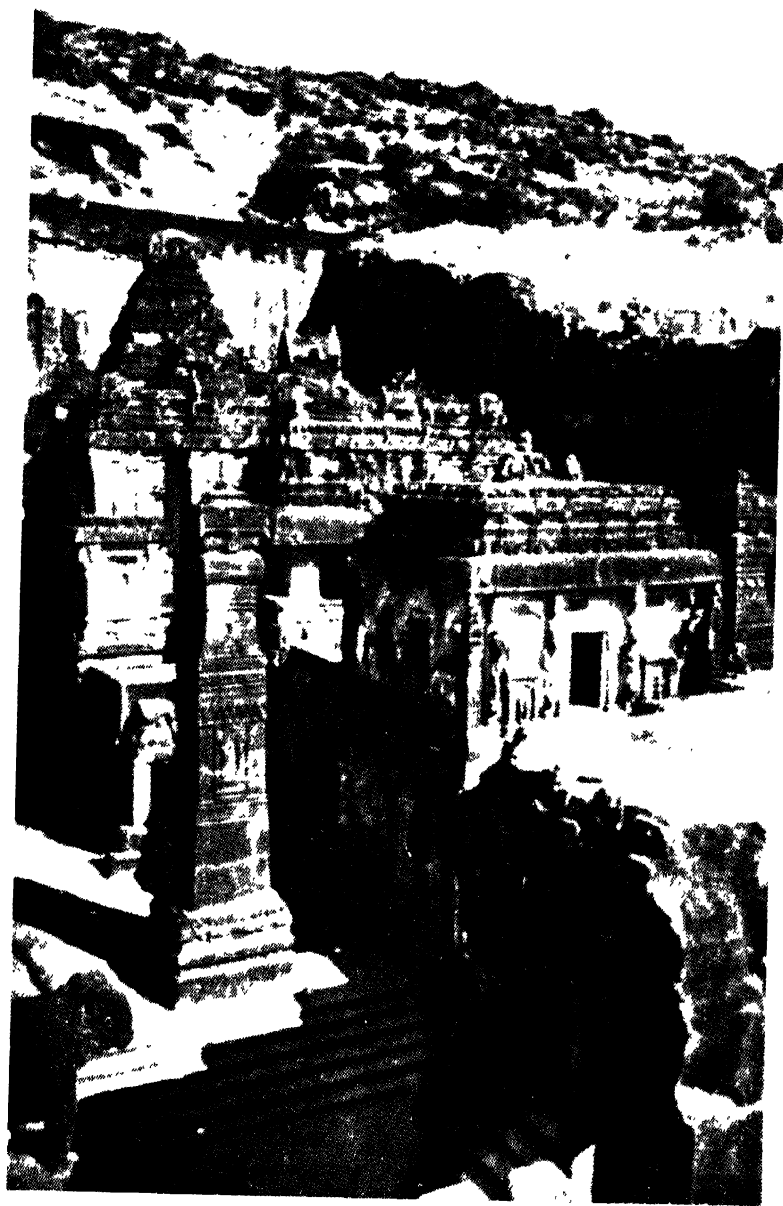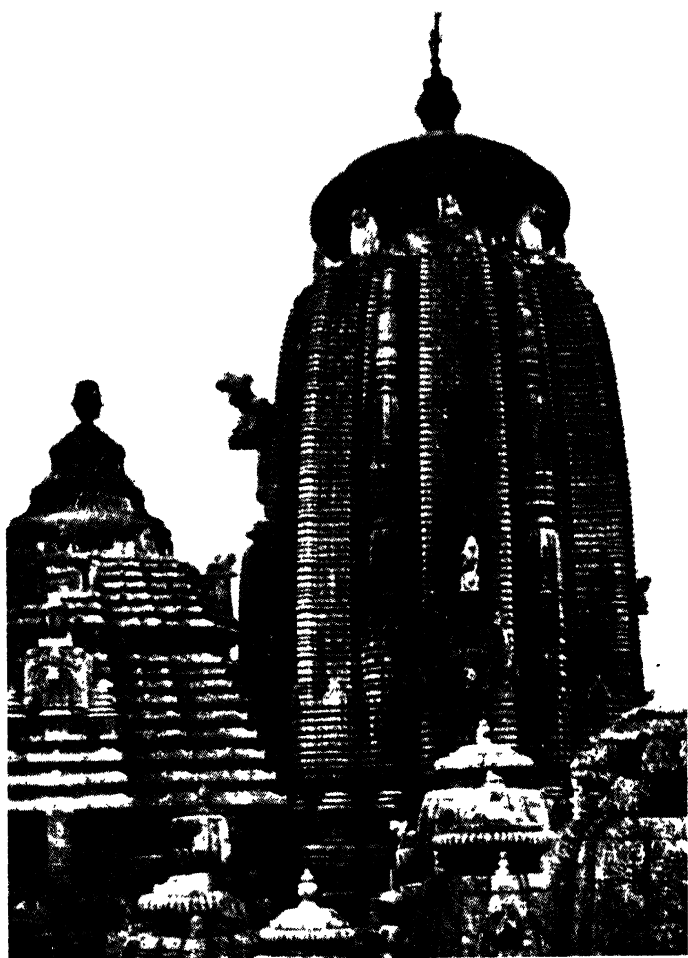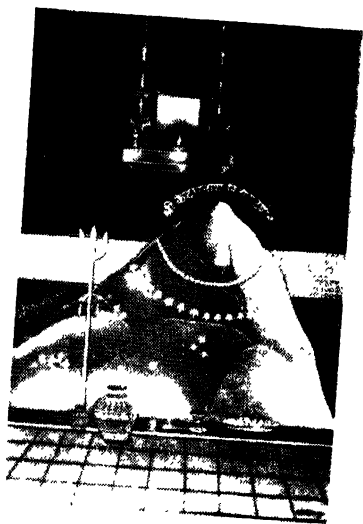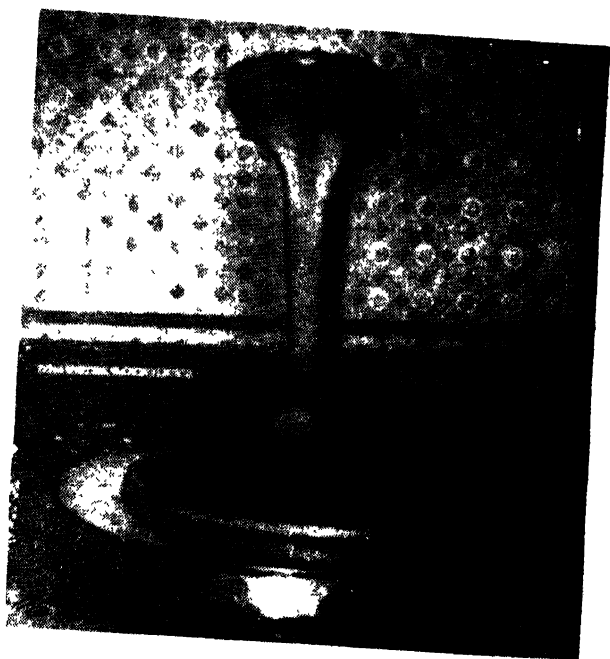
শিবভাবনা ও শিবরূপের ক্রমবিকাশ

দেবাদিদেব মহেশ্বর মহাদেব—তিনি ত্রিলোকনাথ পরমেশ—মানুষের ধারণায়, তার বোধে, তার জ্ঞানে, তার ধ্যানে ও তার উপলব্ধির আলোয়। তিনি স্বয়ম্ভু, বিশ্বের বিশ্বপতি—সমগ্র বিশ্ব তাঁরই অবয়ব। তিনিই বিশ্ব-বৈচিত্র্যের প্রকাশ। জাগতিক সর্বশক্তির মূলীভূত আধার তিনি। আবার তিনি বিভিন্ন শক্তিতরঙ্গের দ্যোতক। সর্বশক্তিমান তিনি পূর্ণ—তিনি একক—জাগতিক সত্তায় বহু হয়েছেন আবার এক হবেন বলে। এ তাঁরই লীলা। মহাদেব সর্বময় ঈশ্বর—পরমব্রহ্ম আর তাঁর শক্তির অভিব্যক্তিই আদ্যাশক্তি মহামায়া। আবার শিবরূপে যিনি মায়ের পদতলে শায়িত তিনিও নিষ্ক্রিয়া আদ্যাশক্তি মহামায়া। শিব-শক্তি অভেদ।

প্রকৃতপক্ষে শঙ্কর ভগবান পরমপুরুষ বা পরমব্রহ্মের স্বরূপে আমাদের বোধে জাগ্রত কিন্তু শাস্ত্রীয় ধারণার আঙিনায় দেবাদিদেব মহাদেব পরমব্রহ্মের এক বিশেষ অভিব্যক্ত রূপ নিয়ে প্রতিফলিত।

সৃষ্টির ঊষাকাল থেকেই জাগতিক রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতির কম্পনের সঙ্গে মানবের বোধ বিকাশের আলোয় তার মনে শক্তি চেতনাও জাগ্রত হয়েছে। জাগতিক শক্তির বিভিন্নমুখী বিকাশের সঙ্গে হয়েছে তার পরিচয় এবং তার বোধে এই সত্য জাগ্রত হয়েছে যে জগতের প্রতিটি ব্যাপারে শক্তির ক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে। যে শক্তির উৎস সেই মহাশক্তি যিনি ব্রহ্মেরই লীলা চঞ্চল রূপ যাঁকে আমরা আদ্যাশক্তি মহামায়া বলে অভিহিত করেছি।

প্রাণী সমূহের জন্ম মৃত্যু রহস্য, প্রকৃতির নয়নাভিরাম রম্যতা, ভয়াল-ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা প্রলয়-উপপ্লব, মনের সুখানুভূতি, প্রাণের বেদনা মানুষের মনকে এক এক ক্ষেত্রে কখনও অবাক করে, কখনও ভাব বিহ্বল করে।

কখনও আনন্দ পূরিত করে কখনও বা অসহায় করে সহায় ব্যাকুল করে তোলে। মানুষের মন এ সবের কারণ খুঁজতে গিয়ে একটা প্রামাণ্য সত্তাকে পেতে চেয়েছে—অবলম্বনকে খুঁজে ফিরেছে। তারপর তার উপলব্ধিতে প্রতিভাত হয়েছেন সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর বিভিন্ন অভিব্যক্ত রূপ নিয়ে।

মানবের এই উপলব্ধির যাথার্থ্যতা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন কারণ একে মূর্ত করেই মানব তার চির জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে আসছে স্বরূপোলব্ধির মাধ্যমে।

জাগতিক রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতির দোলন মানব মনে প্রাকৃতিক শক্তি বিকাশের বিভিন্ন অভিব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত করে দেয় এবং উপলব্ধি করিয়ে দেয় জাগতিক সর্ব ব্যাপারে মহাশক্তির বিদ্যমানতা —যা মূলীভূত পরম শক্তিময় সত্তার বিভূতি। এই উপলব্ধির আলোকেই মানব একের মধ্যে তিনটি সত্তাকে খুঁজে পেয়েছে ঐ বিরাট ঈশ্বরেরই লীলা বিকাশের পটভূমিকায়। মানুষের ধারণা পরমব্রহ্মের ঐ তিন
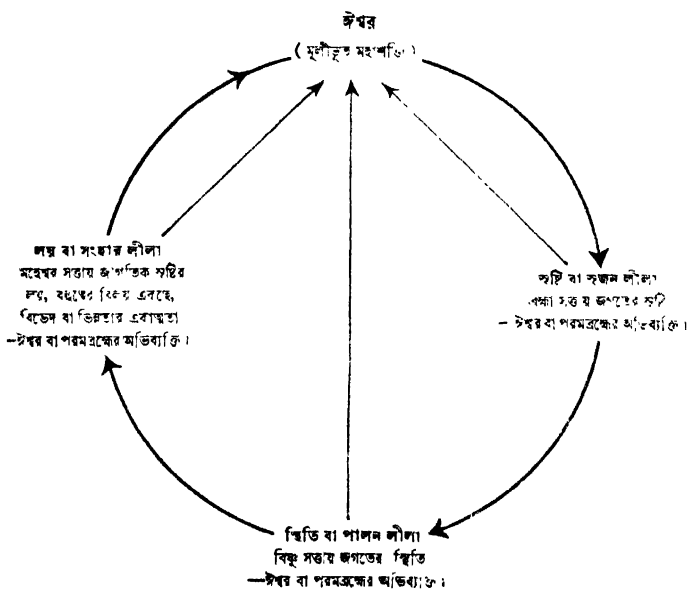
লীলাচক্র বা ঈশ্বরের লীলা বিলাস

গুণান্বিত সত্তায় ব্যক্তি সত্তা আরোপিত করেছে যথা সৃজনের ঈশ্বর, পালনের ঈশ্বর এবং সংহারের ঈশ্বর—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—একই

নিগুর্ণ পরমব্রহ্মের কার্যকরণ সম্বন্ধে তিন ব্যক্ত রূপ। এ ধারণা সত্য এবং স্পষ্ট বলেই মনে হয় কারণ এর যে কোনটির সম্যক রূপ-ধ্যানে মানবের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়েছে বা হয়। ব্রহ্মা জগতের সৃজন করেন, বিষ্ণু জগতের পালন করেন, মহেশ্বর জগতের সংহারক।

এই সংহারক মহাশক্তিই রুদ্ররূপে কল্পিত হয়েছেন—বিভেদ বা বহুত্বের বিনাশরূপী, শক্তি যার দ্বারা একত্বে নিয়ে যাওয়া বা মুক্তি দেওয়া। নিঃসন্দেহে এ এক গভীর উপলব্ধি-প্রসূত ধারণা; কিন্তু অবিনাশী ঈশ্বরের বহু হওয়া যে তিনি এক হবেন বলে—এই লীলা বিলাস, সেই উপলব্ধি মানুষের ধারণার অনধিগম্য নয়। মহাদেবের এই সংহারক রূপটি তাই জীবাত্মার মুক্তিদায়ী কল্যাণকর রূপ। তাই তিনি শিব। আমাদের স্থূল বোধে সাধারণতঃ আমরা দেবাদিদেব মহেশ্বরকে সর্বশক্তি-মান ঈশ্বর যিনি জগৎকারণ ও জগৎকারক হিসাবেই কল্পনা করে থাকি এবং তিনি আমাদের রক্ষক, কল্যাণ বিধায়ক, অশুভের নাশকারী-বরদ বিধাতা এভাবেই ভেবে অর্চনা করি। এ সমস্ত ভাবনাও অসংলগ্ন, অকারণ বা অপূর্ণ নয় কারণ শিব অখিল জগৎকারণ পরমব্রহ্মেরই মূর্ত বিকাশ আমাদের বোধে এবং যখন আমাদের শিব আরাধনা ভক্তিমণ্ডিত গভীর ধ্যানমগ্ন হয় তখনই আমাদের ঐহিক বা পারত্রিক কামনা ফলবতী হয় পরমব্রহ্মেরই প্রসাদে। দেবাদিদেব মহাদেবের পরিচিতি যে তিনিই স্বয়ম্ভূ, তবু ছোট এই দুই অক্ষরে অজর-অমর-অব্যয় বিশ্বেশ্বরের বুঝি সর্ব পরিচিতি—তিনি শিব। শিব অর্থাৎ অশুভের সংহারক, কল্যাণ-বিধায়ক, মুক্তি প্রদায়ক সর্বেশ্বর।

শিব-চেতনা ব্রহ্ম-চেতনা বই আর কি—যা সম্যক শিব ভাবনার ফলসিদ্ধি। যদি আমরা সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র দেশ-ব্যাপি শিব ভাবনার পরিণতির কথা-চিন্তা করি তা হলে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের শহরে শহরে গ্রামে-গ্রামান্তরে, বনে-বনানীতে, পর্বতে-কন্দরে শিবার্চনার ব্যবস্থা দেখে অতি সহজে বুঝতে পারবো যে ভারতীয় ধর্ম জীবনে বা অধ্যাত্ম জীবনে এবং সমাজ জীবনে শিব ভাবনার গুরুত্ব কতটা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হিন্দুর ধর্ম চিন্তায় শিব শুধু অনাদি দেবই নন—তিনি মহাদেব, তিনি দেবশ্রেষ্ঠ—তিনি স্বয়ম্ভু। বস্তুতঃ মনে হয় বেদের একেশ্বরবাদ সর্বেশ্বরবাদ। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এবং পরবর্তী দ্বৈত-ভক্তিবাদ যেন ক্রম-সম্মিলনের মধ্য দিয়ে শিব-দর্শনের ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছে।

'শিব' কথাটির ব্যঞ্জনা কি? শিব অর্থে কল্যাণ বিধায়ক মনস্কামনা পূরক দেবতা যাঁর করুণায় কল্যাণ ঝরে অকল্যাণের বিনাশে। যিনি সমস্ত অমঙ্গলের সংহারক—একমেবাদ্বিতীয়ম্ আদর্শ পুরুষ। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—শিব সত্য ও সুন্দরের যোগ পথে শান্তম ও অদ্বৈতমের বিভূতি। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ নির্মল অখণ্ড জ্যোতি স্বরূপ পরমব্রহ্ম।

অতীত দিনের কোন শুভক্ষণে মানব মনে শিব চেতনা জেগেছিল? সে কি ভারত ইতিহাসের প্রাক-বৈদিক যুগে, না বৈদিক যুগের কোন পর্বে? সে কোন অনাদিকালে দেবাদিদেব মহাদেবের ভাবনা মানুষের মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আজ হয়ত এ জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর মিলবে না। তবে যুগ-পরম্পরা ধরে অনুস্মৃত বেদ-পুরাণাদির ঘটনাবলী হয়ত কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে।

স্বরূপোপলব্ধির সঙ্গে মানুষের কি শিবোপলব্ধি ঘটেছিল—যা হল ব্রহ্মোপলব্ধি? এ জিজ্ঞাসার উত্তর হল নিশ্চয়ই তা ঘটেছিল এবং আজও তা ঘটে চলেছে। সেই উপলব্ধির আলোকেই তো শিব-চেতনার দ্যোতনা।

ভারতবর্ষে শৈবধর্ম বিস্তারের কথা পর্যায়ক্রমে পরে বলা যাবে, এখন শৈবধর্ম প্রবর্তনের আদি ইতিবৃত্তটি বর্ণনা করা যাক। কিন্তু তার খবরও খুব স্পষ্ট নয়।

এদেশে আর্য-অনার্য মিশ্রিত ভাবধারায় গড়ে ওঠা সভ্যতায় বেদ-সৃষ্টি কালের সময়কে বৈদিক যুগ বলা হয়। এটি মানব-মন বিকাশের এক সুবর্ণযুগ। যখন বিশ্ব প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানুষ প্রথম উপলব্ধি করেছিল জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর বা ব্রহ্মের স্বরূপ। বিস্তীর্ণ বৈদিককালকে আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি—বেদের যুগ ও উপনিষৎ বা বেদান্তের যুগ। এই বিস্তীর্ণ যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় বৈদিক সাহিত্য-সম্ভারেই মূলত ছড়িয়ে আছে। বেদ ও বেদান্তের যুগের ধর্মভাবনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারা মিলিত হয়েছে ব্রহ্মবাদের দিকে। বৈদিককালের দর্শন চিন্তা নিরূপণ করার পূর্বে বেদ-পুরাণ সম্মত অতীত ভারতের ইতিহাসের ছবি কেমন ছিল দেখা যাক।

দেব অধ্যয়নে আমরা জানতে পারি যে, হিমালয়ের দক্ষিণে এক বিশাল পরাক্রান্ত ও সুসভ্য অশুভ্রবর্ণ মানবজাতির সঙ্গে হিমালয় মধ্যস্থ আর এক শুভ্রবর্ণ মানবজাতি সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। এই শুভ্রবর্ণ মানব

সজ্ঘ নিজেদের অপেক্ষাকৃত ভদ্র মনে করে আর্য নাম ধারণ করতেন, উপরন্তু পুরাণাদি পাঠে আমরা জানতে পারি এশিয়া ভূখণ্ডে কোথায় কোথায় এঁদের সন্নিবেশ ছিল ও কোন দুই বিশেষ জাতির সংঘর্ষে ভারতের ইতিহাসের সূচনা হয়।

সমগ্র পুরাণ সাহিত্য থেকে এই কয়টি তত্ত্ব বিশেষরূপে আমরা জানতে পারি।

(১) আদি পুরুষ কশ্যপের দুই স্ত্রী দিতি ও অদিতি হতে দুই মানব-বংশের বিস্তার হয়। দিতির পুত্রগণ দৈত্য এবং অদিতির পুত্রগণ আদিত্য নামে খ্যাত হয় এবং এই দুই মানবজাতির মধ্যে বহুকাল সংঘর্ষ চলতে থাকে।

(২) আদিত্য সন্তানগণ অর্থাৎ শুভ্রবর্ণীয় মানবজাতি হিমালয় গিরি-শ্রেণীর মধ্যস্থ পাঁচটি উপত্যকা থেকে হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে বাস করতেন। আদিত্য সন্তানগণ যে ভূভাগে বাস করতেন তাকে জম্বুদ্বীপ বলা হত। এই জম্বুদ্বীপবাসীগণ হিমালয়ের দক্ষিণে ক্রমশ বিস্তার লাভ করে যে স্থানে বাস করতে থাকেন তা তাঁদের মধ্যে এক পরাক্রমী পুরুষ ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হয়। এই সকল তত্ত্ব একত্র করে আমরা অনুমান করতে পারি যে, ঐ শুভ্রবর্ণ আদিত্য সন্তানগণ ছিলেন তথাকথিত আর্য জাতি ও দৈত্যগণই ছিলেন অনার্য জাতি। চীন জাতি, ইহুদী জাতি প্রভৃতির ঐতিহ্যে ও আমাদের শতপথ ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে যে এক বিরাট প্লাবনের বর্ণনা আছে তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিশ্চয়ই কোন এক ভূ-বিপর্যয় ঘটেছিল, যার ফলে হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশবাসী আর্যগণ আর সেই সকল প্রদেশে থাকতে না পারায় তাদের এক বিরাট অংশ পাশ্চাত্যদেশ সমূহে ও অপর-এক অংশ কাশ্মীরের উত্তরস্থ পার্বত্য-পথ ধরে কাশ্মীর ও বর্তমান পূর্ব পাঞ্জাব এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব ভূভাগ সমূহে (এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত) তাদের নিবাসভূমি ক্রমশ বিস্তার করতে থাকেন। হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের দক্ষিণে আর এক বিরাট জাতি—দ্রাবিড় জাতি সুসভ্য অবস্থায় তখন বর্তমান। কাজেই বিস্তার-লাভ করতে এই জাতির সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের সর্বদাই সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। এই সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় আর্য ও দ্রাবিড় জাতি নিশ্চয়ই পরস্পর মিশে গিয়ে এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত হয় এবং স্বাভাবিকভাবে দুই জাতির সংস্কৃতি মিশে গিয়ে এক নতুন সভ্যতা-

সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। দ্রাবিড় জাতির কোন কোন শাখা বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে আমাদের পূর্বপুরুষ ভারত সন্তাণগণ সম্পূর্ণ আর্য বা সম্পুর্ণ অনার্য ছিলেন না।

এই সিদ্ধান্তের প্রধান প্রমাণ—অন্যান্য তথাকথিত আর্যজাতি থেকে ভারতীয় মিশ্র আর্য জাতির সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্য, যা এই মিশ্র জাতির সভ্যতার ইতিহাস অনুধাবন করে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে—এই সভ্যতার ইতিহাসের উপকরণ স্বরূপ যে প্রাচীন সাহিত্যের অর্থাৎ বেদপুরাণাদি আশ্রয় নিতে হয় তার মধ্যে কোথাও এমন কথা পাওয়া যায় না যে এরা সম্পূর্ণভাবে ভারতের বহির্দেশ থেকে আগন্তুক রূপে এসেছিলেন, যদিও একথা ঠিক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাঁরা নিজেদের দক্ষিণ দিকে বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলেন।

ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের গবেষণা ও সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা অনুমান করতে পারি যে ১৫০০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৮০০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত—

১। আলতাই পর্বতশ্রেণী থেকে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর অন্তর্বর্তী ভূভাগ পর্যন্ত শুভ্রবর্ণীয় আর্য জাতির বাস ছিল।

২। পারস্য সাগরের পূর্ব উপকূল থেকে সিন্ধু নদের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত রক্তবর্ণ দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল।

৩। সিন্ধুনদ প্রদেশের দক্ষিণে বর্তমান রাজস্থান এক বিরাট জলরাশির গর্ভে ছিল ও তার দক্ষিণে বিন্ধ্যাদি পর্বতশ্রেণীর জঙ্গল দেশ সমূহে নিষাদ দল বাস করত।

৪। আরও দাক্ষিণে পাহাড়, জঙ্গল ও দ্বীপপুঞ্জাদিতে কৃষ্ণবর্ণ বানর জাতির বিস্তার ছিল।

৫। হিমালয়ের পূর্বদিক বিভাগে এক পীতবর্ণ মানবজাতির বাস ছিল, যারা কিম্পুরুষ বলে পুরাণে খ্যাত।

সম্ভবত এই ৭০০০ বৎসর কালই পুরাণ বর্ণিত সত্যযুগ। আনুমানিক ৮০৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে জলপ্লাবনের ফলে আর্যজাতির পৃথিবীর পশ্চিম ভূভাগে অর্থাৎ ইউরোপে ও হিমালয় থেকে এলবার্জ পর্বতের দক্ষিণ বিভাগে বিস্তার আরম্ভ হয় এবং ৫০০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত পুর্ব পাঞ্জাব থেকে পারস্য সাগর পর্যন্ত আর্যজাতির এক বিরাট শাখা দলে দলে এসে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। ভারতীয় আর্যগণ সুপ্রতিষ্ঠিত দ্রাবিড়

সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ অনেকাংশে তাদের সঙ্গে মিশে যায় এবং সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করেন। এঁদেরই পুরাণে ভারত সন্তান বলা হয়েছে এবং এঁদের নিয়েই ভারতের ইতিহাসের সূচনা।

ভারতীয় আর্যগণ বহুকাল শান্তিতে বাস করার ফলে এঁদের মধ্যে বিশেষ করে ধর্ম চিন্তারই উন্নতি হয় এবং এঁদের সমাজে যে সকল প্রবীণ বিজ্ঞ পুরুষ সমাজের কল্যাণার্থ ধর্ম ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন তাঁরাই শীর্ষস্থানীয় ও পূজনীয় হয়ে ওঠেন। সম্ভবতঃ প্রথমে এঁরা 'অথর্বন' ও 'অঙ্গিরস' নামে অভিহিত হতেন, যখন অগ্নি প্রজ্বলিত করে দেবতার উপাসনা করতেন। পরে ভারতে এই জাতীয় পুরুষদের ঋষি বলা হত। আর্যগণ বিশেষ বিশেষ দলে বিভক্ত ছিলেন ও সম্ভবতঃ তাঁদের পৃথক পৃথক উপাস্য দেবতা থাকলেও বিশ্বব্যাপী আকাশরূপী বরুণদেবতাই সাধারণভাবে সকলের উপাস্য ছিলেন। এমনকি হিমালয়ের উত্তরেও যে সকল আর্য বাস করতেন তাঁরাও এঁর উপাসক ছিলেন। সমগ্র আর্য সন্তান এঁকে 'দৌ' বলতেন।

ঋষিগণ দেবাদির উপাসনা কল্পে মন্ত্রাদি ব্যবহার করতেন ও মন্ত্রগুলি ভগবৎ প্রেরণায়লব্ধ এই ছিল তাঁদের ধারণা। তাঁরা যেন মানসচক্ষে মন্ত্রের দর্শন পেতেন। এই সকল মন্ত্রের কিছু পারসিক ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা ও ভারতীয় আর্যদের বেদগ্রন্থে পাওয়া যায়। মিত্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, মরুৎ প্রভৃতি নামে প্রাকৃতিক শক্তি সকলকে দৈবশক্তি বা দেবতাজ্ঞানে মন্ত্রের দ্বারা আবাহন করে ঋষিরা উপাসনা করতেন। সম্ভবতঃ আর্যেরা বিশেষ বিশেষ দলভুক্ত থাকায় এক একদল এক এক ঋষির নামে গোত্রীভূত হতেন। .

বহুকাল যাবৎ ভারতীয় ও ইরাণীয় আর্যগণ একইরূপ ধর্মো-পাসনাদি করতেন। সূর্যকে অগ্নির আদিস্বরূপ ও সকল প্রাণীর জন্ম-দাতৃস্বরূপ মনে করে তাঁরা তাঁকে বিশেষ উপাস্য বলে ভাবতেন। কিন্তু ভারতীয় আর্যগণের মন্ত্রাদির মধ্যে "দ্যাবাপিতরৌ" অর্থাৎ দ্যৌঃ ও পৃথিবীর যথাক্রমে পিতা ও মাতারূপে একত্র উপাসনার উল্লেখ থাকায় মনে হয় তাঁরা অনার্যদের মাতৃশক্তির পূজার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। হিমালয়ের অন্তঃপ্রদেশস্থ মানস-সরোবরের তীরে কৈলাস পর্বতের ও তার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে মুঞ্জমান পর্বতের ক্রোড়দেশ সমূহে ভারতীয় ও ইরাণীয় আর্যগণ এক অদ্ভুত লতার সন্ধান পান, যা থেকে নিষ্কাশিত রস পান করে তাঁরা প্রাণে উন্মাদনা, দেহে নীরোগতা, বাক্যে

স্ফূর্তি, শরীরে বীর্য ও চিত্তে আনন্দলাভ করতেন। ঐ লতা সোম নামে অভিহিত হত ও একে দৈবশক্তি সম্পন্ন মনে করে তাঁরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন।

ভারতীয় আর্যগণ কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে ভারতের সমতল প্রদেশে বিস্তার লাভ করে সরযূ নদী থেকে সমগ্র আফ্‌গানিস্থানে (সপ্ত সিন্ধু প্রদেশে) খণ্ড খণ্ড রাজ্য স্থাপন করেন। বশিষ্ঠ বংশীয় পুরোহিতদের অগ্রণী করে এই যে আর্যশাখা সরযূ নদীর তীরে রাজ্য স্থাপন করেন, পুরাণাদি পাঠে মনে হয় এঁরাই সর্বাপেক্ষা প্রধান হয়ে ওঠেন ও এঁদের বংশের আদি পুরুষ ইক্ষ্বাকু নামে খ্যাত হন। ভরত, কৃবি, তৃৎসু, সৃঞ্জয় প্রভৃতি নামধারী আর্য দলবিভাগকে পশ্চিমে রেখে পূর্ব দিকেই প্রথমতঃ ইক্ষ্বাকুগণ বিশাল রাজ্য স্থাপন করেন। পুরাণে ভৃগু বংশীয় পুরোহিত-গণের দৈত্যরাজগণের সহিত সংস্রব থাকার উল্লেখ দর্শনে মনে হয় আর্য-গণের এক অংশ সিন্ধুনদ প্রদেশস্থ অনার্যদের সঙ্গে (যে অনার্যরা সুসভ্য ছিল) বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভৃগুই আর্য-অনার্য মিশ্রণের পথ-নির্দেশক।

অনুমান ৪০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পুরাণ বর্ণিত ইলাবৃত ও উত্তরকুরুবর্ষ থেকে আর একবার দলে দলে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করতে থাকেন। ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজাগণ ইতিমধ্যে বর্তমান রাজস্থানের বিরাট জলপ্রদেশ ব্যতীত সরযূ নদীর তীর থেকে পশ্চিম ভারতে দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে নবাগত আর্যদের জ্ঞাতি বন্ধন থাকলেও বহুকাল পৃথকভাবে এবং সম্ভবতঃ হিমালয়ের অন্তরালে বাস করার ফলে সেরূপ সৌহার্দ্য স্থাপিত হতে পারেনি। প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে যে যুদ্ধাদি হত, তা বিশেষ করে ঋগ্বেদ পাঠে বুঝতে পারা যায়। এই জন্যই পুরাণাদিতে আর্যজাতি হিসাবে পূর্বাগত ও নবাগত আর্যদের একই মনুর সন্তানরূপে গণ্য করলেও সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে পৃথক করা হয়েছে।

পূর্বাগত রাজন্যবর্গের নামের শেষে অশ্ব শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অশ্ব শব্দ ব্যাপ্তি অর্থে প্রযুক্ত অশ্‌ ধাতু থেকে উৎপন্ন। এই শব্দ সূর্যের একটি বিশেষ নাম ছিল। পূর্বাগত আর্যদের সূর্য বংশীয় বলার বোধহয় এটাই কারণ। নবাগতগণ সম্ভবতঃ সোমরসের প্রতি অধিক পরিমাণে আসক্ত ছিলেন ও চন্দ্রকে সোমের প্রতিরূপ জ্ঞান করতেন। ধর্মোপাসনাদিতে সমগ্র আর্য জাতির মধ্যে ঐক্য থাকলেও বিশ্বব্যাপি

তেজ ও প্রাণশক্তির বাহক মহামানবরূপী এক নূতন দেবতার উপাসনার প্রবর্তন অনুমান ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে নবাগত আর্যদের মধ্যে আরম্ভ হয়। এই দেবতাকে তাঁরা 'ইন্দ্র' নামে সম্বোধন করতেন। নবাগত আর্যগণ ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হয়ে উঠে সমস্ত পঞ্চনদ অধিকার করার জন্য ইরাণীয় আর্যদের সহিত বিশেষভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সম্ভবতঃ অধিকার বিস্তার, ইন্দ্রোপাসনা ও অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকার ফলেই উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব ঘনীভূত হয়ে ওঠে। নবাগত আর্য ও পূর্বাগত ইরাণীয় আর্যগণের বহুকালব্যাপি সংঘর্ষকেই 'সুরাসুরে'র যুদ্ধ নামে পুরাণাদিতে বলা হয়েছে।

সমগ্র আর্য ও অনার্য মিশ্রিত ভারতীয় আর্যদের প্রধান লক্ষ্য ছিল উন্নত ধরনের ধর্ম জীবন যাপন করা। সম্ভবতঃ হিমালয়ের দক্ষিণস্থ সভ্য-জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতীয় আর্যগণ যে শক্তির প্রভাবে বিজয়ী হতে পেরেছিলেন ও তাদের সভ্যতা আত্মসাৎ করে আর এক বিরাট সভ্যতা গড়ে তোলবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সে শক্তিলাভ করেছিলেন তাঁদের এই অপূর্ব ধর্ম জীবন-যাপনের কৌশলে। এই ধর্ম জীবনের মূলে ছিলেন তাঁদের দৈবশক্তি সম্পন্ন ঋষিগণ। বিশ্বজগতের বিচিত্র দৈবশক্তি সকলের লীলার অনুধ্যান করে এই ঋষিগণ যে সকল বিশেষ শক্তির পরিচয় পান, তাদের চৈতন্য বিশিষ্ট মনে করে 'দেবাঃ' (দীপ্যমান) বলে সম্বোধন করতেন ও সকলের পেছনে একই বিরাট শক্তির রূপ দর্শন করে প্রত্যেকেরই উপাসনার দ্বারাই সেই বিরাট শক্তিরই উপাসনা হয়, এই তত্ত্বজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হন। যে সকল ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঋষিরা দেবতাদের আরাধনা করতেন সেগুলিও ঐ দেবতাদের থেকে লব্ধ জেনে অর্থাৎ সেগুলি দিব্যদৃষ্টি সঞ্জাত মনে করে, ভাষায় ব্যক্ত করে, তাদের নাম দেন 'মন্ত্র'। তাঁরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করতেন যে, সেই সকল মন্ত্র তাঁদের মানসিক শক্তির দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভব না। সেইজন্য সেগুলি তাঁদের দিব্য-দৃষ্টিতে চিরন্তন সত্যরূপে প্রতিভাত এবং কেবলমাত্র 'জানা' তত্ত্ব স্বরূপ মনে করা হত। তাই একত্রে আজ পর্যন্ত ঐ মন্ত্রগুলি বেদ নামে ও ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা বলে অভিহিত হতেন। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হিমালয়ের দক্ষিণে আর্যগণের অনার্যদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে স্থায়িভাবে বাস করার সময় থেকেই ঋষিত্বের ও বেদের আরম্ভ। বেদ একান্তভাবেই ভারতীয় ও এই বেদের দ্বারাই ভারত সন্তানগণের ধর্ম জীবন ও সমাজ ব্যবস্থাদি আজ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত।

ঋষিদের দিব্যদৃষ্টি সঞ্জাত মন্ত্রগুলি মূলতঃ দেবতাদের আবাহন কল্পে ব্যবহৃত হত ও তাদের নাম দেওয়া হল 'ঋক'। যেগুলি গান করা হত তাদের নাম্ 'সামন্'। এই সকল মন্ত্রের সাহায্যে ঋষিরা দেবতাদের দর্শন লাভ করতেন। এইভাবে দেবতাদের দিব্যলীলার পশ্চাতে জগতের কল্যাণকল্পে তাঁদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে এক বিরাট ত্যাগের তত্ত্বও ঋষিগণ আবিষ্কার করেন। এই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত হওয়াই যে মানুষেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত এই ধারণায় বশবর্তী হয়ে তাঁরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগাদি (ঐ দিব্যলীলার প্রতীক স্বরূপ) কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তন করেন—এগুলিকে বলা হত 'যজ্ঞ'। যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে সকল মন্ত্রাদি ব্যবহার করা হল তাদের বলা হত 'যজুঃ'। ঋক্ সাম যজুঃ এই তিন শ্রেণীর মন্ত্র একত্রে 'ত্রয়ী' নামে অভিহিত।

ঋগ্বেদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্ত্রগুলির আনুমানিক কাল ৪০০০ খ্রীঃ পূঃ। এর কিছু আগে বা পরে এবং সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন মন্ত্রগুলির আনুমানিক কাল ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ। উপনিষদের আরম্ভ কাল ১০০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৮০০ খ্রীঃ পূঃ।

আর্য-অনার্য জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিশ্রণে যে ভারতীয় হিন্দু জাতির সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে বেদ পুরাণ সম্মত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা খুলে বিশদ আলোচনা করতে হল এই কথাগুলি জানাতে যে—

(১) আমাদের বৈদিক সভ্যতা কিভাবে তার বিশিষ্ট রূপ নিয়েছিল।

(২) আর্য-অনার্যদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল? আর্যপ্রভাবে অনার্যদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল?

(৩) আর্যদের নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কতটা মিল, কতটা দ্বন্দ্ব ছিল?

ভারতবর্ষে হিন্দুমানসে শিব-চেতনা জাগ্রত হবার পিছনে উপরোক্ত বিষয়গুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বেদ-পুরাণের নানা কথা-কাহিনীর মধ্যে এই বিষয়গুলি প্রকটিত দেখা যায়। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশিষ্ট গবেষক অনেকেই শিবকে অনার্য দেবতা বলে অনুমান করেছেন। তাঁদের এই অভিমতের পিছনে যুক্তিও দেখান হয়েছে। রাবণ রাজা ছিলেন শিবভক্ত (অবশ্য রাবণ ঠিক অনার্য নয় বলে অনেকের অভিমত।

রাবণের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ, মাতা অনার্যা)। শিবভক্ত বাণাসুর অনার্য-ছিলেন বলে বলা হয়। তাঁর কন্যা ঊষাকে কৃষ্ণের পৌত্র-অনিরুদ্ধ হরণ করেছিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধে বাণাসুরকে পরাস্ত করেছিলেন। পুরাণের এই ঘটনা, বাণাসুর যে অনার্য ছিলেন সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সংশয় থেকে যায়। কারণ আমরা পূর্বেই দেখেছি যে পূর্বাগত আর্যগণ ও নবাগত আর্যগণ প্রথম দিকে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত এবং পুরাণে এই যুদ্ধবিগ্রহগুলিকেই সুরাসুরের যুদ্ধ বলে আখ্যাত করা হয়েছে। তবে একথাও প্রমাণিত সত্য যে, আর্যদের ভারতে পদার্পণের বহু পূর্ব থেকেই এদেশে, বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম ভারতে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে সুসভ্য এক জাতির বাস ছিল যাদের আর্যরা বলেছেন অনার্য। দ্রাবিড় বলে এঁদের অভিহিত করা হত। আর্যরা দ্রাবিড়দের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং এর ফলে আর্যসভ্যতায় ও দ্রাবিড় সভ্যতায় মিশ্রণ হয়ে এক নতুন সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু দ্রাবিড় জাতির কোন কোন শাখা বিতাড়িত হয়ে বিন্ধ্য পর্বতমালা অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। বাণাসুরের কীর্তি কাহিনীর সবিশেষ উল্লেখ দক্ষিণ ভারতেই দেখা যায়। আবার ইতিপূর্বে এ বিষয়েরও উল্লেখ করা হয়েছে যে পূর্বাগত আর্যরা নবাগত আর্যদের কাছে পরাভূত হয়ে বা অন্য কোন কারণে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তপস্যায় কিরাতদের দেবতা শিবকে সন্তুষ্ট করে পশুপাত অস্ত্র লাভ করেছিলেন। দক্ষের যজ্ঞে অনার্য দেবতা শিবের নিমন্ত্রণ হয়নি। বেদের কোথাও শিব দেবতার কথার উল্লেখ দেখা যায় না (ঋক্ বেদের তিনটি মন্ত্রে ও যজুর্বেদে রুদ্র দেবতার স্তোত্র আছে যিনি পরবর্তীকালে শিবরূপে কল্পিত হয়েছেন বলে অনুমিত হয়)। এই সকল ঘটনা এবং লিঙ্গ প্রতীকাকারে শিবের পূজা, শ্মশানে-মশানে বনে-জঙ্গলে শিবের অবস্থান, ভূত প্রেতদের শিবের চেলা চামুণ্ডা রূপে কল্পনা, উচ্চ-নীচ যে কোন বর্ণের জাতির দ্বারা শিব পূজা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জন্য অনেকেই মনে করেন শিব অনার্য দেবতা।

বৈদিক যুগের আগে সিন্ধু সভ্যতার কালে (আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ৩০০০-২৫০০) যে সুসভ্য জাতি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে উন্নত ধরনের নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল (অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন আর্য-অনার্য মিশ্র ভাবধারায় এই সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল) তাদের

কৃত নগরী মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে নৃত্যরত মূর্তি পাওয়া গেছে যার সম্পর্কে পণ্ডিতগনের মন্তব্য যে এটি সম্ভবতঃ নটরাজ শিবের প্রাকরূপ।

এছাড়া হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত শীলমোহরেও যে দেবমূর্তি অঙ্কিত দেখা যায় অনেক পণ্ডিতের মতে সেটি শিব সদৃশ কোন দেবমূর্তি। তাহলে শিব কি অনার্য দেবতা ছিলেন ? এবং সেই সভ্য অনার্য জাতি (সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতি) মূর্তি পূজক ছিল।

প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রস্থল মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ খনন করে নৃত্যরত যে নট মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে তারা নৃত্যের ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। মূর্তির বাম পদ বঙ্কিম ভাবে ছন্দিত। এই মূর্তিকে পণ্ডিতবর্গ দেবতার মূর্তি বলেই অনুমান করেছেন এবং তাঁদের ধারণায় এটি সম্ভবতঃ নটরাজ শিবের প্রারম্ভিক রূপ।—নৃত্যকারী শিব-নটরাজ।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতে "There are two remarkable statuettes found at Harappa,···and other of dark grey slate, the figure of a male dancer, standing on the right leg, with the left leg raised high, the ancestor of Siva Nataraja" [Hindu Civilization (2nd Indian edition 1950, p—10)]

অর্থাৎ হরপ্পাতে ধূসর কৃষ্ণ স্লেট পাথরের একটি নৃত্যশিল্পীর মূর্তি পাওয়া গেছে—মূর্তিটি ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এবং বাম পদ উচ্চে উত্তোলিত নৃত্য ছন্দের ভঙ্গিমায়—মূর্তিটি নটরাজ শিবের প্রাক্‌রূপ।

এই বিষয় সম্পর্কিত অপর এক প্রবন্ধে পণ্ডিত প্রবর ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহাও বলেন ; —The other stattuette (pt × 1) represents a dancer standing on the right leg with the left leg raised in front, the body from the waist up wards bent round to the left and both arm stretched in the same direction. The pose is full of movement. It is inferred that the figure was three headed or three faced and in that case it represented the youthful SIVA NATARAJA or the head might have been that of an animal. There is no parallel to this figure among the Indian sculptures of the historic period. (Indian Historical Quarterly Vol III, march 1932, No 2, p—143)

বক্তব্যটির বাংলা তর্জমা দাঁড়ায় এইরূপ—"অপর মূর্তিটি একটি নৃত্যরত পুরুষের। মূর্তিটি ডান পায়ে ভর দিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে এবং বাম পা সামনের দিকে তোলা—শরীর কোমর থেকে ওপরের দিকে মোচড় দিয়ে বামদিকে ঘোরানো এবং বাহু দুটি একই দিকে প্রসারিত—নৃত্যক্রিয়াশীল ভঙ্গি। অনুমিত হয় যে মূর্তিটি ত্রি-শির বা ত্রি-মুখ বিশিষ্ট ছিল এবং সে ক্ষেত্রে এটি নটরাজ শিবের মূর্তি হিসাবে উপস্থাপিত অথবা মুখটি কোন জন্তুরও হতে পারে। এই মূর্তির সমপর্যায় ভুক্ত কোন মূর্তি ঐতিহাসিক যুগের ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে দেখা যায় নি।"

নৃত্যরত পুং মূর্তি, যা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা গেছে সেটি দেব মূর্তি বলে পণ্ডিতবর্গ অনুমান করেছেন এবং মূর্তিটি নটরাজ শিবের প্রাক্-রূপ হিসাবেই ধারণা করা হয়েছে। এ অনুমান ভ্রান্ত নাও হতে পারে। মূর্তিটি নটরাজ শিবের প্রাক্-রূপ হওয়াও অসম্ভব নয়। বক্তব্যটির সমর্থনে সম্ভাবনার এক ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। সিন্ধু উপত্যকায় যাঁরা সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন সেই অনার্য বা দ্রাবিড় জাতি আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে চলে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানে স্বতন্ত্র আদিবাসী মিশ্রিত দ্রাবিড় সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই সভ্যতার নিদর্শন বেশ প্রকটিত। সেখানে নটরাজ শিবের মন্দির ও মূর্তি রয়েছে এবং নটরাজ শিবের পূজার বহুল প্রচলনও আছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে নানা নটরাজ মূর্তির নির্মাণ মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা যুগের নটরাজ শিবের প্রাক্‌রূপ নৃত্যরত মূর্তির সঙ্গে যে যোগসূত্র রচনা করেনি তা বলা যায় না। আজ লিঙ্গরূপ যে প্রতীককে আমরা শিব জ্ঞানে পূজা করছি হয়তো তিনি সেই সুপ্রাচীন অতীতকাল থেকে ভারতবর্ষের মানুষের পূজা পেয়ে আসছেন ধ্যান ধারণা ও রূপের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন যদি প্রামাণ্য বলে ধরা হয় তবে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষে শিবভাবনা শিবরূপ কল্পনার মধ্য দিয়ে কবে থেকে শুরু হয়েছিল সে ঠিকানা আজ জানা যাবে না। এমন কি সেই অতীত যুগে শিব সম্পর্কে মানুষের ধারণাও বা কেমন ছিল তাও আজ জানা যাবে না। তবু ঐ যুগকে শিব-আরাধনার প্রারম্ভিক যুগ হিসাবে যদি ধরাও হয় তবে সেসময় থেকেই শিবের বা শিবানুরূপ কোন দেবতার মূর্তি কল্পনা করে তা নটরাজ হোক বা অন্য কোন দেবমূর্তিই হোক না কেন, পূজা

করা হত। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করা যাচ্ছে না।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে শিবের প্রারম্ভিক দেবমূর্তি কি অনার্য পূজিত ছিল অর্থাৎ আর্যেতর যে জাতি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিয়ে আর্য আগমনের বহু পূর্ব হতে এখানে বসবাস করতো তাদের আরাধিত দেবতা ছিলেন শিব সদৃশ কোন কল্পিত দেব-মূর্তি। এ সম্ভাবনাকে হয়ত একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষে দফায় দফায় আর্যগণের আগমনের পর ক্রমে ক্রমে আর্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে অনার্য ভাবধারার মিশ্রণ ঘটেছিল এবং তখন একই রকমভাবে অনার্য-শিব-ভাবনা আর্য সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ শিবকে আমরা বলি আদি দেব—দেবাদিদেব মহাদেব।

এ বিষয়ে আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। শিব-গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য দেব-গোষ্ঠীর বিরোধ; যার পরিষ্কার চিত্র অঙ্কিত আছে দক্ষযজ্ঞ পণ্ডের ঘটনায়। বলা যাবে না এটা আর্য-গোষ্ঠীর মধ্যেই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ না অনার্য-আর্য কলহের পরিণতি।

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এইরূপ :—

"আর্য অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও বোঝা-পড়া করার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময় অনার্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য উপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল এবং সেই বিরোধে কখনও আর্যরা কখনও অনার্যরা জয়ী হইতেছিল। কৃষ্ণের অনুবর্তী অর্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণাসুরের কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন—এই সংগ্রামে কৃষ্ণ জয়ী হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞে অনার্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, সেই উপলক্ষে শিবের অনার্য অনুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল! অবশেষে শিবকে বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলাইয়া একদিন তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্য-অনার্যের এই ধর্মবিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল। তথাপি দেবতা যখন অনেক হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট সে বিবাদ সহজে মিটিতে চায় না। তাই মহাভারতে, রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে।"

তবে শিব অনার্যদের দেবতাই হোন বা আর্যদের দেবতাই হোন পরবর্তীকালে আর্য-অনার্য মিশ্র ভাবধারার মধ্যেই তাঁর বিকাশ ঘটেছিল

এবং তার অবিসংবাদী প্রভাব ছিল সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী যার প্রভাব এখনও হিন্দুর জীবনে জাজ্বল্যমান।

মানুষের ধারণায় শিব কখনও গুণাতীত ঈশ্বর বা পরমব্রহ্ম কভু বা নানা গুণারোপিত সগুণ সর্বশক্তিমান, সর্ববিদ্যাপারঙ্গম ভগবান। শিব কি সুপ্রাচীন কোন আদিম যুগে এক অতিমানস সত্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?—সেই মহাজ্ঞানী, মহাগুণী, মহাযোগী, মহাপরাক্রমশালী বিরাট পুরুষের প্রভাব আর্যরাও অস্বীকার করতে পারেনি—ভয়ে শ্রদ্ধায় তাঁকে মেনেছে এবং হয়ত সেই অতিমানস সত্তা, ঈশ্বরের অবতার নন, পরমেশ্বর হয়ে প্রতিভাত হয়েছেন পরবর্তীকালে মানব-মানসলোকে। এ ধারণার তেমন কোন ভিত্তি হয়তো নেই, কিন্তু তাহলেও কথাটি চিন্তা সাপেক্ষ।

বৈদিক যুগে মানুষের দার্শনিক চিন্তাধারা বা অধ্যাত্মজ্ঞান কিরূপ পরিণতি লাভ করেছিল তার পর্যালোচনা করলে আমরা সে যুগের মানুষের অধ্যাত্ম ভাবনার এক ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি যা শাশ্বত সত্য হয়ে চিরভাস্বর।

মানুষের ধর্মবোধ জাগে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয় বৃত্তিকে অবলম্বন করে। সেই প্রাচীন যুগে মানুষকে নানা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখন তার সহায় ব্যাকুল মন দুঃখ কষ্ট ও বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য কোন বৃহত্তর শক্তির করুণা প্রার্থনা করত, আপনার পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে তাঁর আনুকূল্য কামনা করত—যে মহান শক্তির অস্তিত্ব তারা প্রাণে অনুভব করত। শক্তির এক এক বিশেষ অভিব্যক্তিকে তাঁরা দেবতা বলে অভিহিত করত এবং বিশ্বাস করত এঁদের ভূমিকাতেই তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অবলম্বনের ব্যাকুলতা বা আকুতি থেকেই ধর্মবোধের জন্ম। প্রাচীনকালের মানুষের মনে এভাবেই ধর্ম চিন্তা জেগেছিল এবং কাল-পরিক্রমায় তা ধীরে ধীরে প্রকৃষ্ট রূপ লাভ করল।

বৈদিক যুগের প্রথম অবস্থায় মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা প্রধানতঃ দুটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে ঘিরে থাকত—প্রথমতঃ প্রতিকূল শক্তির কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবলতর একটি শক্তিমান সত্তার সাহায্য প্রার্থনা, যে সত্তা বিদ্যমান আছে বলে তার বোধে জাগ্রত ছিল। অন্যটি আত্ম-প্রসারের ইচ্ছা দ্বারা তার পরিচালিত হওয়া। যেমন আমি সম্পদশালী হব, আমি ভাল থাকব ইত্যাদি। এই ধরনের ইচ্ছা পূরণের জন্যে অর্থাৎ

ঐহিক সুখের জন্যে তখন মানুষ বৃহত্তর শক্তির কাছে সহায়তা প্রার্থনা করত (আজও যেমন আমরা আমাদের ইষ্টদেবতার নিকট কামনা করে থাকি)।

এই দুটি প্রয়োজন বোধই সে যুগের মানুষকে ঈশ্বর সন্ধানে পরিচালিত করেছিল। ধর্মচেতনার বহিঃপ্রকাশে তখন এইভাবে এক এক শক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করে ও তাঁকে আবিষ্কার করে, তাঁকে উপাসনার দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি সম্পাদন করে বিপত্তি হতে মুক্তি ও সমৃদ্ধিশালী হবার জন্যে মানুষ প্রার্থনা নিবেদন করত। ঈশ্বর সন্ধানে ঋগ্বেদের ঋষিকুল এই পথেই যাত্রারম্ভ করেছিলেন। তার সঙ্গে বিশ্বজগতের রহস্যানুসন্ধানের চেষ্টাতেও তাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন।

বৃহত্তর শক্তির সন্ধানে তাঁরা প্রকৃতির বক্ষে যেখানে শক্তির উৎস খুঁজে পেয়েছেন, তার ওপরেই দেবত্ব আরোপ করেছেন—সেই শক্তিকে বলেছেন 'দেবতা'। এরূপ বিভিন্ন শক্তি স্থাবর জঙ্গমে—আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে বিদ্যমান। তাঁরা এই শক্তি সত্তাগুলিকে দেবতায় অধিষ্ঠিত করে স্তুতি করেছেন। যেমন—ইন্দ্রদেবতা, অগ্নিদেবতা, সূর্যদেবতা, বরুণদেবতা, দৌদেবতা, পৃথিবীদেবতা, রাত্রিদেবতা, ঊষাদেবতা, সোমদেবতা প্রভৃতি। এঁদের সঠিক কোন মূর্তি কল্পিত না হলেও বর্ণনাবৈশিষ্ট্য ও অভিব্যক্তি নিয়ে এঁরা দেবতা হিসাবে কল্পিত ও মান্য ছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয় এঁরা সকলেই এক একটি প্রাকৃতিক শক্তি।

এইভাবে ঋগ্বেদের প্রথম অবস্থায় যে ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাকে 'বহু দেবতাবাদ' বলা যায়। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তীকালে মানুষ তার ধারণায় বৃহত্তর থেকে বৃহত্তম শক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পেল। বহু দেবতার মধ্যে বৃহত্তম শক্তির সন্ধান মেলে না। তাই ঋষি তৎপর হল সত্যানুসন্ধানে—তাঁর ধ্যানে প্রতিভাত হলেন অতি দেবতা। একেশ্বরবাদের পথে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের এই ছিল অভিগমন।

কিন্তু বহু দেবতার মধ্যে একটি অতি দেবতাকে স্থাপন করে ঋগ্বেদের ঋষি তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর ভাবনায় পূর্ণ সত্য যেন জাগ্রত হয়ে ফুটে ওঠেনি। তাঁর আত্মোপলব্ধির আঙিনায় এবার ঈশ্বর একক শক্তি হিসাবে প্রতিভাত হলেন। বহুর মধ্যে তিনি বিশিষ্টভাবে এক নন—তিনি একক। তাই এরপরই মানুষের চেতনায় বিশ্বের মূল শক্তির অন্বেষণ নতুন করে জাগলো। আর এই বোধের পথে চিন্তা অগ্রসর হল বিশ্ব দেবতার কল্পনায়। ঋষি এখানে তার ধ্যানমন্ত্রে একটি বা দুটি দেবতার

প্রশস্তি রচনা করলেন না ; তিনি একসঙ্গে দেবতাদের আবাহন ও গুণ কীর্তন করলেন। এইভাবে তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হল যে সুবর্ণ-ভাবনা তা হচ্ছে জগৎ-সংসারের মূলীভূত শক্তি একই, বিভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধির বিভিন্ন আলোকে তাঁকে স্বতন্ত্ররূপে ধারণা করে তাঁর ওপর পৃথক পৃথক নামরূপ আরোপ করা হয়।

দেখা যায় বৈদিক যুগে বিশ্বের মৌলিক সত্তার অন্বেষণে এই চিন্তা দুটি ধারা নিয়েছে। একটি চিন্তাধারা একেশ্বরবাদের পথে প্রবাহিত হয়েছে যার ফলস্বরূপ ব্যক্তিরূপী মহান ঈশ্বরকে তাঁর ধারণায় পেয়েছে মানুষ। আর অন্য ধারাটি সর্বেশ্বরবাদের ধারণা। বিশ্বের মধ্যে এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন সত্তার আবিষ্কার যার পরিণত রূপ উপনিষদের ব্রহ্মবাদ।

মৌলিক সত্তা সম্পর্কে চিন্তা একেশ্বরবাদের দিকে যে প্রবাহিত তার পরিচয় পাওয়া যায় ঋগ্বেদের প্রজাপতি সূক্তে বা বিশ্বকর্মা সূক্তে। একেশ্বরবাদে ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক রূপে ভাবিত—বিশ্ব হতে পৃথকভাবে তাঁর অবস্থিতি। তিনি ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট এইরূপ ধারণা করা হয়—তিনিই পরমশক্তি বা পরমেশ্বর। তাঁকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হতে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। যখন তাঁর স্রষ্টারূপের প্রাধান্য তখন তিনি বিশ্বকর্মা অর্থাৎ বিশ্বভূপ (বেদের বিশ্বকর্মার কল্পনা ও পুরাণের বিশ্বকর্মার কল্পনা ভিন্নতর)। যখন তাঁর প্রভুত্ব শক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তখন তিনি প্রজাপতি রূপে কল্পিত। এইভাবে একেশ্বরবাদী চিন্তা বীজ আকারে ঋগ্বেদের সময়ে মানুষের মনে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু শাখা প্রশাখা নিয়ে এর সম্যক বিকাশ ঘটেছিল অনেক পরে—পৌরাণিক যুগে।

অপর বৈদিক ধারাটি ব্রহ্মবাদের বীজরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন সূক্তে যেমন—আত্মাসূক্ত-বা পুরুষসূক্ত এবং উপনিষদের মন্ত্রে। এখানে ঋষির ধ্যানে মহান সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—ঈশ্বর সমুদয় জগতের মধ্যে ওতঃপ্রোত, সমুদয় জগৎ সংসার তাঁরই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট—তিনিই সব হয়েছেন—জগৎ সংসার তাঁরই লীলা।

• ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

—এই গতিশীল বিশ্বে যা কিছু গতিশীল সমস্তই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত। এই চলমান জগৎ এক অচল সত্তারই অভিব্যক্তি মাত্র। এবং এই অচঞ্চল স্থির সত্তাই ঈশ্বর।

পূর্বে উল্লেখ করা গেছে যে মানুষের বোধে ধর্ম চেতনা বা ঈশ্বর-

জিজ্ঞাসা তখনই জাগ্রত হয়েছে যখন সৃষ্টি রহস্য অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পরিচয়, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতির সঙ্গে তার মনে জগতের কারণ ও কারক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছে। এবং ক্রমউপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের প্রাণে এই জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

এখন বেদের দার্শনিক মতধারাগুলি পর্যালোচনা করে কি বোঝা গেল তা প্রাঞ্জল করা যাক। ঈশ্বর অন্বেষণের প্রথম পর্বে বেদের ঋষিকুল বহুদেবতার কল্পনা করেছেন প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পরিচয় পেয়ে এবং স্তব-স্তুতির মাধ্যমে তাঁদের অর্চনা করেছেন। তবে হয়ত বা সে সময় কোন কোন মহান ব্যক্তি সত্তাতেও দেবত্ব আরোপিত হয়ে থাকতে পারে—ইন্দ্র দেবতার ক্ষেত্রে এ দিকটিও বিচার্য। ক্রমে বহুদেবতার স্তর থেকে মানুষের উপলব্ধি অতিদেবতার স্তরে পৌঁছাল। অতি দেবতা অর্থে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। ঈশ্বরই তো সর্বশক্তিমান, সর্বদৃশ্যমান—তিনিই একেশ্বর। এই একেশ্বরবাদ একটি দার্শনিক চিন্তাধারা নিয়ে সত্য যা পরবর্তী পৌরাণিক যুগে ভক্তিবাদ অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের কথায় প্রতিফলিত হয়েছে। ভক্তের ভক্তি অর্ঘের পূজারতিই তাকে ভগবানের কাছে নিয়ে যায় অর্থাৎ তার ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন। এখানে ব্যক্তি সত্তা বা প্রতীক সত্তা বা সাকার আরাধনার মাধ্যম স্বরূপোলব্ধির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরোপলব্ধি।

আবার অন্য ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ধর্মচিন্তার অপর এক পথে বেদের ঋষির মনে জাগ্রত হয়েছে 'সর্বেশ্বর' ঈশ্বর ভাবনা। সর্বশক্তির আধার ঈশ্বরই জীবজগৎ সব হয়েছেন। জগৎ ও জীবনের মাঝে তিনি ওতঃপ্রোত। তিনি এক ও অদ্বিতীয়—বহু হয়েছেন—বহুর মাঝে তাঁর লীলা আর ঐ লীলাই মহাশক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি অর্থাৎ জীবজগতের মধ্যে নানা শক্তির বিকাশ। এই ভাবনা জন্ম দিল উপনিষদ যুগের ব্রহ্মবাদকে।

এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে যোগসূত্র আছে কারণ এগুলি একই ঈশ্বরের দুইরূপ চিন্তা। ঈশ্বরের সাকার রূপ ও নিরাকার রূপ রহস্যের ঠিকানা আমরা এর ভিতরেই খুঁজে পাই। পরবর্তী কালের শিব-ভাবনায় এই দুই ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে দেখা যায়। বৈদিক ঈশ্বর ভাবনা ক্রম-পরিণতির মধ্য দিয়ে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা সুপরিস্ফুট হবে নীচের ছকটিতে।
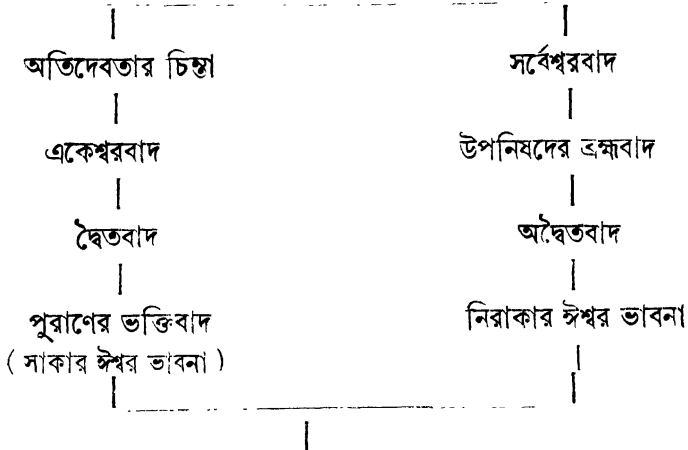
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় চিন্তা একই ঈশ্বর তাঁর বহুরূপ, বহু নাম। ঈশ্বরেই সব, সবেতেই ঈশ্বর। ঈশ্বরের সাকার রূপও সত্য, নিরাকার রূপও সত্য।

গভীরভাবে চিন্তা করলে একটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে প্রাচীনকালে মানুষ তার আত্মিক চিন্তায় বা ধ্যানে মানবের পরম জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে যে গভীর সত্যের সন্ধানে ফিরেছিল তা লাভ করার পূর্বে যে সত্যগুলি উপলব্ধি করেছিল সেগুলি অখণ্ড সত্যেরই কণা ও চরম সত্যেরই দ্যুতি মাখা। সুতরাং সেই প্রাচীন যুগে মানুষের মনে ধর্মচিন্তার দুটি পৃথক ভাবধারা গড়ে উঠলেও একটির সঙ্গে অন্যটির যে একেবারে যোগ নেই বা একটি অন্যটির পরিপূরক নয় একথা মনে হয় না। ঈশ্বর যিনি সর্বশক্তিমান তাঁর বিভূতির অন্ত নেই—তিনি একাই সব আবার সবেই তিনি। বিভিন্ন রূপে তিনি প্রতিভাত হতে পারেন। তাঁর কোন আকার নাও থাকতে পারে। বিভিন্ন শক্তির মধ্যেই মহা-শক্তির প্রকাশ।

বৈদিক যুগের একেশ্বরবাদ মূর্ত হয়েছে পৌরাণিক যুগে প্রতীক বা মূর্তি উপাসনার মধ্যে। মানুষ ভক্তি অর্ঘে ঈশ্বরের প্রতীক সত্তা বা মূর্তি যা

তার মানস-কল্পনা তার আরাধনা করে ঈশ্বর বা পরমব্রহ্মকে লাভ করেছে। ঋগ্বেদে আমরা দেখি একেশ্বরবাদী ভাবধারায় ঋষিকুল প্রাকৃতিক শক্তির বৈশিষ্ট্যগুলিকে দেবতারূপে ধারণা করে স্তুতি করতেন—ক্রমে ঐ ধারণা তাঁদের ধ্যানে আরও গভীর হয়ে প্রতিভাত হল। বিশ্বকর্মা বা প্রজাপতি বা ইন্দ্র ক্রমে সর্বশক্তিমান একেশ্বর ঈশ্বররূপে কল্পিত হলেন। ক্রমে ঋষির ধ্যানে প্রতিভাত হয়েছিল প্রকৃতির সংহার রূপ—ধ্বংস রূপ—ঋষির ধ্যানে জাগলো ঈশ্বরের রুদ্ররূপ কল্পনা। বেদে রুদ্র দেবতার সূক্তি রচনা হল—সম্ভবতঃ পৌরাণিক যুগে এই রুদ্র দেবতাই শিবরূপে কল্পিত হয়েছেন। একই ভগবানের নানা রূপ নানা নাম। রুদ্র দেবতার চিন্তা যখন মানুষের মনে এসেছিল বেদের সেই সময় সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পঞ্চদশশত শতাব্দী। যজুর্বেদ সংহিতায় ও পরবর্তীকালে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্রে রুদ্র দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। এগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় সম্ভবতঃ রুদ্র দেবতা ক্রমে ক্রমে তাঁর ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপের সঙ্গে মঙ্গলময় রূপেও উপলব্ধ হয়ে পরম দেবতা শিব হয়েছেন।

ঋগ্বেদে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে শিবের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে রুদ্র দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্ত্রগুলি পাঠ করে স্পষ্টই সেগুলির ভিতর শিব দেবতার ছায়া দেখা যায়। বেদে রুদ্রের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে তিনি ক্রোধপরায়ণ ও ধ্বংসপ্রবণ রূপে কল্পিত। এখানে ভক্তির প্রেরণা যেন ভয়। আবার তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভিষক রূপে খ্যাত। সুতরাং তাঁর কল্যাণের দিকও ধারণা করা হয়েছিল। এই রুদ্র দেবতার যা বর্ণনা পাওয়া যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনিই যে পরবর্তী কালে শিব হয়েছেন এ ধারণা নিতান্ত অমূলক নয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে আর্য-অনার্য বিরোধ শান্তি করার জন্য অনার্য দেবতা শিবকে আর্য দেবতা রুদ্রের সঙ্গে মিলিত করতে হয়েছে। এই মতের সমর্থনে যে সব ঘটনা, কিংবদন্তী ইত্যাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে সেগুলিকেও যে একেবারে অস্বীকার করা যায় তা নয়। মনে হয় একথা বলা অযৌক্তিক নয় যে আদিতে শিব হয়তো অনার্যদের দেবতা ছিলেন। তাঁর প্রভাব ও শক্তি এতই বেশি ছিল যে আর্যরা তাঁকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন আর্য অনার্য সংঘর্ষের সন্ধি-সূত্র হিসাবে। বৈদিক এবং তারই পরিণতি হিসাবে ঐ শৈবমত হিন্দুধর্মে এক বিশিষ্ট রূপ নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে উত্তর হতে দক্ষিণ এবং পূর্ব হতে

পশ্চিম সীমা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। শুধু তাই নয় ভারতের আর্য-অনার্য উচ্চনীচ জাতি, উপজাতি সকল শ্রেণীর মধ্যে শৈব ধর্ম সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম রূপে শান্তম্ শিবম অদ্বৈতমের দ্যোতনা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্যের সঙ্গীত নিঝর্র, পবিত্রতার গঙ্গাজল ও সুন্দরের অমলিন ছবি নিয়ে।

এছাড়া অন্য যে এক সম্ভাবনার ইঙ্গিতও ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল ভারতবর্ষে বার বার আগত আর্যদের মধ্যে কিছু রীতি নীতি ও চিন্তাদর্শের পার্থক্য (যদিও অনার্যদের সঙ্গে বিরোধ ব্যাপারে তাদের পরস্পরের সংহতি অক্ষুণ্ণ ছিল বলে অনুমিত হয়)। এই রীতি নীতির বৈষম্যের জন্য পূর্বাগত ও নবাগত আর্যদের মধ্যে সংস্কৃতি গত বিরোধ যে একটা থেকে গিয়েছিল তা বৈদিক সাহিত্য থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায়। এই রীতি বৈষম্যের ফলে আর্যদের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে দুই শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। একদল ছিল ক্রিয়াকাণ্ড আচার সর্বস্ব প্রবৃত্তি মার্গী ও সংস্কারবাদী গোঁড়া ও অন্যদল উদার এবং নিবৃত্তি মার্গী পার্থিব ব্যাপারে অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় নিস্পৃহ। অনেকের মতে এই নিবৃত্তি মার্গীরাই ছিলেন শিব সমর্থক। ক্রমে শৈবমত ও শিব-অনুবর্তীদের প্রভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিব বিশিষ্ট দেবতা বলে স্বীকৃত হলেন। তিনি মান্য হলেন দেবাদিদেব মহাদেব বলে।

বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র দেবতার স্তবগুলি পাঠ ও বিচার করলে মনের পটে রুদ্রদেবের এক স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে এবং তাঁর ক্রমবিকশিত বিভিন্ন গুণাবলীও আমরা লক্ষ্য করি শিবরূপের ছায়া সেখানে খুবই প্রকট ও প্রাঞ্জল। এখন ঐ সকল স্তব বা মন্ত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ঋগ্বেদের ২৭ সূক্তের ১০ম ঋকে রুদ্রকে সর্বপ্রথম অগ্নির রূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আচার্য সায়ণ বলেন, রুদ্ ধাতুর একটি অর্থ শব্দ করা অথবা গর্জন করা বা রোদন করা। ৩৯ সূক্তের ৪র্থ ঋকে মরুৎগণকে রুদ্রাসঃ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সায়ণাচার্য 'রুদ্রাসঃ' অর্থে 'রুদ্র পুত্রা মরুতঃ' করেছেন। রুদ্র মরুৎগণের পিতা। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রুদ্রের আদিম অর্থ বজ্র বা বজ্রধারী মেঘ। আমরা ঋগ্বেদে তিন দেবতার উল্লেখ দেখতে পাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। ঋগ্বেদ সংহিতাতেই তাঁদের আদিম বৈদিক পরিচয় আছে। ব্রাহ্মণস্পতির কথা

১ম মণ্ডলের ১৮ সূক্তে বলা হয়েছে—তিনি স্তুতি দেব। ২২ সূক্তে বিষ্ণু দেবতার কথা বলা হয়েছে—বিষ্ণু অর্থে সূর্যদেব। আর ৪৩তম সূক্তে রুদ্রদেবের সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি বজ্রদেব। এই বহুদেবতাবাদ ১০ম মণ্ডলের ৮২ ও ১২১ সূক্তে একেশ্বর বাদের দিকে ঝুঁকেছে যথা সকল ঐশ্বরিক কাজের এক ঈশ্বর বিশ্বকর্মা বা হিরণ্যগর্ভের কল্পনা। তারপর দেখা যায় এই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ। এ তিনটি কাজ পৃথক পৃথক নির্দেশ করবার জন্যে ঋষিগণ তিনটি নামের অন্বেষণ করলেন। তাঁরা নতুন নাম উদ্ভাবন না করে প্রাচীন বৈদিক নামই গ্রহণ করলেন। স্তুতিদেব ব্রাহ্মণস্পতির নাম নিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি কার্যে দেবতাকে ব্রহ্মা নাম দিলেন, সূর্যদেব বিষ্ণুর নাম দিয়ে ঈশ্বরের পালন কার্যের দেবতার নাম দেওয়া হল বিষ্ণু, আর বজ্রদেব রুদ্রের নাম নিয়ে ঈশ্বরের বিনাশ কার্যর দেবতার নাম দেওয়া হল রুদ্র।—একই ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির অভিব্যক্তির ওপর আরোপিত ব্যক্তিসত্ত্বা।

প্রকৃতির তাণ্ডবতা ও তার বিধ্বংসী ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ ঋষির মনে রুদ্রদেবের কল্পনা এনেছিল। তিনি ক্রোধের ও সংহারের দেবতা রূপে কল্পিত হলেন। তাঁকে ভয়ে শ্রদ্ধায় তাঁর ক্রোধ প্রশমনের জন্য ও তাঁর কৃপার জন্য স্তুতি করলেন ঋষি—

"নমস্তে রুদ্র মনাব উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নম। যা তে রুদ্র শিব তনুরঘেবাহ পাপকাশিনী তথা নস্তন্বা শান্তময়া গিরি-শস্তাভিচাকশী হি॥ যামিষুং হিংসী পুরুষং জগৎ॥ শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা গিরিশাচ্ছা বদামসি। যথা নঃ সবমিজ্জগথক্ষ্মং সুমনা অসৎ। অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীশ্চ সর্বাজ্ঞ ন্তয়ত্ সর্বাশ্চ যাতুধান্যো হধরাডীঃ পরা সুব॥ [শুক্ল যজুর্বেদ, ১৬শ অধ্যায়]

অর্থাৎ হে দুঃখ নাশক জ্ঞানপ্রদ রুদ্র! তোমার ক্রোধের উদ্দেশে নমস্কার, তোমার বাণ ও বাহুযুগলকে নমস্কার করি। হে রুদ্র তোমার হে মঙ্গলময়, সৌম্য পুণ্যপ্রদ শরীর আছে, হে গিরিশ, শত্রুর প্রতি নিক্ষেপের জন্যে তুমি হস্তে যে বাণ ধারণ করেছ, হে প্রাণিগণের ত্রাতা তা কল্যাণকর কর, পুরুষ ও জগতের হিংসা করো না। গিরিশ, মঙ্গলময়, স্তুতি বাক্যে তোমায় পাবার জন্য প্রার্থণা জানাই যাতে জগতের সকলে নীরোগ ও শোভন মনস্ক হয়। হে অধিক বদনশীল, আমায় সর্বাধিক বল দাও। তুমি সকলের পূজা ও স্মরণ মাত্র দেবগণের হিতকারী

ভিষক। হে রুদ্র, সকল সর্প ও ব্র্যাঘ্র বিনাশ করে অধোগমনশীল রাক্ষসীদের দূর করে দাও।”

ঋষির এ স্তবমন্ত্রটি (শতরুদ্রিয় নামক বেদমন্ত্র) অপূর্ব! রুদ্র দেবতার স্তুতি এবং তাঁর করুণা যাঞ্চার সঙ্গে স্তব রচয়িতার সুন্দর মানব হিতকারী ও জগৎ কল্যাণকর মনোবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই মন্ত্রটি পড়ে কি মনে হবে না যে এটি শিবের একটি বন্দনা স্তব যিনি এখানে রুদ্র দেবতা হিসাবে কল্পিত? এখানে সকল কিছুর ভিতর রুদ্রের প্রকাশ অনুভব করে তাঁকে সকল মানুষের পক্ষ থেকে প্রণতি নিবেদন করছেন বেদের উদ্গাতা ঋষি।

পর্যালোচনা করা যাক, কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে রুদ্রদেবের কল্পনা করা হয়েছিল? প্রকৃতির রুদ্ররোষ, তার তাণ্ডব লীলা, নানারূপ দুঃখ কষ্ট, আধিব্যাধি থেকে ও অন্য প্রাণীর হিংস্রতা থেকে মুক্তির জন্য কি রুদ্র দেবতার করুণা প্রার্থনা? না কি, রুদ্রদেব ভয়ঙ্কর কোন শক্তি সত্তা নিয়ে মানব মনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যে দেবসত্তা জনমনে ভয় ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন ছিল। যদি তাই হয়ে থাকে তবে সেটি কি কোন অতিমানস সত্তা বা আর্যেতর কোন মহান ব্যক্তিত্ব? কালস্রোতে এই দেব ভাবনা হয়তবা অতিদেবতা, পরমেশ্বর বা মহাদেবের রূপ-কল্পনা নিয়ে থাকবে।

এখন উপরের সূক্তিটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক রুদ্র কল্পনায় ঋষির ভাবরূপ কিরূপ প্রতিফলিত হয়েছে! এখানে ঋষি যেন জগতের সমুদয় বস্তুর মধ্যে রুদ্রের প্রভাব অনুভব করছেন। রুদ্রকে গিরিশ অর্থাৎ গিরি অধিপতি বলা হয়েছে—তিনি গিরি অর্থাৎ কৈলাস থেকে সুখ বিস্তার করেন। পর্বতে যিনি অবস্থান করেন তিনিও গিরিশ। আবার গিরিশ অর্থে মেঘ যার থেকে বৃষ্টিরূপ মঙ্গল ঝরে রুদ্রের দাক্ষিণ্যে। এখানে প্রাকৃতিক শক্তিই সম্ভবত রুদ্ররূপে কল্পিত হয়েছে যা জীমূত পুঞ্জ, অশনি তুফান-প্রখর আতপ-এ সকল প্রলয়ঙ্কর অভিব্যক্তরূপ। কিন্তু শিব রূপে এই প্রাকরূপ রেখা কত না কাছাকাছি। তাছাড়া এখানে রুদ্র দেবতাকে অধিক বদনশীল বলে অভিহিত করা হয়েছে। হরপ্পায় প্রাপ্ত নৃত্যশীল নটরাজ শিবের প্রাক মূর্তি বলে অনুমিত মূর্তিটি ত্রিমুখ বিশিষ্ট ছিল বলে অনুমান করা হয়। অথবা ত্রিমুখ কি একই অবয়বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের কল্পনা। প্রাকৃতিক রূপ কল্পনার কথা যদি মনে করা হয় তাহলে কি পর্বতের শৃঙ্গগুলি রুদ্রের বিভিন্ন বদন হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে?

আমরা আবার দেখি পরবর্তী রুদ্রদেব সম্পর্কিত মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গল যে চৈনং রুদ্রা অভিতোদিক্ষু শ্রিতা সহস্রশোহ বৈষাং হেড ঈমহে॥ অসৌ যোহবসপতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্নুদহার্যঃ স দৃষ্টো মৃডয়াতি নঃ॥ নমোহস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে। অথো যো অস্য সত্বানোহহং তেভ্যোহ করং নমঃ। প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরাত্মোর্জ্যান্। যাশ্চ তে হস্ত ইষব পরা তা ভগ রোপব॥ বিজ্যং ধনুঃ কপর্দিনো বিশল্যো বাণবাউত। অনেশন্নস্য যা ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধি"—

অর্থাৎ যিনি রবিরূপ রুদ্র, উদয়ে ও অস্তকালে রক্তবর্ণ অন্য সময় পিঙ্গল বর্ণ ও মঙ্গলময়, যিনি সহস্র কিরণ, পূর্বাদি দিক আশ্রয় করেছেন তাঁর ক্রোধ আমরা ভক্তি দ্বারা দূর করবো। যিনি আদিত্যরূপে নিরন্তর গমন করেন, যাঁকে গোপগণ ও জল আহরণকারিণী রমনীগণও দেখে থাকে, তিনি দৃশ্য হয়ে আমাদের সুখ দিন। চির তরুণ সহস্রাক্ষ নীলকণ্ঠের প্রতি আমার নমস্কার। তাঁর যারা ভৃত্য, তাদেরও আমি নমস্কার করছি। হে ভগবান, তোমার ধনুকের উভয় দিকের জ্যা খুলে ফেল ও তোমার হাতের বাণ ফেলে দাও। জটাজুটধারী রুদ্রের ধনু জ্যা রহিত হোক, তার বাণের অগ্রভাগ রহিত হোক, বাণগুলি নষ্ট হোক, তুণীর শূণ্য হোক।"

এখানে সূর্যদেবতাকে রুদ্ররূপে স্তুতি করা হচ্ছে। ঋষির এই মন্ত্রটি প্রাণের আবেগ প্রসূত। জাগতিক সর্ববস্তুর মধ্যে রুদ্র রয়েছেন। সর্বেশ্বর রুদ্রের কল্পনা। যিনি কল্যাণ করতে পারেন, যিনি প্রসন্ন হলে মানুষের পরম সুখ—চরম শান্তি। রুদ্রভগবানকে এখানে সহস্রাক্ষ নীলকণ্ঠ ও জটাজুটধারী মূর্তিতে কল্পনা করা হয়েছে। জাগতিক শক্তির অভিব্যক্তি ঈশ্বরের যে রূপ ঋষি প্রাণে অঙ্কিত করেছেন বা জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতির কম্পন প্রাণে নিয়ে তাঁর ধ্যানে পরমেশ্বর যে রূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন। এখানে জিজ্ঞাস্য যে পরবর্তী পৌরাণিক ও উত্তর-পৌরাণিক যুগে দেবাদিদেব মহাদেব শিবের যে মূর্তির কল্পনা করা হয়েছে সেটা কি বেদের ঋষির রুদ্রদেবতার রূপ কল্পনার ক্রম-অভিব্যক্তি নয়?

প. ঋষির ধ্যানে দেখি বিরাট মহিমময় ভগবান রুদ্র দেবতা রূপে বল ও এবং জগতের অবয়বে জাগতিক শক্তির নানারূপ অভিব্যক্তির

পরিপ্রেক্ষিতে এই দেবতার মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে—সেই রূপ কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করে তাঁকে অর্চনা করা হয়েছে। সীমাহীন আকাশের মেঘমালা কি তাঁর জটাভার? জ্যোতিষ্মান সূর্যের কিরণ কি তাঁর নয়ন জ্যোতি, উত্তুঙ্গ নীলাভ হিমালয় কি তাঁর গ্রীবা দেশ? আকাশের সপ্তরঙ্গ-ধনু কি তাঁর কার্মুক? অথবা তিনি কি ছিলেন কোন বিরাট অতিমানস সত্তা পৃথিবীর বুকে—যাঁর করুণা যাচ্ঞা করে স্তবার্চনা নিবেদন করেছেন বেদের ঋষিকুল?

যজুর্বেদ সংহিতার (শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ) অন্যান্য মন্ত্রগুলি পাঠে দেখা যায় যে, কোন কোন মন্ত্রে বিভিন্ন রুদ্র দেবতার কথা বলা হয়েছে এবং রুদ্র দেবতার চেলা চামুণ্ডাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বহু রুদ্র দেবতা কি রুদ্র দেবতার বিচিত্র গুণাবলীর অভিব্যক্তি? অনূদিত একটি মন্ত্র এখানে উল্লেখ করা হল। ঋষি স্তুতি করছেন—

"হে রুদ্র! আমাদের পুত্র পৌত্রদের হিংসা করো না, সে রূপে আমাদের আয়ু গাভী, অশ্বসমূহের হিংসা করো না। আমাদের ক্রুদ্ধ ভৃত্যদের হিংসা করো না। হবিযুক্ত আমরা সর্বদাই যজ্ঞের জন্যে তোমাকে আহ্বান করছি। হিরণ্যবাহু সেনানী রুদ্রকে নমস্কার, দিক সকলের পালক রুদ্রকে নমস্কার, হরিৎবর্ণ পত্রযুক্ত বৃক্ষরূপ রুদ্রকে নমস্কার, জীবগণের পালক রুদ্রকে নমস্কার, পীতরক্ত বর্ণ কান্তিমান রুদ্রকে নমস্কার, পথের পালক রুদ্রকে নমস্কার, নীলবর্ণ কেশযুক্ত যজ্ঞোপবীতধারী রুদ্রকে নমস্কার, মনুষ্যগণের পালক রুদ্রকে নমস্কার, বৃষারূঢ় শত্রুধ্বংসী রুদ্রকে নমস্কার, অন্নের পালক রুদ্রকে নমস্কার, সংসারের নিবর্তন রুদ্রকে নমস্কার, জগতের পালক রুদ্রকে নমস্কার, উদ্যতায়ুধ রুদ্রকে নমস্কার, দেহের পালক রুদ্রকে নমস্কার, সারথিরূপ রুদ্রকে নমস্কার, বনের পালক রুদ্রকে নমস্কার। লোহিতবর্ণ নৃপতিরূপ রুদ্রকে নমস্কার, বৃক্ষের পালক রুদ্রকে নমস্কার, ভূমণ্ডলের বিস্তারক রুদ্রকে নমস্কার, ধনদাতা রুদ্রকে নমস্কার, ওষধি সমূহের পতি রুদ্রকে নমস্কার, আলোক-রূপ রুদ্রকে নমস্কার, বণিকরূপ রুদ্রকে নমস্কার, লতাগুল্ম বীরুধের পালক রুদ্রকে নমস্কার, যুদ্ধে মহাশব্দকারী রুদ্রকে নমস্কার, পদাতিদের পালক রুদ্রকে নমস্কার, যুদ্ধে আয়তধনু শীঘ্রগামী রুদ্রকে নমস্কার, শরণাগত-জনের পালক রুদ্রকে নমস্কার, শত্রুর পরাভব ও বিনাশকারী রুদ্রকে নমস্কার, শূরসেনার পালক রুদ্রকে নমস্কার, মহান তূণরূপ রুদ্রকে নমস্কার, গুপ্তচোরদের পালক রুদ্রকে নমস্কার, গৃহাদি চুরি করবার ইচ্ছায় গমন-

কারী রুদ্রকে নমস্কার, বনের পালক রুদ্রকে নমস্কার। [মন্ত্র ১৬-২০, শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা ষোড়শ অধ্যায়]

এই মন্ত্রে রুদ্রদেবতার সর্বশক্তিমানবত্তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সংহাররূপী রুদ্র এখানে আবার রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। অস্পষ্ট এক ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে যে জগতের ভাল মন্দ সকল কিছুর তিনি অধীশ্বর। তিনিও জীবন বিকাশের হোতা—জীবনের সকল রূপের মধ্যে তাঁর প্রকাশ। যদিও নিতান্ত পার্থিব কামনায় ভরা এ মন্ত্র তবু একের মধ্যে বহুবোধের এক অস্পষ্ট ভাব যেন পরিস্ফুট হয়ে আছে এ মন্ত্রের ভিতর। আর রুদ্রদেবের প্রতি এই স্তব যদি এক বিরাট শক্তিসম্পন্ন অতিমানস সত্তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে থাকে তবে সেই বিরাট পুরুষ এখানে মহাদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত।

যজুর্বেদ সংহিতার অপর একটি মন্ত্রে রুদ্র সম্পর্কে অন্য দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। মন্ত্রটি হল :—

নীল গ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠা দিবং রুদ্রা উপশ্রিতাঃ। সহস্র যোজনে হব ধন্বানি তন্মসি। নীলগ্রীবা শিতিকণ্ঠাঃ শর্বা অধঃ ক্ষমচরাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥ যে ভূতামধিপতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দ্দিনঃ। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥ যে পথাং পথিরক্ষয় ঐলবৃদা আয়র্যুধ.। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥

অর্থাৎ দ্যুলোকে যে নীলগ্রীব শিতিকণ্ঠ রুদ্রগণ আছে; তাদের ধনুগুলি জ্যা-হীন করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি, বৃক্ষসমূহে যে হরিৎবর্ণ, নীলগ্রীব, রক্তহীন তেজোময় শরীর বিশিষ্ট রুদ্রগণ আছে, তাদের ধনুগুলি জ্যা-রহিত করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। মানুষের উপদ্রবকারী ভূতগণের অধিপতি, মণ্ডিত কেশ ও জটাজুটযুক্ত রুদ্রগণ আছে, তাদের ধনুগুলি জ্যা-রহিত করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। লৌকিক ও বৈদিক মার্গের পালক অন্নের রক্ষক, প্রাণ দিয়ে যুদ্ধকারী রুদ্রদেব ধনুগুলি জ্যা-হীন করে সহস্রযোজন দূরে নিক্ষেপ করছি।

এই মন্ত্রটিতে রুদ্রদেবের অন্য পরিচয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বহুরুদ্রের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের স্তুতি করা হয়নি বরং অসন্তোষ প্রকাশ দ্বারা বিরুদ্ধাচারণ করার আভাষ রয়েছে সুস্পষ্ট। রুদ্রদের হীনবীর্য করার সঙ্কল্প নেওয়া হয়েছে। মানুষের উপদ্রবকারী ভূত—

গণের অধিপতি বলে তাঁদের অভিহিত করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে পৌরাণিক বা মহাভারতের যুগে নিষাদদের দেবতা হিসাবেও শিবের উল্লেখ আছে—তিনি বনে থাকেন—আবার আমাদের পুরাণ কথিকায় বলে শিবের শ্মশানে মশানে বাস—ভূত প্রেত তাঁর চেলা চামুণ্ডা। এটি কি শিব-অনার্য পূজিত ছিলেন এই ইঙ্গিত দিচ্ছে নাকি? সর্বসংস্কার মুক্ত শৈবধর্মাচার আর্য-অনার্য-নিষাদ প্রভৃতি সর্বজাতির মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল এই বিষয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

হয়ত বা বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে দুই মত ধারা গড়ে উঠেছিল যে কথার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। ঐ দুই ধারার মধ্যে একটি শৈবমত ধারা অন্যটি গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধারা। শৈব ধারাটি (এখানে রুদ্র দেবতাকে শিব বলেই ধারণা করা হচ্ছে) অ-নার্য সংস্কৃতি হতে উদ্ভূত হয়েছিল কিনা সঠিক বলা না গেলেও এবং বৈদিক ধর্মের মধ্যে এটি জন্মলাভ করেছে এ সিদ্ধান্তে এলেও—প্রকৃত শৈব ধর্মমত আর্য-অনার্য দুই ভাবধারার মিশ্রণে যে সৃষ্ঠ ও পুষ্ট এ ধারণা অযথার্থ নয়। বৈদিক ধর্ম ও সমাজের মধ্যে প্রকৃতি ও রুচিগত ব্যাপার নিয়ে সম্ভবত দুটি দল গড়ে উঠেছিল। সংহিতায় দেখা গেছে দেবতাদের স্তব স্তুতির মধ্যে দিয়ে মানুষের পার্থিব কামনারই আকুতি প্রবল। এই চিন্তাধারা নিয়ে গড়ে উঠেছিল প্রবৃত্তিমার্গী বৈদিক গোষ্ঠী। এঁরা ছিলেন অতিশয় গোঁড়া—বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন—অনার্যদের সম্পর্কে এঁদের ভয়ানক রকম বীতস্পৃহা ছিল। বৈদিক সংস্কৃতির কোন রকম রূপান্তর এঁরা চাইতেন না। আর এক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল যাঁরা ছিলেন নিবৃত্তিমার্গী—সংস্কারবাদী। এঁদের আচার আচরণ ছিল উদার এবং সরল। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রূপী শিব এঁদের বিধাতা। এই গোষ্ঠী মনে হয় অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির মিলনের পক্ষপাতী ছিল। প্রবৃত্তিমার্গী বৈদিক আর্য ও নিবৃত্তিমার্গী বৈদিক আর্যদের মধ্যে তাই আদর্শগত মনোমালিন্য ছিল। তার পরিচয় মেলে দক্ষ ও শিবের বিরোধ কাহিনীতে পুরাণে যে আখ্যান সুন্দররূপে চিত্রিত হয়েছে। অবশ্য অনেক পণ্ডিতজনের অভিমত যে দক্ষ ও শিবের বিরোধ আর কিছু নয় আর্য-অনার্য বিরোধের চিত্র। তবে একথা সঠিক মনে হয় যে শিব-অনুবর্তীরা আসলে নিবৃত্তিমার্গী ছিলেন। তাঁরা নিবৃত্তির মাধ্যমে মুক্তিলাভের পথ পেয়েছিলেন। শুক্ল যজুর্বেদের সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটির মধ্য দিয়ে ঋষি কিন্তু শিব বা রুদ্রকে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়

সুখেরই কারক বলে জেনেছেন।

"নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ।
নমঃ শিবায় শিবতরায় চ॥"

সংহিতার কাল থেকে বেদান্তের যুগ এই সুদীর্ঘকাল পরিক্রমায় রুদ্রদেবতার কল্পনায় অনেক পরিবর্তন দেখা যায়—তাঁর ভাবরূপে ঘটে অনেক পরিমার্জন। বেদান্তের যুগে রুদ্রের কথা থাকলে রুদ্র সেখানে শিবই হয়েছেন। এখানে দেবতা থেকে তিনি সর্বেশ্বর। তিনি অমৃতাক্ষর হরঃ। অবিদ্যা হরণ করেন তাই তাঁর নাম হর। তিনি অমৃতাক্ষর—অমৃত ও অক্ষর। তিনি অমৃতময় ব্রহ্ম।

উপনিষদগুলির মধ্যে সর্বশেষ রচিত হয়েছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। বিশ্বের আদি কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নিয়ে এই উপনিষদের শুরু। আমরা কোথা হতে এসেছি, আমাদের এ জীবন ধারণ কার জন্য—কোথায় আমাদের স্থিতি? অনেকগুলি মতকে প্রত্যাখ্যান করে শেষে এক পরমদেবতাকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ বলা হয়েছে। এ দেবতা নিত্য শক্তি—গুণময় আবার গুণাতীত। এঁরই শক্তিতে ব্রহ্মচক্র আবর্তিত হচ্ছে, তাতে বাঁধা পড়ছে জীব, আবার পরমদেবতার প্রসাদে তাঁর সাযুজ্যবোধে জীব মুক্তিলাভ করছে। ব্যক্ত অব্যক্ত, ক্ষর অক্ষর, অজ্ঞ অনীশা ঈশ্ব প্রধান পুরুষ—এ সকল দ্বৈতর উৎপত্তিস্থল সেই পরমদেবতা। জীবের মধ্যে তিনিই আবার ভোগ্য, ভোক্তা ও প্রেরিতা। তিনিই এক হয়ে তিন, তিন হয়েও এক—তাঁকে জানলেই জীবের জন্ম মৃত্যুরূপী ভববন্ধন হতে মুক্তিলাভ হয়।

এরপর বলা হয়েছে যে যোগী আত্মতত্ত্বের প্রদীপের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শনে সমর্থ হন। তারপর বলা হয়েছে সর্ব মানবের অন্তরে স্থিত যিনি অন্তর্যামী তিনিই অখণ্ড পুরুষ।

চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায় পরমেশ্বরের সর্বেশ্বরত্ব চিন্তার দ্যোতনা। এখানে পরমেশ্বর একাধারে রুদ্র, অন্য দিকে তিনিই শিব। তিনি রুদ্র রূপে ভয়ের উদ্রেক করেন এবং শিবরূপে সকলের মঙ্গলবিধান করেন। তিনিই সর্বভূতে প্রচ্ছন্নরূপে বর্তমান অথচ তিনি সব কিছুরই অতীত। তাঁর মধ্যে দিনও নেই, রাত্রিও নেই। তিনি সদাসদের পারে—তাঁর নেই কোন উপমা—নেই কোন প্রতিমা। এই প্রকৃতি পরমেশ্বরের মায়াজাত। তাঁর অবয়বরূপে কল্পিত বস্তু সমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ তাঁকে চোখে দেখা যায় না, তাঁকে মনের মধ্যে অনুভব

করা যায়। এই অনুভবের ফলসিদ্ধি হল মায়াবদ্ধ জীবের সর্ববন্ধন হতে মুক্তিলাভ।

ঐ উপনিষদে পরিশেষে বলা হয়েছে পরমদেবতাই বিশ্ব-কারণ। পরমদেবতা হলেন রুদ্র অর্থাৎ শিব (এখানে সবিতাকেও পরমদেবতা বলা হয়েছে)। তিনি সকল প্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রয়েছেন, সর্বব্যাপী কর্মাধ্যক্ষ, নিরুপাধিক ও গুণাতীত। তেমনি আবার তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য ও নিরঞ্জন। তাঁর দীপ্তিতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দীপ্তিময় হয়। তারপর বলা হয়েছে উর্ণনাভের জালের মত হল মায়া-শক্তি এবং তাঁর দ্বারা অথাৎ নাম, রূপ ও কর্মের দ্বারা পরমেশ্বর আপনাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। তিনি শুভবুদ্ধিদায়ক। ঋষি তাঁর কাছ থেকে শুভবুদ্ধি প্রার্থনা করেছেন যাতে ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শিব কি তা যেন প্রথম পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এই উপনিষদেই ভক্তিবাদের জন্ম যার পূর্ণ প্রকাশ ঘটল পরবর্তী পৌরাণিক যুগে পুরান কথিকার মধ্যে।

"যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। ৬/২৩

—পরমদেবতা ও গুরুতে যার অচলা ভক্তি রয়েছে তার নিকটেই সত্যতত্ত্ব (উপনিষদের তত্ত্ব) প্রকাশ পায়। ঐ সত্যতত্ত্বই শিবতত্ত্ব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বিশ্বনাথ রুদ্রের (শিবের) উদ্দেশ্যে যে স্তুতি মন্ত্র নিবেদিত হয়েছে সেগুলি নীচে দেওয়া হল :—

যো দেবানং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্র মহর্ষিঃ।

হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়াসংযুনক্তু॥ ৪/১২

—"যিনি দেবগণের জন্ম ও ঐশ্বর্য লাভের হেতু, যিনি বিশ্বের অধিপতি সর্বদর্শী রুদ্র, যিনি হিরণ্যগর্ভের জন্ম প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি আমাদের কল্যাণময়ী বুদ্ধি প্রদান করুন।"

[বেদে পিঙ্গলবর্ণ হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ আছে।—তিনি শক্তিমান দেবতা। হিরণ্যগর্ভ হতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে। রুদ্র প্রাচীন দেবতা।]

অথবা, একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ য

ইমাঁল্লোকান ঈশত ঈশনীভিঃ।

প্রত্যঙ্‌ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে সংসৃজ্য

বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥ ৩/২

যেহেতু একমাত্র রুদ্রই বর্তমান, সেই কারণে ব্রহ্মবিদগণ দ্বিতীয় আর কোনও বস্তুর অপেক্ষায় থাকেন না। যে রুদ্র নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা এই সমুদয় লোক শাসন করেন, তিনিই প্রত্যেক জীবের অন্তরে অবস্থিত। তিনি এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং প্রলয়কালে তার সংহার করেন।

অপর আর এক মন্ত্রে রুদ্র প্রশস্তির মধ্য দিয়ে শিবের ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

"যাতে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাহ পাপকাশিনী।

তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাচাকশীহি ॥ ৩'৫

অর্থাৎ হে রুদ্র, হে গিরিশপ্ত, তোমার যে মঙ্গলময়, সৌম্য, পুণ্য-ব্যঞ্জক, স্বরূপমূর্তি তার দ্বারা আমাদের দিকে তাকাও আমাদের কল্যাণের পথে নিয়ে চল।

(গিরিশপ্ত অর্থে গিরিতে অবস্থিত হয়ে যিনি মঙ্গলময় সুখ বিধান করেন)।

সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ও বৈদিক সাহিত্যকে অবলম্বন করে পৌরাণিক যুগের পূর্ববর্তী শিব-ভাবনার ক্রমবিকশিত রূপের পর্যালোচনা করে দেখা গেল ভারতীয় জনজীবনে দেবাদিদেব মহাদেব শিবের আবির্ভাব কি ভাবে হয়েছিল।

শৈবধর্মের জন্ম, স্বরূপ ও সার্বজনীনতা

বেদবাদী ও শিববাদীদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সংঘর্ষ চলেছিল। বৈদিক কর্মকাণ্ডের কট্টর সমর্থকেরা ছিলেন গোঁড়া ও গণ্ডীবদ্ধ। তাঁরা শিবভক্ত ও শৈবধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে আদৌ ভাল ব্যবহার করতেন না—অনেক ক্ষেত্রে তাদের মনুষ্যের অযোগ্য বলে বর্ণনা করা হত।

শিববাদীরা শিবোপাসনা করতেন। তাঁরা কর্মকাণ্ড বহুল বৈদিক সমাজে একটা সংস্কার-বিপ্লব শুরু করেছিলেন। সে সময় বৈদিক সমাজ ছিল বর্ণাশ্রম নিয়ন্ত্রিত সমাজ। শিব-অনুগামীদের আদর্শনিষ্ঠা চারিত্রিক প্রভাব ও সঙ্ঘবদ্ধবল এত বেশি ছিল (শিব অনার্যদের দেবতা হিসাবে ধরলেও একথা সত্য) যে বেদবাদী বিধায়করা ক্রমে ক্রমে শিবোপাসকগণের প্রভাবে তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিবকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতরে নিবৃত্তিমার্গের আদর্শকে গ্রহণ করা সমীচীন মনে হয়েছিল। অপর পক্ষে একান্তভাবে নিবৃত্তি মার্গের অনুসারী শিব-অনুগামীরা যাঁরা সমাজ বিধান পরিহার করে তপশ্চর্যায় নিরত থাকতেন এবং বন পর্বতে বসবাস করতেন, তাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্মের সঙ্গে, যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের সঙ্গে, সমাজ সংগঠনের অনুকূল কাজকর্মের সঙ্গে একটা আপস-নিস্পত্তি করে মানব কল্যাণ, মানব বিকাশ ও সর্বস্তরে স্বধর্মের অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির জন্য উভয় আদর্শের সমন্বয় সাধন আবশ্যক বিবেচনা করে সে কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তখন প্রবৃত্তি-মার্গের সঙ্গে নিবৃত্তিমার্গের মিলন হল। বর্ণাশ্রমী সমাজের মধ্যে শিবের আদর্শ স্থান পেল। ত্যাগী সন্যাসীগণ গৃহীদের গুরু হিসাবে স্বীকৃত হলেন। যোগ হল শিবের সঙ্গে শক্তির—ত্যাগ সাধনার সঙ্গে ভোগ সাধনার। শিবশক্তি যুক্ত হয়ে এবং শক্তি শিবময়ী হয়ে শিবশক্তি মানুষের পরমারাধ্য হলেন। ভারতের প্রায় সর্বত্র শৈবধর্মের প্রচার প্রবাহ বয়ে গেল এবং উড্ডীন হল শৈবধর্ম ধ্বজা। গার্হস্থ জীবনের পরিণামে বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস জীবন গ্রহণই সমাজের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হল। মোক্ষ জীবনের চরম লক্ষ্য বলে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হল।

শিব-শক্তির মিলন চিন্তা কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতার মধ্যে রয়েছে এবং ঐ সময় থেকেই এই চিন্তাদর্শের সৃষ্টি বলে অনুমিত হয়। চতুর্থ অনুবাকে স্ত্রীরূপধারী রুদ্রের শক্তিদের উদ্দেশ্যে স্তুতি করা হয়েছে এইভাবে ;—

"সবদিকে ও বিশেষ রূপে বিদ্ধ করতে সমর্থ অব্যাধিনী ও বিবিধ্যান্তী স্ত্রীমূর্তিধারিণী যে রুদ্রদেবের শক্তিগণ আছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে নমস্কার। উৎকৃষ্ণগণ রূপ উগন সপ্তমাতৃকা ও দুর্গাদি উগ্রদেবতার উদ্দেশ্যে নমস্কার।

বলা যায় এ সময় শিব ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত ও আরাধিত, যথা—ভব, রুদ্র, শার্ব, পশুপতি, নীলগ্রীব, শিতিকণ্ঠ, কপর্দী, ব্যুপ্তকেশ, সহস্রাক্ষ, শতধম্বা, ও গিরিশ।

কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি মন্ত্রে শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপেরও অস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় সপ্তম অনুবাকে রুদ্র বা শিবের স্তুতি মন্ত্রে। মন্ত্রটি নীচে অনুবাদ করে উল্লেখ করা হল।—

"উমার সহিত বর্তমান যিনি, যিনি দুঃখের বিনাশক (রুদ্র), যিনি আদিত্যরূপে রক্তবর্ণ, যিনি অরুণবর্ণ, যিনি সুখ প্রাপক, যিনি পশুদের পালক, বিরোধীদের নাশের জন্য যিনি ক্রোধযুক্ত, যিনি বিরোধীদের নিকট ভীমরূপ, সম্মুখে, দূরে ও অন্যত্র অবস্থিত বিরোধীদের যিনি বিনাশক, সে রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে নমস্কার করছি।"—

সম্ভবত মন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের।

ত্যাগী যোগী সাধু সন্যাসীরাই শিব সাধনার প্রবর্তক, সে কারণে শিবারাধনার ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম বিহিত অধিকার ভেদ নেই—নেই ক্রিয়াকাণ্ডের বাহুল্য। এইসব নিবৃত্তিমার্গী সাধুসন্তরা সংসারাশ্রমের বাইরে গিয়ে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে আশ্রয় নিতেন, সাধনাশ্রম তৈরী করতেন। তাঁরা পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। সমাজান্তর্ভুক্ত ও সমাজ বহির্ভূত সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর নরনারী তাঁদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেত, তাঁদের জীবন ও উপদেশ থেকে আধ্যাত্মিক জীবনের অনুপ্রাণনা ও আস্বাদন পেত। তাঁরা সমাজের প্রবৃত্তিমার্গীয় ব্রাহ্মণ নেতাদের অন্ত্যজ-ব্রাত্য-বৃষল প্রভৃতি যাদের তাঁরা অনার্য বলে অভিহিত করতেন তাদের সংস্পর্শ হতে নিজেদের দূরে রাখতেন না। অপাঙ্‌ক্তেয়ের ছোঁয়ায় তাঁদের জাতপাত যেত না। ঈশ্বরকে উপাসনা করার অধিকারী সকলেই। অধ্যাত্ম সাধনায় অনধিকারী কেউ নয়

তাঁরা এই মত পোষণ করতেন। ব্রহ্মোপাসনার জন্মগত অধিকার মানুষ মাত্রেরই। কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অধিকার ভেদ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ বিশেষ সাধন প্রক্রিয়ায় অধিকার ভেদ স্বীকার করতেই হবে। জ্ঞানশক্তি, কর্মশক্তি, সংযম, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতির উৎকর্ষ ছাড়া উন্নত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনেও সামার্থ জন্মায় না, উন্নততর আধ্যাত্মিক সাধনপ্রণালীতে আত্মনিয়োগ করারও সামর্থ জন্মায় না। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা তো এইসব সাধনার উপরেই নির্ভর করে না। সকল মানুষের অন্তরে রয়েছেন পরমেশ্বর যাঁকে ঋষি বলেছেন ব্রহ্ম আর তিনিই একরূপে দেবাদিদেব মহাদেব—স্বয়ম্ভূ-শিব। ভক্তিযুক্ত প্রাণে সরল মনে পবিত্র ভাবে তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন। বাস্তবিক যে দেহে ব্রহ্ম বা শিব স্বয়ং বিরাজিত সেই দেহ কি অস্পৃশ্য হতে পারে। এই স্ববিরোধী চিন্তাধারা প্রাণের জড়তা ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বুদ্ধি প্রসূত। যে মনের অন্তর্যামী পরমব্রহ্ম সেই মন কি ব্রহ্মভজনা, ব্রহ্ম উপাসনা করার অধিকারী নয়? এই সত্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিবৃত্তিমার্গের সমাজত্যাগী সাধকরা সমাজ বহিভূর্ত বনবাসী পর্বতবাসী সদাচারী দুরাচারী আর্যকুলপতিত বা অনার্য জাতি প্রসূত সকল নরনারীর চিত্তেই অধ্যাত্ম ভাবের উদ্দীপনা জাগিয়েছেন। সকলকেই ব্রহ্ম আরাধনার অধিকার সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সকল শ্রেণীর মধ্যেই শিব-আদর্শ তাঁরা প্রচার করে বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্তে।

শিবমূর্তি বৈশিষ্ট্য ও শিবলিঙ্গ রহস্য
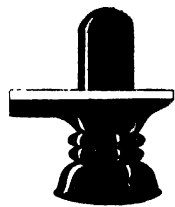
দেব-দেবীর মূর্তি কল্পনা—মূর্তি রহস্য ও মূর্তি পূজার শুরু হয়েছিল পুরাণের যুগ থেকে। প্রতীকোপাসনার মাধ্যমে ব্রহ্মোপাসনা। এই উপাসনার তাৎপর্য কি ? ফল কি এই মূর্তি আরাধনার ?

বিশ্ব বৈচিত্রের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে মানব-অধ্যাত্ম দর্শন-ভাবনা আবাঙ্‌মানস গোচর অ-রূপ ও নিগুর্ণ-ঈশ্বরের রূপ খুঁজে পায়নি, তাই অ-রূপকে নিরাকার ভাবনায় ভাবা হলো। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা করে সাধনা করা হয়তো সহজসাধ্য হয়নি অথবা আত্মোপলব্ধির উষালগ্নেই মানুষ ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করে তার ধারণাকে রূপায়িত করতে চেয়ে থাকবে। মানুষ ক্রমে বুঝল ঈশ্বরের সাকার রূপ ও নিরাকার রূপ দুই-ই সত্য—একই ঈশ্বর দুই গুণে গুণান্বিত।

বাস্তবিক মন ও ইন্দ্রিয় নিগুর্ণ ব্রহ্মের ধারণা করতে পারে না। সে কারণে নিগুর্ণ ব্রহ্ম ঈশ্বর উপাসনার বিষয়বস্তু নয়। সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়ে থাকে। তাই ঈশ্বর মানব কল্পনায় সাকারভূত হলেন। মূর্তি বা প্রতীক উপাসনার মধ্যে নিজ কল্পনার রূপকে মুক্ত করে মানুষ ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ করল। সেই আদিম যুগ থেকে ঈশ্বর মানুষের ভয়-ভক্তি ভালবাসা, পার্থিব ও পরমার্থিব কামনার কাম্য বিধাতা যাঁকে মানুষ তার ধারণার দিগন্তে নানারূপে বিভিন্ন প্রতীকে অঙ্কিত করেছে অর্থাৎ পূজা করে এসেছে নানা কামনার নৈবেদ্যে। তার অঙ্কিত প্রতিটি চিত্রই প্রাঞ্জল ও সত্য। ঈশ্বর বা পরমব্রহ্মের শিবরূপ কল্পনা হয়তো সেই ইঙ্গিতই দেবে। শিব আরাধনা তাই শিবরূপে পরমব্রহ্মেরই আরাধনা। পরমব্রহ্মের উপলব্ধি ও আরাধনা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। শিবরূপে ব্রহ্মোপাসনার পথ তাই সহজসাধ্য করা হয়েছে অথবা পরমেশ্বরই স্বয়ং হয়তো লীলা ছলে শিবরূপে সাধকের উপলব্ধিতে মূর্ত হয়েছেন আপনাকে ভক্তের কাছে সহজে ধরা দিতে।

বৈদিক যুগে সংহিতা-উপনিষদের কালে দেখা যায় দেব-দেবীর রূপ কল্পনা থাকলেও তাঁদের মূর্তি গড়ে পূজার ব্যবস্থা ছিল না। যজ্ঞের ক্রিয়া

কাণ্ডের মধ্যেই মন্ত্রে তাঁদের রূপ কল্পনা বা শক্তি বর্ণনা করে স্তুতি করা হত। এর দ্বারা দেবতার একটি অস্পষ্ট অবয়ব যে ফুটে উঠত না তা নয়। রুদ্র দেবতার (পরবর্তীকালে যিনি শিবরূপের সঙ্গে একীভূত) মন্ত্রগুলিতেও তাঁর স্তুতির মধ্য দিয়ে তাঁর রূপ কল্পনা করা হয়েছে। এবং পরবর্তী পৌরাণিক যুগে এবং তার পরবর্তী কাল পরম্পরায় ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে এই রূপ-কল্পনাই শিব মূর্তি আকারে পূজিত হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা রুদ্রের যে বর্ণনা করেছেন সেগুলি একত্রিত করলে তাঁর যে মূর্তি গঠিত হয় তা হল ঃ—রুদ্র বা শিবের বিরাট বলশালী সৌষ্ঠবযুক্ত তনু, হস্তে ধনুকবাণ, শিরে জটাভার, কণ্ঠ নীলাভ। তাঁর গাত্রবর্ণ কখনও বলা হয়েছে রক্তাভ, কখনও বা পিঙ্গল, তিনি বৃষারূঢ় শত্রুধ্বংসী, ভূতগণও তাঁর সেবক (এখানে ভূতগণ বলতে কি নিম্নশ্রেণী অনার্যদের কথা বলা হয়েছে, না তন্মাত্রের কথা বলা হয়েছে ?) পর্বত কন্দরে বা অরণ্যানীর গভীরে তাঁর বাস। তাঁর ক্রোধ ভয়ঙ্কর, তাঁর ক্ষমা সুন্দর।

পরবর্তী যুগে শিব মূর্তি কল্পনার মধ্যে উপরের বর্ণনাগুলিই সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয়েছে দেখা যায়। সাধক তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁর আরাধ্য দেবতাকে ধ্যানের মধ্যে যেভাবে পেয়েছেন বা ধারণা করেছেন সেরূপেই ঐ রূপ কল্পনার কিছু হের ফের হয়েছে। যেমন তাঁর ত্রি-নয়ন, কণ্ঠে বা বক্ষে সর্পোপবীত, কটিদেশে আচ্ছাদিত অজিন। ধনুক-বাণের পরিবর্তে শিব ত্রিশূলধারী হলেন। শ্বেতবর্ণ হল তাঁর গাত্রবর্ণ।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার যুগের হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে যে নৃত্যরত পুরুষ মূর্তিটি পাওয়া গেছে পণ্ডিতদের অনুমান সেটি নটরাজ শিবের প্রাকরূপ। ঐ যুগের মানুষ মূর্তি পূজক ছিল বলে ধারণা করা হয়। তা হ'লে অনুমান করা যেতে পারে যে সুপ্রাচীনকাল থেকে নানারকম ভাবে শিবমূর্তি কল্পিত হয়েছে।

এখন শিবের এইরূপ বিকাশ বাস্তবিকই কি কল্পিত মূর্তি বা প্রতি-মূর্তি ? তাঁর মধ্য নয়ন, পঞ্চ বদন এসবই কল্পিত মূর্তির আভাস, আবার এগুলি বাদ দিলে দ্বিভূজ শিবের মূর্তি কি প্রতিমূর্তি বলে মনে হয় না ?

বাস্তবিক অতি কল্পনাগুলি বাদ দিলে শিবের যে রূপ আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয় সে মূর্তি তাঁর প্রতিমূর্তি বলেই মনে হয়। আর তখনই ভারতবর্ষের বুকে অনাদি কোন কালে আবির্ভূত কোন অতিমানস সত্তার অস্তিত্বের কথা হাতছানি দিয়ে মনের জানালায় জানিয়ে যায়।

মূর্তি কল্পনার দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা বা সাকার পূজা কেন করে মানুষ ? ইতিপূর্বে কিছু কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে তার। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করে তাঁর আরাধনা করা সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া এই নিবৃত্তিমার্গের সাধনায় ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন মানুষের মনে সহজে তাগিদ জাগে না। পার্থিব কামনা বাসনা নিয়ে যাঁরা সর্বদা ব্যাপৃত তারা নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা করার প্রেরণা প্রাণে পাবে কি করে ? তারা মনে করে ঈশ্বরের কাছে ধন সম্পদ, আয়ু, আরোগ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্ষমতা এসবই কাম্য যাদের স্থায়িত্ব নেই—যেগুলি অলীক। তবু এর উপর তলায় দৃষ্টিক্ষেপ করে জ্যোতির্ময় সত্যের প্রতি মানুষের মন সহজে আকৃষ্ট হয় না। তবে পরমেশ্বরের কৃপায় সব হয়—মূকও কথা বলে, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে—'লালা' বাবুর মত ধনগর্বী মানুষও বিষয় আশয় ত্যাগ করে ব্রজে চলেন ব্রজরাজের বাঁশির টানে। এ সবই ভগবৎ কৃপা। ঈশ্বরের দয়া অহৈতুকী, তিনি সকলকেই কৃপা করেন কিন্তু কে কখন তাঁর কৃপা পায় কেউ বলতে পারে না, কেউ জানতে পারে না। কিন্তু তাঁর লীলা খেলায় সকলকেই ঈশ্বরমুখী হতে হবে মুক্তির জন্য। তাই এই পথে ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনা করে তাঁর আরতি—রূপের মধ্য দিয়েই অরূপের সন্ধান। স্থূলভাবের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মভাবে অভিগমন। দেবতার মূর্তি ও পূজা পদ্ধতির মধ্যে মানুষের পার্থিব চাওয়া পাওয়ার ছবি এঁকে মনকে আকৃষ্ট করা হয় বা তার সহায় ব্যাকুল মনকে এক ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধায় পরিপূরিত করা হয়—নানা পূজার্চনা পদ্ধতি, ক্রিয়াকর্ম ও যাগযজ্ঞের আয়োজন সংসারী সাধারণ মানুষকে এদিকে আকৃষ্ট করে রাখে। এই ভাবেই পূজারতির মাধ্যমে কারো কারো ঈশ্বর কৃপায় 'লালা' বাবুর মত ঘুম ভাঙ্গে। যাঁরা মহাপুরুষ ও লোকগুরু তাঁরা তাঁদের ঈশ্বর ভাবনার রূপ দিয়েছেন দেবতার প্রতীক বা মূর্তি কল্পনার মধ্যে। সাধারণ মানুষকে ভয়ে ও ভক্তিতে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এবং তাঁদের ধর্মমতের প্রচার উদ্দেশ্যে। এইভাবে কল্পনার দিগন্তে মনকে যতদূর প্রসারিত করা যায় ততদূর প্রসারিত করে মানুষ দেব-দেবীর মূর্তি কল্পনা করে তার ঈশ্বর ভাবনার রূপ রূপায়ণ করেছে। আবার কোন মূর্তি কল্পনা বা মূর্তির রূপ ভাবনা হয়ত বা কোন মহান সাধকের ধ্যান লব্ধ ঈশ্বর-রূপ যেরূপ আরাধনা করে ঘটেছে তাঁর পরম প্রাপ্তি। সাধারণ মানুষকে শিব-ভাবনায় ভাবিত করা ও শৈবমতাবলম্বী করে শিব পূজক করার

উদ্দেশ্যেই মনে হয় প্রবৃত্তিমূলক চিন্তাধারায় সম্পৃক্ত শিবমূর্তি বা শিবলিঙ্গ চিন্তা করেছিলেন শিববাদী প্রচারকবৃন্দ সাধকরা।

বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে শিবমূর্তির যে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলির লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় :—

হিমালয় পর্বত বিভাগের কৈলাস পর্বত দেবাদিদেব মহাদেবের মূল বাসভূমি—তিনি দেবী বিশ্বজননী পার্বতীসহ সেখানে বিরাজ করেন। ধ্যানগম্ভীর ভূধর যেন শিব গাম্ভীর্য ও শিব বৈশিষ্ট্যকেই প্রকটিত করে রাখে। শিবের অতনু বপু জ্যোতির্ময়—তাঁর কান্তি শুভ্র। চক্ষু দুটি ধ্যান মগ্ন—তাঁর ললাটের তৃতীয় নয়ন জ্যোতির্ময়। শিরে পুঞ্জ জটাভার, পরনে বাঘ ছাল—হাতে ত্রিশূল, বক্ষে সর্প উপবীত। তিনি বৃষারূঢ়। শিবের এই মূর্তি-রূপ। এ ছাড়া তিনি পঞ্চানন—পঞ্চমুখ বিশিষ্ট শিবরূপের কল্পনাও করা হয়েছে। শিবের আর এক মূর্তি বৈশিষ্ট্যের পূজা হয় তা হল নটরাজ শিব মূর্তি।

বেদের ঋষি কি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি বিকাশের মধ্যে শিব রূপ খুঁজে পেয়েছিলেন—যাঁকে প্রথমে বিশ্বদেব রুদ্রদেবতা হিসাবে কল্পনা করেছিলেন? উতুঙ্গ পর্বতরাজির উপর সঞ্চরণশীল জীমূতপুঞ্জ কি তাঁর জটাভারের রূপ? সেই মেঘমালা হতে বৃষ্টি ঝরে যে নদীর সৃষ্টি—মহাদেবের জটা হতে সেটাই কি ভাগীরথীর অবতরণ? হিমালয়ের শুভ্র তুষার কি তাঁর গাত্রবর্ণ? নীলবর্ণ পর্বত বনরাজি কি নীলকণ্ঠের নীলাভ গ্রীবাদেশের ইঙ্গিত? তুষার কিরীটের উপর পড়ে রবিকর জ্বল জ্বল করে—তাই কি তাঁর ত্রি-নয়নের জ্যোতি? পর্বত-অরণ্যে যে মহাদেবতার বাস এবং যিনি মহারুদ্র অথচ মহাক্ষেম, মহাদক্ষ অথচ উদাসীন—মহাযোগেশ্বর, তাঁর কটিবাস অজিত ছাড়া আর কি হবে? বেদের ঋষির প্রাণ-বীণা প্রকৃতির- রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শের সঙ্গে একতালে বেজে জগৎ প্রভুকে অনুভব করত। তাই কি প্রকৃতির শক্তি-গুলির অভিব্যক্ত রূপের মাঝে মহাদেবের রূপ খুঁজে পেয়েছিলেন ঋষি-কূল? না কি সুপ্রাচীন যুগে কোন মহামানব সত্তার ছিল ওই রূপ-বৈশিষ্ট্য যিনি পরে ঈশ্বর রূপে কল্পিত? পরবর্তীকালে যুগ পরম্পরায় ভারতের নানা প্রদেশে শিবরূপের পরিবর্তন ঘটেছে।

শিবমূর্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছে মানুষ তার অধ্যাত্ম ভাবনার আলোয়।

শিবের গাত্রবর্ণ সাদা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হল শিব জ্ঞানরূপী

আত্মা। এই জ্ঞানরূপী শিব (আত্মা) নির্মল। মানুষের মনের অজ্ঞানতা রূপ ময়লা বা অন্ধকার দূর হয়ে গিয়ে জ্ঞান জন্মালে তখন মন নির্মল অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। জগতে সর্বপ্রকার রঙের মধ্যে সাদা রঙকেই সর্বোৎকৃষ্ট ও নির্মল বলা হয়। সাধারণত: সকলে বলে থাকে 'অমুকের মনটা বেশ সাদা অর্থাৎ নির্মল।' হিংসা দ্বেষ ও অজ্ঞানতা রূপ ময়লা শূণ্যতাকেই সাদা বলা হয়। তাই জ্ঞানকে শিব কল্পনায় সাদা রং করা হয়েছে। বেদান্ত জ্ঞানকে আলো বা শ্বেতবর্ণ রূপে বর্ণনা করেছেন। Bible গ্রন্থেও বলা হয়েছে—white is the sign of purity অর্থাৎ সাদা রং-ই পবিত্রতা বা নির্মলতার চিহ্ন। শুভ্রবর্ণ শিবই অর্থাৎ জ্ঞানরূপী আত্মাই মন-প্রকৃতির স্বামী বা প্রভু। উচ্চ মার্গগামী সাধক এই ধারণাতেই শিব-সাধনা করেন।

শিবের পঞ্চমুখের কল্পনা করা হয়েছে। পঞ্চমুখ হয়তো বা মহাদেবের পঞ্চবেদ বিদ্যা পারঙ্গম তার কথাই বলছে। শৈবধর্মব্রতী মুনি ঋষিরা শিব আরাধনার দ্বারা অর্থাৎ শৈবধর্ম সাধন দ্বারা পঞ্চবেদ সাধনের অধিকারী হতেন। চারি বেদ ও পঞ্চম বেদ হল আয়ুর্বেদ। রুদ্র (অর্থাৎ শিব) কে বেদে শ্রেষ্ঠ ভিষক বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চানন শিবের পঞ্চমুখের ব্যাখ্যা আরও একভাবে হয়ত করা যায়। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সদ্‌ধর্ম, গীতবিদ্যা, নৃত্যবিদ্যা ভেষজ বিদ্যা ও যোগ বিদ্যা এই পঞ্চ মহাবিদ্যা শিবমুখ নিসৃত। তাই হয়ত তাঁর পঞ্চ আননের কল্পনা।

আবার কেদারনাথ পর্বতের পাঁচটি শৃঙ্গকে পঞ্চ কেদার বলা হয়। হয়তো বা এই পাঁচ শৃঙ্গকে উপলক্ষ্য করেই শিবের পঞ্চমুখের কল্পনা হয়ে থাকতে পারে। এই পাঁচ শৃঙ্গগুলি হল (১) প্রথম কেদার, (২) মধ্য মহেশ্বর (৩) তুঙ্গনাথ (৪) রুদ্রনাথ ও (৫) কল্পেশ্বর।

শিবের পঞ্চমুখের কল্পনা সম্পর্কে আরও এক ধারণা হয়তো থেকে থাকতে পারে তা হল পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এগুলি নিয়েই শিবরূপ—তন্মাত্রেই রয়েছেন বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ ওতঃপোত।

মহাদেবকে বৃষারূঢ় হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। বৃষভ তাঁর বাহন। সুপ্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকে শুরু করে বৈদিক যুগ ও তার পরবর্তী-কালেও ভারতীয় সমাজে জন্তু-জানোয়ারদের ভিতর বৃষ এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করতো তা লক্ষ্য করা যায়। তার গাম্ভীর্যময় নির্লিপ্তভাবের জন্যই হোক বা গো-জাতির পুং প্রতিভূ বলেই হোক

অথবা কৃষিকাজে লাঙ্গল চালনার ব্যাপারে, শকট চালনার কাজে এক প্রধান সহায়ক হওয়ার জন্যই সমাজে বৃষভের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে বৃষসদৃশ গাম্ভীর্য মণ্ডিত এক জন্তুর সজ্জিত মূর্তি। এ মূর্তি দেখে মনে হয় গৃহপালিত জন্তু হিসাবে সেযুগে বৃষের বেশ সমাদর ছিল। বৃষ মাংসও লোকে আহার করত। শকট বহন; হাল-চালন ইত্যাদি কাজে বৃষের ব্যবহার হত। অনেক বেদ মন্ত্রে বৃষ বা বলীবর্দের উল্লেখ আছে কৃষি কার্যের সহায়করূপে। এই প্রাণীটি সেযুগে গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রাণী হিসাবে পরিচিত ছিল, সুতরাং দেবাদিদেব মহাদেব যিনি সকলের পূজ্য—তাই তাঁর বৃষ বাহন। অনেক বেদমন্ত্রেও বৃষ বা বলীবর্দের উল্লেখ বা প্রশস্তি আছে।

পর্বতের উপর নভমণ্ডলে শ্বেত মেঘপুঞ্জের দিকে চেয়ে বেদের ঋষি কি রুদ্রের বাহন হিসাবে বৃষ কল্পনা করেছিলেন যে প্রাণীটি ছিল তাদের প্রিয়? হিমালয়ের তুষার জমে যে কাল্পনিক গঠন প্রাণীর আকার পেত, ঋষি কি সেটিকে বলীবর্দ বলে মনে ভেবেছিলেন এবং গিরিশকে বৃষধ্বজ হিসাবে কল্পনা করেছিলেন? তবে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর যুগে মানুষের বৃষ-প্রীতির কথা ভেবে এবং মহাদেবের বাহন বৃষ এ দেখে শিব অনার্যদের (যদি সিন্ধুসভ্যতা অ-নার্য সভ্যতা বলে ধরা হয় কারণ অনেকের মতে আর্য-অনার্য মিশ্রিত ভাবধারায় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল) দেবতা ছিলেন এ সম্ভবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শিবের হাতে ত্রিশূল—ঐ ত্রিশূল দিয়ে তিনি ধ্বংস করেন বিভেদের মিথ্যার ও অন্ধ সংস্কারের। ঐ ত্রিশূলের তিনটি ফলা—স্বর্গ, মর্ত্ত ও রসাতল গ্রথিত করে আছেন সংহারক শিব। বেদের ঋষি রুদ্রদেবতার হাতে তীর আর ধনুক তুলে দিয়েছিলেন—আকাশের সপ্তরঙ্গ। ধনুকাকৃতি বর্ণালিটিই ছিল তাঁর কল্পনায় হরধনু। পরবর্তীকালে মহাদেবের হাতে ত্রিশূল এল।

শিব বনচারী—অরণ্যে তাঁর বাস তাই পরণে তাঁর অজিন গলায় সর্প-উপবীত। তিনি অঙ্গে বিভূতি মেখে শ্মশানে ঘুরে বেড়ান—এ কল্পনা কেননা তিনি যে বৈরাগ্যের প্রতিভূ সর্বকামনার পারে মানুষের চরম কাম্যরূপ।

শিবলিঙ্গ রহস্য

শিবলিঙ্গের সম্বন্ধে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক নানাপ্রকার ধারণা রয়েছে মানুষের মনে। এই ধারণাগুলির মধ্যে নিকৃষ্টমানের ধারণাটি ভ্রান্ত এবং বলা যায় তা অজ্ঞানতাপ্রসূত। অনেকে লিঙ্গ শব্দের ও লিঙ্গাকৃতির কদর্য ব্যাখ্যা করে শিবলিঙ্গকে শিশ্ন বা পুংজননেন্দ্রিয়ের দ্যোতক বলে মনে করেন। কেউবা মনে করেন শিবলিঙ্গ শিবের জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক এবং যোনিপীঠ মধ্যে স্থাপিত শিবলিঙ্গ পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের প্রতীক ও জগতের সৃষ্টি রহস্যের ইঙ্গিত দেয়। বহু সাধারণ নরনারী এই ধারণার বশবর্তী। আবার অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি ইতিহাসের গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও করেছেন যে, প্রাচীন অনেক অসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির মধ্যে শিশ্নোপাসনা প্রচলিত ছিল। শিবলিঙ্গের উপাসনা সেই আদিম অসংস্কৃত ধর্মবুদ্ধি থেকেই উদ্ভূত বলে তাঁদের সিদ্ধান্ত।

শিশ্ন পূজা সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রাচীন কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে নাকি এই পূজার প্রচলন ছিল। শিশ্ন ও ভগকে আদিকালের মানুষ সৃষ্টির দ্যোতক হিসাবে ধারণা করত—জন্ম ব্যাপারটা তাদের কাছে বাস্তবিক এক রহস্যের বিষয় ছিল এবং এ ব্যাপার শক্তির লীলা রহস্য বলেই তাদের বোধ ছিল। তাই মনে হয় তাদের সমাজ জীবনে শিশ্ন ও ভগের বেশ একটা গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া যৌন ব্যাপারটা যে অশ্লীল কিছু মনে হয় এই বোধ মানুষের মনে তখন ছিল না—অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার অথচ রহস্যময় এই বোধ নিয়ে জেগেছিল প্রজনন শক্তির ওপর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। তাই সেই প্রাচীন যুগের অসভ্য বা অর্ধসভ্য মানুষ যদি লিঙ্গ পূজা করে থেকেও থাকে সে ব্যাপারটাকে আজকের মন ও চোখ নিয়ে বিচার করলে ভুল করা হবে। পরবর্তী যুগেও (এ যুগকে সভ্যযুগ বলা হয়) দেখা যায় তন্ত্র-সাধনায়—যৌন ক্রিয়ার ব্যাপার রয়েছে। তবে শিবলিঙ্গ সম্পর্কে শিশ্নের কল্পনা একেবারেই ভ্রমাত্মক বলে মনে হয়। এটি আর কিছু নয় পরমব্রহ্মের শিবলিঙ্গরূপী এক প্রতীক। বিশদ আলোচনার দ্বারা আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই দেখা যাক।

সুপ্রাচীন যুগের মানুষের মধ্যে জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতির সঙ্গে শক্তির ক্রিয়া যে বিদ্যমান তা উপলব্ধ হলে মানুষকে সম্ভবতঃ জন্ম মৃত্যু রহস্যই বিশেষভাবে কোন মহাশক্তির অভিব্যক্তি বলে

অনুভাবিত করেছিল। মৃত্যুরহস্যের কারণ রহস্যাবৃত থাকলেও জন্মরহস্য যে নরনারীর যৌনমিলন প্রসূত তা তারা বুঝেছিল। আর তারই ফল-স্বরূপ আদিযুগের মানব সৃষ্টি শক্তির দ্যোতক বলে হয়ত শিশ্ন পূজা করত। কিন্তু তারই ধারা নিয়ে সভ্য অ-নার্য বা সভ্য আর্য-রা এইরূপ পুরুষ লিঙ্গ কল্পনা করে শিব উপাসনার প্রচলন করেছিলেন সে কথা আদৌ সমর্থন যোগ্য নয়।

অনেকে হয়ত তর্ক তুলতে পারেন যে, সুপ্রাচীন যুগের পরবর্তী বহুযুগের এপারে ভারতবর্ষে অনেক প্রসিদ্ধ দেব-দেউলে যেমন পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে বা কোনারকের সূর্য মন্দিরে বা খাজুরাহের মন্দিরে অথবা ইলোরার ভাস্কর্যে মিথুন মূর্তি ও নরনারীর যৌনমিলন দৃশ্য যখন খোদিত থাকতে পারে তখন শিশ্নরূপে শিবলিঙ্গের কল্পনা কেন সম্ভব নয়! যদিও প্রাচীনযুগে মানুষের যৌন সংস্কার ও যৌন দৃষ্টিভঙ্গী সরল ও সহজ ছিল, তবু এ ধরনের মতবাদ যথার্থ নয়। প্রশ্ন হচ্ছে যদি শিবলিঙ্গ শিশ্নেন্দ্রিয়েরই দ্যোতক হত তবে এই অশ্লীল প্রতীক (যা বর্তমানে অশ্লীল হিসাবে ধারণা করা হয়) ভারতীয় হিন্দু-জাতির মধ্যে কি সার্বজনীনতা লাভ করতে পারতো এমনভাবে? মনে হয় পারতো না। অন্ততঃ সমাজের উন্নত স্তরের মানুষেরা, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সাধকগণ কখনও এই প্রতীক উপাসনা করতেন না।

যদি এই অশ্লীলতা দোষ স্খালন করার জন্য বলা যায় যে শিব লিঙ্গ ঈশ্বরের সৃষ্টি-শক্তি ও সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতীক তাহলে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা দেখা যাক। জগতের সর্বত্র স্ত্রী পুরুষের শক্তি যোগেই সৃষ্টির প্রসার হচ্ছে দেখা যায়। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, প্রাণী জগতে এমন কি উদ্ভিদ জগতেও স্ত্রী ও পুরুষ জাতির যৌন মিলনের ভিতর দিয়েই সৃষ্টির বিধান। গৌরপীঠস্থিত-শিবলিঙ্গ এই যেন সৃষ্টির দিকেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার চিন্তাকে টেনে নিয়ে যায় ও ভগবানের সৃষ্টি কৌশলের দিকে মানুষকে শ্রদ্ধা পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। পুরুষ প্রকৃতির মিলনকেই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল তত্ত্ব বলে নির্দেশ করে। পরমপুরুষ ও তদীয় পরমা প্রকৃতির নিত্য-মৈথুন—নিত্য আনন্দ মিলন—বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতির মূল রহস্য—বিশ্বের জীবন তো তাইই, তাতেই জগত আনন্দধারা অব্যাহত। বিশ্বের এই জীবনধারার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনধারাকে যুক্ত করাই আধ্যাত্মিক সাধনা। একই পরমপুরুষ বিশ্বের সকল জীবের

অন্তরাত্মা রূপে বিরাজিত, একই পরমা প্রকৃতি সকলের দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির জননী। দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিতে আত্মার যে রমণ, যে আনন্দ বিহার, যে অভিন্নতাবোধ তার মধ্যেও সেই পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতির নিত্য মৈথুন লীলা। সর্বত্র পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতির-শিব ও শক্তির-ব্রহ্ম ও মায়ার লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করাই সাধনার উদ্দেশ্য। যোনিপীঠ বিহারী শিবলিঙ্গের পূজা মানুষকে এই অধ্যাত্মজ্ঞানই শিক্ষা দিতে চায়। এই আদর্শই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার আদর্শ—তার প্রাণের আদর্শ। এই আদর্শে সর্বসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবার উদ্দেশ্যেই দেশের সর্বত্র শিবলিঙ্গের প্রস্তর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা।

কৃষ্ণযজুর্বেদে রুদ্র অর্থাং শিবের শক্তি কল্পনার মধ্যে শিব শক্তি মিলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই মন্ত্রে শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপের অস্পষ্ট পরিচয় আছে।

যাঁরা উপরের এই মতবাদে বিশ্বাসী তাঁদের যুক্তিকে মেনে নিতে পারা যাচ্ছে না নীচের কারণগুলির জন্য। একথা ঠিক যে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিবলিঙ্গের উপরি উল্লিখিত ব্যাখ্যা হয়তো অযৌক্তিক নয়। কিন্তু এ মত মানা যাচ্ছে না কারণ আদি মতটির মত এখানেও লিঙ্গশব্দ পুং জননেন্দ্রিয় ও যোনিপীঠ ভগ হিসাবেই গৃহীত হয়েছে—যোনিপীঠস্থিত শিবলিঙ্গকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের সংযোগের প্রতীকরূপেই কল্পনা করা হয়েছে। এই সংযোগই সৃষ্টির দ্যোতক। কিন্তু ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে মূলত: শিবকে সৃষ্টি বিধাতারূপে কল্পনা করা হয়নি। যদি শিব সৃজন দেবতারূপে কল্পিত হতেন তা হলে প্রথম থেকেই তিনি প্রবৃত্তি মার্গের অনুসরণকারী কর্মকাণ্ড পরায়ণ বৈদিক সমাজের পূজা পেতেন, যাগযজ্ঞে তাঁর প্রথম থেকেই প্রধান স্থান হত কিন্তু তা হয়নি। হিন্দুর ধর্ম চিন্তার অঙ্গিনায় ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্তা, বিষ্ণু পালন কর্তা ও শিব সংহার কর্তারূপে কল্পিত হয়েছেন—নির্গুণ ব্রহ্মেরই ত্রিবিধ সগুণ ভাবমূর্তি। যাঁরা বিশ্বজগতের সৃষ্টি স্থিতির অভিলাষী—এক হতে বহুর উদ্ভব ও বহুর মধ্যে সাম্য-শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য বিধান যাঁদের আকাঙ্ক্ষণীয় তাঁরা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরই আরাধনা করতেন, যাগযজ্ঞে ও সমাজ কল্যাণকর অনুষ্ঠানে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবতাকেই আবাহন করতেন ও মুখ্য স্থান দিতেন। শিবের কাজ সংহার করা। তিনি বহুত্বের ধ্বংস সাধন করে একত্বের পুনঃ

প্রতিষ্ঠায় ব্রতী, তিনি সংসারের বহুত্বের শৃঙ্খল থেকে জীবকে মুক্তিদান করে, সমাজের বন্ধন হতে সাধককে বাইরে টেনে এনে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে উন্মুখ। সেজন্য যাঁরা সংসারের বৃদ্ধি কামনা করেন না, সঙ্কোচ চান, সৃষ্টি চান না, সংহার চান, কর্মবাহুল্য চান না, সর্বকর্ম ও কর্ম ফল থেকে মুক্তি চান—সেই সকল নিবৃত্তিমার্গের সাধকগণ, সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী যোগী মুমুক্ষগণ প্রধানত শিবারাধনার পক্ষপাতী—তাঁদের দৃষ্টিতে শিবই সুন্দর মহান—মানবজীবনের সম্যক কৃতার্থতা সম্পাদন তাঁরই কৃপাসাপেক্ষ। যাঁরা ব্রহ্মার ভক্ত—ব্রহ্মার আদর্শ মানেন তাঁরা সংসারে প্রজাবৃদ্ধি করেন—নব নব সৃজন কাজে ব্যাপৃত হন, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে তৎপর হন—প্রীতিলাভ করেন, গার্হস্থ্যকে প্রধান স্থান দেন। আর যাঁরা বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুর আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁরা সংসার বৈচিত্র্যের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য বিধান-কল্পে আত্মশক্তি নিয়োজিত করেন—সর্বজীবে প্রেম ও সেবা তাঁদের জীবনের ব্রত, মানব সমাজে বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলতা সৃজনকারী স্বার্থপর ও দাম্ভিক রাক্ষস প্রকৃতি ও অসুর প্রকৃতি মানুষের প্রভাব খর্ব করে প্রেম ও অহিংসার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সর্বপ্রকার কর্মসম্পাদনে প্রস্তুত, তাঁদের গার্হস্থ্য ও সেবার জন্য, কর্ম ও সেবার জন্য। আর যাঁরা শিব ভক্ত, শিবের আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁদের কামনা সংসারের বৈষম্যকে অতিক্রম করে পরম সাম্যে উপনীত হওয়া। তাঁদের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধনা—তাঁরা মানব সমাজের লৌকিক শ্রীবৃদ্ধির প্রতি উদাসীন। তাঁরা যোগী ও সন্ন্যাসী—সমাজ ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করে, লোক সমাজে বৈরাগ্য ও মোক্ষের আদর্শ প্রচার করেন। শিব হলেন নিত্য বৈরাগী—সদা সমাধিমগ্ন—তিনি নিত্য আত্মসমাহিত—আত্মানন্দে বিভোর তিনি সদানন্দ। সংসারের চেয়ে শ্মশান তাঁর প্রিয় স্থান। তিনি জ্ঞান বৈরাগ্য মুক্তির আদর্শ লোকসমাজে উপস্থাপিত করে লোকের চিত্ত বৃত্তি সংসারের বহুত্ব হতে ব্রহ্মের একত্বের দিকে আকর্ষণ করেন, তিনি নিত্যকাল ক্লেশ-কর্ম-বিপদ-বিষয় আশয়ের উর্ধে অবস্থান করে তাঁর দিকে নরনারীকে আকর্ষণ করেন। তিনি জ্ঞানীশ্বর—তিনি ত্যাগীশ্বর—তিনি যোগীশ্বর আবার তিনিই পরমেশ্বর। শিব সকল জ্ঞানীর, সকল ত্যাগীর, সকল যোগীর গুরু—তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। শিব সম্পর্কে শিবানুরাগীদের এই ধারণা।

যাঁদের সাধারণ অধ্যাত্মদৃষ্টি বা বিচার শক্তি আছে তাঁরাই সহজে

অনুধাবন করতে পারেন যে সৃষ্টির ব্যঞ্জক পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির ভেদ যা যৌন মিলনের দ্যোতক, প্রজাবৃদ্ধির সূচক কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন বা বিগ্রহ মূলতঃ শিবের প্রতীক হতে পারে না। শিব সম্পর্কিত ধারণা বা কল্পনার সঙ্গে তা কোনক্রমেই খাপ খায় না। তাছাড়া শিবারধনার যা চরম লক্ষ্য তার সাধনের পথে এই ধারণা কোন মতেই অবলম্বনীয় হতে পারে না। এরূপ কোন ধারণা বা প্রতীক প্রজাপতি ব্রহ্মার লিঙ্গ বলে কল্পিত হতে পারে বা অবলম্বিত হতে পারে কিন্তু যিনি মহাজ্ঞানী, মহাত্যাগী, মহাযোগী বিশ্ব বৈচিত্র্যের সংহারক, তদ্বয়তত্ত্ব প্রকাশক, মুক্তিপথ প্রদর্শক, মোক্ষদায়ক সেই শিবের লিঙ্গ বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। আর যদি এই শিবলিঙ্গ নিখিল বিশ্বের যৌনসৃষ্টি বিধানের প্রতীকরূপেই পরিকল্পিত হত তাহলে কি সংসার ত্যাগী, ব্রহ্মচারী নিবৃত্তিমার্গাশ্রিত তদ্বয় তত্ত্বনিষ্ঠ মুমুক্ষু যোগী ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এই লিঙ্গকে উপাস্যে আসনে প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করতেন ? না তা কখনই তাঁরা করতে পারতেন না যাঁরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ; যৌন সংস্কারের লেশমাত্রও যাঁরা অন্তরে ঠাঁই দেন না বা দিতে চান না, স্ত্রী-পুরুষ ভেদের সংস্কার যারা হৃদয় থেকে দূরীভূত করতে প্রয়াসী তাঁরা জননেন্দ্রিয়ের দ্যোতক কোন প্রতীক বা বিগ্রহকে সম্মুখে রেখে সাধনে ব্রতী হবেন এ কল্পনা বাতুলতা মাত্র। অথচ এই সকল সৃষ্টি বিরাগী যৌনসংস্কার ত্যাগী একতত্ত্বের অভ্যাসকারী যোগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণই ভারতবর্ষের সর্বত্র শৈবধর্ম প্রচার করেছেন—শিব পূজার প্রবর্তন করেছেন। দুর্গম গিরি কন্দরে, গভীর অরণ্যে, নিরালা শ্মশানে শিবলিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা এইসব লোক সমাজ-বর্জিত স্থানগুলিকে প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। সৃষ্টির দেবতাকে নয়, সংহারের দেবতাকে অর্থাৎ মোক্ষের দেবতাকেই তাঁরা ভারতবর্ষের আদর্শ স্থানীয়রূপে চিরপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন এবং শিবলিঙ্গ এই সংহারের দেবতা তথা মোক্ষের দেবতারই প্রতীক।

তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণের এই উপলব্ধি ঘটেছিল ধ্যানের মধ্যে, তাঁরা বুঝেছিলেন সংসারে সব বহুত্বই মৃত্যুগ্রস্ত, জীবনের ভিতরে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে তাকে জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা রুদ্ধ করে লাভ করতে হবে অমৃতত্ব—হতে হবে মৃত্যুঞ্জয়ী। সংহারের দেবতা শিব মৃত্যুঞ্জয় তাই শ্মশানে অর্থাৎ মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিষ্ঠা (সেই কারণে মানুষের

চিতার উপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিধান দেওয়া হয়েছে)। সুতরাং শিবলিঙ্গকে যে মূলতঃ সৃষ্টির প্রতীক বলে সিদ্ধান্ত করা যথার্থ নয় এবং নিতান্তই ভ্রান্তি প্রসূত তা অনুধাবন করতে পারা যায় উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা।

বাস্তবিক শিবলিঙ্গের লিঙ্গ শব্দের সঙ্গে ও শিবলিঙ্গের কল্পিত আকৃতি-অবয়বের সঙ্গে পুরুষত্ব ব্যঞ্জক ইন্দ্রিয় বিশেষের কিম্বা বিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়াসূচক যৌন মিলনের কোন মৌলিক সম্পর্ক নেই। কোন বস্তু বা ব্যক্তি অথবা কোন ব্যাপার যার দ্বারা লিঙ্গিত হয় অর্থাৎ চিহ্নিত হয়, লক্ষিত হয়, নির্দেশিত হয়, পরিচিত হয় সেটাকেই সেই তত্ত্ব, বস্তু, ব্যক্তি বা ব্যাপারের লিঙ্গ বলে অভিহিত করা যায়। একই লিঙ্গী বা লক্ষিতব্য বিষয়ের নানাপ্রকার লিঙ্গ হয়ে থাকে।

লিঙ্গ বলতে সাধারণ ভাবে আমরা বুঝি নর বা নারীর যৌনাঙ্গ—কিন্তু যথার্থ অর্থ তা নয়। উপনিষদে কোথাও কোথাও লিঙ্গ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির আলোচনা করে লিঙ্গ শব্দটির তাৎপর্য খুঁজে দেখা যাক।

কঠোপনিষদের একটি মন্ত্রে (২/৩/৮) লিঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে—

"অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ (২/৩/৮)

মন্ত্রটির অর্থ হল—অবক্ত (পরা প্রকৃতি) হতেও পুরুষ (পরমাত্মা) শ্রেষ্ঠ। তিনিই সর্বব্যাপী—বুদ্ধিজাত অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন লক্ষণ তাঁর নেই। তাঁকে জেনে জীব সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয় ও অমৃতত্ব লাভ করে। এখানে 'অলিঙ্গ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে—"ব্যাপক অলিঙ্গঃ এব চ পুরুষ"—ব্যাপক ও সর্বপ্রকার লিঙ্গবর্জিত পুরুষ অর্থাৎ পরমব্রহ্ম। অলিঙ্গ কি? শব্দটির অর্থ স্পষ্ট করা যাক। লিঙ্গ হচ্ছে যার দ্বারা বস্তু (চেতন বা জড়) লিঙ্গিত অর্থাৎ চিহ্নিত বা অবগত হয়। যাঁর সেই লিঙ্গ অর্থ চিহ্ন নেই তিনিই অলিঙ্গ অর্থাৎ সংসার ধর্ম বর্জিত পরমপুরুষ—পরমাত্মা—পরমব্রহ্ম—তিনি নিরাকার তাই অলিঙ্গ। আর এই পরমব্রহ্মই তো শিব, সাধারণ মানুষের আরাধনার জন্য প্রস্তর প্রতীকে লিঙ্গিত।

মুণ্ডক উপনিষদের অপর একটি মন্ত্রেও লিঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে—

নয়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রসাদাৎ
তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।

এতৈরূপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা
বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৩/২/৪

অর্থাৎ যাদের আত্মনিষ্ঠা জনিত বীর্য নাই, যারা অনাত্ম বিষয়ে আসক্তি মোহদ্বারা আচ্ছন্ন, যারা অশাস্ত্রীয় তপস্যায় রত তারা এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না। কিন্তু যে বিবেকী পুরুষ এই সকল সাধন অবলম্বনে তৎপর হয়ে যত্নবান হন তাঁর আত্মা সর্বাশ্রয় ব্রহ্মে প্রবেশ করে। এখানে বলা হয়েছে "তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ"—অন্বয়ে দাঁড়ায় অলিঙ্গাৎ তপসঃ বা অপি [ন] অর্থাৎ বৈরাগ্যহীন তপস্যা দ্বারাও এঁকে লাভ করা সম্ভব নয়। এখানে 'লিঙ্গ' শব্দে অনাসক্তি বা বৈরাগ্য বোঝাচ্ছে, তপস্যা শব্দের অর্থ আত্মার ধ্যান, মনন প্রভৃতি উপাসনা মূলক কার্য। কিন্তু বিষয়ে বৈরাগ্যই প্রকৃত তপস্যার চিহ্ন বা লক্ষণ যাকে লিঙ্গ বলা হয়েছে। লিঙ্গ এখানে বৈরাগ্যের চিহ্ন বা লক্ষণ। ভোলানাথ শিবকে আমরা বৈরাগী তপস্বী বলেই কল্পনা করি।

লিঙ্গ শব্দের বৈদিক অর্থ হল চিহ্ন। তাই শাস্ত্র বলে, "যেমন সমুদ্রের দেহেই বুদ্বুদাবলী উত্থিত হয়ে আবার সেই সমুদ্রের দেহেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে সেইরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম সমুদ্রে বিলয় প্রাপ্ত হচ্ছে ; লিঙ্গ শব্দে দ্যোতক সেই পরমব্রহ্মই। এখানে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে ব্রহ্ম সর্বব্যাপক ও অদ্বিতীয় সুতরাং কে তাঁর পূজা করবে, তাঁর পূজাই বা কিভাবে হবে? শাস্ত্র এর উত্তরে বলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এই পঞ্চবায়ু এবং মন, বুদ্ধি মোট এই সপ্তদশ পদার্থকে বলে আত্মার লিঙ্গ শরীর। এই লিঙ্গ শরীর পূজা করলেই ব্রহ্মের পূজা বা আত্মপূজা হয়ে থাকে। শিবলিঙ্গ এরই প্রতীক। শিবলিঙ্গের নিম্নভাগে যে 'যোনিপীঠ' আছে এই 'যোনিপীঠ' শব্দের অর্থও ভগ অর্থাৎ স্ত্রী-লিঙ্গ নয়। যোনি শব্দের প্রকৃত অর্থ হল উৎপত্তিস্থান। অতএব যে মায়াশক্তি বা অজ্ঞানরূপ মনঃশক্তি হতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে সেই মনঃশক্তির নামই যোনিপীঠ। তাই একে শক্তিপীঠ বলে। প্রকৃত পক্ষে শিবলিঙ্গোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা। মানুষে বিচার পূর্বক এই লিঙ্গদেহে পূজা করলেই প্রকৃত শিব পূজা বা আত্মোপাসনা হয়। এ বিষয়ে শিব সংহিতায় বলা হয়েছে—

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতা শয়া ॥
আত্মলিঙ্গার্চ্চনা কর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সফলা সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

অর্থাৎ নিজ দেহের শিবকে (আত্মলিঙ্গকে) পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি বাইরে শিবলিঙ্গের অর্চনা করে সেই মূঢ় হাতের খাদ্য পরিত্যাগ করে জীবন ধারণের জন্য দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করে থাকে। যিনি প্রতিদিন আলস্য পরিহার পূর্বক আত্মলিঙ্গ অর্থাৎ নিজের সপ্তদশ অবয়ব লিঙ্গ শরীর অর্চন করবেন তাঁর সমস্ত সিদ্ধ হবে সন্দেহ নাই।

শিব সংহিতায় এরপরে বলা হয়েছে :

মনোজয়ঞ্চ লভতে বায়ুবিন্দু বিধারণন্।
ঐহিকামুস্মিকী সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়।

অর্থাৎ, বিশেষতঃ সাধক এর দ্বারা মনোজয়, বায়ুধারণ ও বিন্দু (শুক্র) ধারণের ক্ষমতা লাভ করেন এবং তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক অর্থাৎ ইহকালের ও পরকালের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ হয়ে থাকে।

এ হল অলীকবৎ পার্থিব কামনা বাসনাকে সংযত বা সংহার করে পরম কাম্যকে লাভ করার পথ নির্দেশ।

অতি সুপ্রাচীন কাল থেকে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ, মনীষী সাধকগণ, মুমুক্ষু যোগী ও সন্ন্যাসীরা জ্যোতি আলোক অগ্নি ও সূর্যকে চৈতন্যের প্রতীক বলে গ্রহণ করেছেন। একমেবাদ্বিতীয়ং চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি, পরম জ্যোতি, অখণ্ড জ্যোতি ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হয়েছেন। জ্যোতির দুটি ধর্ম্ম আমাদের প্রত্যক্ষ হয়—একটি প্রকাশ অন্যটি বিনাশ। জ্যোতি নিজেকে প্রকাশ করে, যাবতীয় বিষয়কেও প্রকাশ করে এবং অন্ধকারের বিনাশ সাধন করে, বিষয়ের আবরণ নষ্ট করে, সব অনিত্য দাহ্য পদার্থকে ধ্বংস করে। দেদীপ্যমান সূর্য, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা,—এ সবই একদিকে প্রকাশ করে আবার একদিকে বিনাশ করে। কিন্তু সর্বজড় জ্যোতি প্রকাশের জন্য চৈতন্য জ্যোতির ওপর নির্ভর করে। চৈতন্যের দীপ্তি ব্যতীত কোন বিষয়েরই প্রকাশ হয় না। চৈতন্যের আলোক ধারায় স্নাত হয়েই সূর্যের আলোকময় প্রকাশ, চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারার উদ্ভাসন, নক্ষত্রের আলোক ঔজ্জ্বল্য বিকাশ, অশনির আলোক বিচ্ছুরণ, অগ্নির ও দীপাবলীর জ্যোতিময় অলোক শিখা—জ্যোতির্ময় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পদার্থই চৈতন্যের

আলোকে প্রকাশিত হয় এবং তাদের আলোকে প্রাকাশমান বিষয় সমূহও প্রকাশিত হয়। চোখ, কান, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহও চৈতন্য শক্তির প্রকাশেই প্রকাশমান ও ক্রিয়াশীল। একমান চৈতন্যই স্বয়ং প্রকাশ, স্বয়ং জ্যোতি—এই চৈতন্যের জ্যোতিতেই বিশ্বজগতের প্রকাশ।

সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যখন অনভিব্যক্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম-স্থাবর-জঙ্গম কিছুই যখন ব্যক্ত রূপে প্রকাশিত হয়নি; জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, দ্রষ্টা-দৃশ্য, কর্তা কার্য কোন প্রকার ভেদমূল সম্বন্ধের যখন বিনাশ নেই, যখন দিবস রজনীর ভেদ নেই, আলোক-অন্ধকারের ভেদ নেই তখনও এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময় পুরুষ নিজের স্বরূপগত জ্যোতিতে প্রকাশমান হয়ে আপনার স্বরূপে আপনি বিরাজমান। এই চৈতন্যময় পুরুষকেই মুক্তিকামী মানুষ শিব-নামে ডেকেছে—আরাধনা করেছে। এই স্বপ্রকাশ সর্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময় শিবকে যোগীগণ অন্তরে অনির্বান জ্যোতিরূপে দর্শন করেন এবং বহির্জগতের সব আলোক বহুল পদার্থের মধ্যে তাঁরই জ্যোতির ছটা অবলোকন করেন। তাই জাগতিক জ্যোতিকে স্বপ্রকাশ শিবজ্যোতির প্রতীকরূপে অবলম্বন করে তাঁরা সাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং জীবনকে সম্যকরূপে জ্ঞানালোকময় করবার জন্য যথাবিধি প্রয়াস করেন। শিবো জ্যোতিরসোহমৃতম—শিবই জগতে সর্ব প্রকাশক জ্যোতিঃস্বরূপ, শিবই বিশ্বের সারভূত রসস্বরূপ—তিনিই জীবের চরমকাম্য অমৃত-স্বরূপ, অনির্বান দীপই শিবের লিঙ্গ বা প্রতীক রূপে যোগীজন গ্রাহ্য।

যিনি স্বীয় স্বরূপগত চৈতন্য জ্যোতিতে নিত্য জ্যোতির্ময়, বেদে যাঁকে 'অস্তু্ভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি' বলে বর্ণনা করেছে—যিনি নিরাবরণ জ্ঞান সমাধিতে নিত্য-আত্মানন্দে বিভোর, যিনি সত্যম, যিনি সুন্দর, যিনি শান্তম্ যিনি অদ্বৈতম্, যিনি জ্ঞানী গুরুরূপে, আত্মজ্ঞ পুরুষরূপে জীবের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করেন এবং কামনা বাসনার বিক্ষেপ নির্মল করেন যিনি জ্ঞানযোগ ও সন্ন্যাসরূপ ত্রিশূল দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহরূপ ত্রিবিধপুরে অবস্থানকারী জীবের মায়িক অহংরূপ দুর্দান্ত ত্রিপুরাসুরকে বধ করে জীবাত্মাকে আপনার শুদ্ধ বুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। যিনি সর্বপাপবিনির্মুক্ত, সর্ববিধি নিষে-ধাতীত, সর্বক্লেশকর্ম বিপাকাশয়া পরা স্পৃষ্ঠ মহাযোগী মহাত্যাগী মহা-জ্ঞানীর নিত্য আদর্শ—অনির্বান দীপশিখা বা আলোক স্তম্ভই তো তাঁর প্রকৃষ্ট প্রতীক বা লিঙ্গ। এই লিঙ্গই শিবলিঙ্গরূপে শিবভক্ত মুমুক্ষুদের উপাস্য—উপাসনার অবলম্বন।

শিবলিঙ্গকে জ্যোতির্লিঙ্গও বলা হয়ে থাকে কারণ জ্যোতি রূপ লিঙ্গই শিবরূপের সর্বোৎকৃষ্ট দ্যোতক। দিনে-রাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে শিবের ধ্যান ও পূজা করার রীতি এখনও শিবসাধকরা পালন করে চলেন।

বিশ্ব-প্রকৃতির বুকের ওপরে দেদীপ্যমান ঐ একমাত্র আলোক-বর্তিকা। ঐ একটি মাত্র জ্যোতিই সমগ্র জগৎ-সংসারকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। তারই আলোকে সমুদয় বিশ্ব আলোকিত—প্রকাশিত। বিশ্বের বৈচিত্র্য ঐ জ্যোতিকে কেন্দ্র করেই নিয়ত পরিণামপ্রাপ্ত হয়ে বিকশিত হচ্ছে এবং ঐ আলোকে উদ্ভাসিত হতে হতে সম্পূর্ণরূপে আলোকময় হয়ে তারই মধ্যে আত্মবিলয় করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। ঐ জ্যোতিঃ স্বরূপই বিশ্বের প্রাণ, বিশ্বের আত্মা—ঐ এক অদ্বিতীয় সর্ববর্ণাতীত স্বয়ং প্রকাশিত জ্যোতিঃ বিশ্বের বিচিত্র বর্ণে আত্মপ্রকাশ করছে, প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে ঐ অখণ্ড অবর্ণ জ্যোতিরই খণ্ড সোপাধিক আত্মপ্রকাশ, আত্মপরিচয়, আত্মবিলাস। তাই বিশ্ব-প্রকৃতি ঐ স্বয়ং-জ্যোতিরই যোনিপীঠ—তাঁর আত্মবিলাস, আত্মরমণ, বিচিত্ররূপে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্র। যোনিপীঠস্থিত শিবলিঙ্গ এই মূলতত্ত্বকেই পরিস্ফুট করে। বিশ্বের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিচিত্ররূপে বিলসিত ঐ একটিমাত্র নিত্যজ্যোতির দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে পারলেই মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল ভেদজনিত সমস্যার সমাধান হয়—সব অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হয়—অবিদ্যাপ্রসূত সব অহংকারের উগ্র ঔদ্ধত্য বিলীন হয়—আমিত্বের আড়াল খসে পড়ে—স্নেহ-মমতার বন্ধন-বেদনা থাকে না—কামনা-বাসনার মায়া দূরীভূত হয়—দুঃখ-তাপের কান্না মুছে যায়।

অতীতে নিবৃত্তি মার্গাশ্রয়ী সাধকরা প্রথমতঃ বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি উদাসীন হয়ে বৈদিক ধর্মীয় সমাজ ধর্মীয় সকল ক্রিয়াকাণ্ড পরিহার করে লোকালয় ছেড়ে বনে পাহাড়ে জঙ্গলে পর্বতে শ্মশানে শিবজ্যোতির ধ্যানে আত্মনিয়োগ করতেন এবং জীবনের সকল বিভাগ চৈতন্যালোকে আলোকিত করে শিবময় করতে প্রয়াসী হতেন। পরে ধ্যানলব্ধ চেতনার আলোকে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দরের বিচিত্র বিলাস দর্শন করে তাঁরা সাধারণ নরনারীর জীবনকে তত্ত্বজ্ঞানালোকে আলোকিত করবার জন্য সমাজের সর্বস্তরে শিবকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও সকলকে অখণ্ড জ্যোতির উপাসনায় প্রবৃত্ত করতে ব্রতী হলেন। প্রবৃত্তি

মার্গাশ্রয়ী নরনারীদের কাছেও শিবজ্যোতির মহত্ব ও আদর্শ উপস্থাপিত করে প্রবৃত্তিমূলক ধর্মচিন্তাকেও তাঁরা নিবৃত্তিপরায়ণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বেদবাদীদের (প্রবৃত্তি মার্গাশ্রয়ীদের) ধর্মানুষ্ঠানে বা সমাজবিধানে যেসব সঙ্কীর্ণতা দেখা যেত—যেসব অবিদ্যা-জনিত ভেদ-বুদ্ধির প্রভাব ছিল, শিবজ্ঞানের আলোকে সেইসব সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ-বুদ্ধির অন্ধকার দূর করে তাঁরা ক্রমে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। গৃহস্থ তত্ত্বপিপাসুরা শিবোপাসক যোগী ও সন্ন্যাসীদের গুরু হিসাবে বরণ করে শিবকে গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ক্রমে শিব হলেন গ্রামদেবতা ওপরে জাতিদেবতা। বৈরাগী শিব যেন গৃহস্থ হলেন। কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের মিলন ঘটল—ভোগের উপর প্রভুত্ব স্থাপিত হল ত্যাগাদর্শের। গৃহীর কর্মময়ী ভোগময়ী বৈচিত্র্যমুখী বহুত্ব প্রসবিনী চেতনা জ্ঞানীগুরু, ত্যাগীগুরু, আত্মচৈতন্য সমাহিত ভেদবুদ্ধি বিনাশী শিবকে পতিত্বে বরণ করে তদনুগত হল। প্রতিষ্ঠিত হল শিব ও উমার যোগ। বৈচিত্র্য জননী উমার প্রত্যেক সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রতিফলিত হল মহাদেবের তিদ্বয় একত্ব। বিশ্ব-প্রকৃতিকে কল্পনা করা হল শিবের যোনিপীঠরূপে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধারে চৈতন্য জ্যোতি সর্বদিগ্‌দেশ উদ্‌ভাসিত করে প্রকাশিত হতে থাকল।

শিবলিঙ্গে আধ্যাত্মিক রহস্য এটাই। শিবলিঙ্গকে প্রথম থেকেই দীপশিখা বা আলোকস্তম্ভ বা প্রভাময়ী জ্যোতিরূপেই কল্পনা করা হয়েছে। এই অনাদি জ্যোতিকে প্রতীকোপাসনার ক্ষেত্রে সর্বত্র একটা চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই শিলা আকারে তার পরিকল্পনা। শিব-লিঙ্গ ক্ষুদ্রাকৃতি হলে দীপশিখার আকারে এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হলে আলোকস্তম্ভের আকারে প্রতিষ্ঠিত করাই শাস্ত্রীয় বিধান। প্রস্তরকে প্রস্তর না ভেবে জ্যোতিঃরূপে ধ্যান করতে হবে—আচার্যরা এই শিক্ষাই দিয়ে থাকেন। সর্বত্র সকল বৈচিত্র্য ও পরিণামের মধ্যে নিত্যস্থির স্বয়ং-প্রকাশ স্বরূপানন্দ শিব বা ব্রহ্মকে দর্শন করবার শিক্ষা। নরনারীর জীবন-বিকাশের প্রতি স্তরে মন-প্রাণ-হৃদয় ও ইন্দ্রিয়কে তত্ত্বজ্ঞানে আলোকিত করবার উদ্দেশ্যে শিবজ্যোতির উপাসনায় প্রোৎসাহিত করা হয় যাতে তত্ত্বজ্ঞানালোকিত মন-প্রাণ নিয়ে জাগতিক সর্ববিধ কর্মে তারা আত্মনিয়োগ করতে পারে। এই শিক্ষাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ।

আপাতদৃষ্টিতে শিবলিঙ্গ একটি শিলাখণ্ড বলে মনে হলেও এটি সেই একমেবাদ্বিতীয়ম স্বয়ং জ্যোতি পরমব্রহ্মেরই দ্যোতক। বিশ্বের

সকল অঙ্গ পরমেশ্বরেরই অবয়ব—পরমাত্মারই আত্মবিলাস। পরমাত্মার পরম জ্যোতিতেই সব উদ্ভাসিত। এই তত্ত্বের প্রতীক হল শিবলঙ্গ এবং সেকারণেই এ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ-প্রতীক। এই তত্ত্বই শিবতত্ত্ব।

যোগবাশিষ্ঠে দেখি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব মুনিপ্রবর বশিষ্ঠকে শিবতত্ত্ব কি তা বোঝাচ্ছেন ঃ—"হে ব্রহ্মবিদ্ শ্রেষ্ঠ! আমার চেয়ে উত্তম কিছু নেই, এরূপ দেবার্চনার কথা তোমায় বলি, শ্রবণ কর। সেই অর্চনা একবার করতে পারলে তক্ষুণি মুক্তি লাভ করা যায়। হে দ্বিজোত্তম! দেব কাকে বলে তা কি তুমি জান? পুণ্ডরীকাক্ষ ত্রিলোচন, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, বায়ু, অনল, চন্দ্র, সূর্য, ব্রাহ্মণ, নৃপতি এঁরা কেউই 'দেব' নন। বেশি কি বলব, তুমি আমিও (দেহ) দেব নই। দেব দেহরূপীও নন এবং চিত্তরূপীও নন। শোভা বা লক্ষ্মী এবং মতিও দেব নন। দেব অকৃত্রিম ও অনাদি অর্থাৎ যা নিত্য নিরতিশয় সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মা তিনিই 'দেব' পদবাচ্য। ঐ লক্ষণ আকারাদি দ্বারা পরিচ্ছন্ন পদার্থে সম্ভব হয় না। জ্ঞানীরাও অকৃত্রিম এবং অনাদি অনন্ত চিদ্রূপকে 'দৈব' বলে তাঁকে শিব আখ্যা প্রদান করেন। এই শিবই প্রকৃত ও প্রধান দেব এবং এঁর পূজা বিধেয়। ইনি নিরবচ্ছিন্ন এবং সত্তারূপী এবং এঁর হতেই এই সমস্ত জগৎ আছে বলে প্রকাশ পায়। যারা এই দেবতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব না জানে তারাই 'দেব' বুদ্ধিতে সাকার মূর্তির অর্চনা করে। বোধ, সাম্য (সর্বত্র আত্মবুদ্ধি) ও শান্তি, এই তিনটিকে তুমি শ্রেষ্ঠ পুষ্প এবং কেবল নির্মল চিন্মাত্রকেই তুমি পূজ্যশিব বলে জানবে। শান্তি ও বোধাদিপুষ্পের দ্বারা যে আত্মদেবের পূজা করা হয়, তাকেই তুমি শ্রেষ্ঠ দেবার্চনা বলে জানবে। যারা আত্মসম্বোধনরূপ দেবার্চনা না করে কৃত্রিম প্রতিমাদি পূজায় আসক্ত হয় তারা শোক তাপ প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেশের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না। হে ব্রাহ্মণ, এ তুমি নিশ্চয় জানবে যে, আত্মাই দেবতা, আত্মাই ভগবান, আত্মাই শিব। তাঁরই পূজা এবং সে পূজার প্রধান সামগ্রী জ্ঞান। জ্ঞানরূপ পুষ্পের দ্বারা তিনি সর্বদা পূজনীয়।

[যোগবাশিষ্ঠ, নির্বাণ প্রঃ ২৯ সর্গ ১১৭-১২৪। ১২৭-১৩১ শ্লোক]

উপরের শিবকথনটিকে নিরাকার শিবতত্ত্ব এই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাকার শিবতত্ত্ব যা হল ভক্তি উপাচারে প্রতীক বা প্রতিমা অর্চনার মাধ্যমে সদ্গুরুর প্রযত্নে আত্মজ্ঞানের জাগরণের দ্বারা প্রাণের মাঝে অনাদি জ্যোতির্ময় শিবকে লাভ করা—মনে হয় সাধারণ সংসারীর পক্ষে শিবকে লাভ করার হয়ত এটাই প্রকৃষ্ট পথ।

ওঙ্কারতত্ত্বে শিবতত্ত্ব

শিব ওঙ্কারনাথ—ওঙ্কারেশ্বর। ওঙ্কারতত্ত্বে শিবতত্ত্বও নিহিত রয়েছে বলা যেতে পারে। রক্ষণার্থক 'অব' ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করে 'ওম্' শব্দটি পাওয়া যায়, যার অর্থ হল যিনি রক্ষা করেন অর্থাৎ ঈশ্বর। আবার কারো কারো মতে অ, উ, ম এই তিন অক্ষর দ্বন্দ্ব সমাসবদ্ধ হয়ে হয় 'ওম্'।

শিব মহিম্নঃ স্তোত্রে ওঁ কার সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ—

—ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবন মথো ত্রীনপি সুরান্
অকারাদ্যৈর্বর্ণৈ স্ত্রিভির ভিদধত্তীর্ণ বিকৃতি।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ্ গৃণাত্যোমিতি পদম্॥

—শ্লোকটির ভাবানুবাদ এইরূপ,—

"হে শরণদাতা শিব। প্রভু, তোমারই অবয়ব হল ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ। জাগ্রৎ অবস্থাতেও তোমার প্রকাশ, স্বপ্নাবস্থাতেও তোমার অনুভব, সুষুপ্তিতেও তুমি দীপ্যমান। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গলোক সবই তোমার অবয়ব। সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের বা সৃজন-পালন-সংহারের কর্তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও রুদ্র তোমারই রূপ। আর যেহেতু ওঙ্কারের তিনটি অবয়ব—অ-কার, উ-কার ও ম-কার যথাক্রমে ঋগ্ বেদাদি তিন বেদ, জাগ্রতাদি তিন অবস্থা, পৃথিবী আদি তিনলোক ও ব্রহ্মাদি তিন দেবতার বাচক সেইহেতু ওঙ্কার পৃথক পৃথক ঐ তিন দ্বারা তোমার স্তুতি করছে। আবার ঐ তিন বর্ণের একত্র সমাবেশে যে সূক্ষ্ম ওঙ্কারনাদ স্ফুরিত হয় তা তোমারই তুরীয়স্বরূপ বা অবস্থার স্তুতি করছে।"

ওঙ্কারের মাত্রাত্রয়ের অর্থাৎ অ-উ-ম এর ব্যাখ্যা বহু উপনিষদে ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে ওপরের বক্তব্যের বিষয়গুলি এইভাবে উপস্থাপিত করা যায়,—

অ	উ	ম
ঋক্	যজুঃ	সাম (বেদ)
জাগ্রৎ	স্বপ্ন	সুষুপ্তি (অবস্থা)
ব্রহ্মা	বিষ্ণু	রুদ্র (দেবতা)
(সৃষ্টি)	(স্থিতি)	(লয়) (ক্রিয়া)
বিশ্ব	তৈজস	প্রাজ্ঞ (ব্যষ্টি চৈতন্য)

উপরের ছকটির চতুর্থ স্তরে রয়েছে ব্যষ্টি চৈতন্যের দ্যোতক বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিন অবস্থা যারা যথাক্রমে অ-উ-ম দ্বারা সূচিত এবং শিবরূপকেই নিগূঢ়ার্থে প্রকাশ করছে। বোধের বৈচিত্র্য নিয়েই বিশ্বপ্রসূত, তৈজস সে বোধেরই উপকরণ আর প্রাজ্ঞ যা সম্যক জ্ঞান সঞ্জাত—ওঙ্কারতত্ত্বের এই রূপটি বিশ্বনাথ অর্থাৎ শিবেরই ইঙ্গিত দেয়।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকটি বস্তুরই একটি রূপ আছে এবং সেই রূপের একটি বা একাধিক নাম আছে। কিন্তু যত নামই থাকুক না কেন, সব নামই পূর্বোক্ত প্রকারে ওঙ্কার ধ্বনির অন্তর্গত। সুতরাং ওঙ্কার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাচক। আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরেরই বাহ্যরূপ বলে ওঁঙ্কার ঈশ্বরেরও বাচক—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরেরই রূপ, তাই তিনি বিশ্বনাথ —শিবই তো বিশ্বনাথ-বিশ্ববিভু।

আচার্য শঙ্কর তাঁর রচিত 'পঞ্চীকরণ'-এ ওঙ্কারের ভিতর সমগ্র অদ্বৈত বেদান্ত অনুপ্রবিষ্ট দেখিয়েছেন। তিনি ওঙ্কার সহায়ে কিভাবে নিগুর্ণোপাসনা করতে হয় তার ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। শঙ্করাচার্যের মতে অ-কারের অর্থ হল (১) জাগ্রত অবস্থা (২) স্থুল শরীর এবং (৩) জাগ্রত অবস্থা ও স্থুল শরীরে অভিমানী চৈতন্য যাকে 'বিশ্ব' বলা হয়; উ-কারের অর্থ হল (১) স্বপ্নাবস্থা, (২) সূক্ষ্ম শরীর এবং (৩) স্বপ্নাবস্থা ও সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানী চৈতন্য যাকে তৈজস বলা হয়; ম-কারের অর্থ হল (১) সুষুপ্তি অবস্থা, (২) কারণ শরীর, (৩) সুষুপ্তি অবস্থা ও কারণ শরীরে অভিমানী চৈতন্য যাকে প্রাজ্ঞ বলা হয়।

আরও কথা এই যে, ব্যষ্টিতে যে চৈতন্যকে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বলা হয় সমষ্টিতে তাকেই যথাক্রমে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর বলা হয়। এজন্য অ-কার, উ-কার ও ম-কার বলতে বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরকে বোঝায়।

নিগুর্ণ উপাসনার প্রণালী হচ্ছে স্থুলকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মকে কারণে

এবং কারণকে বিশেষ চৈতন্যে লয় করতে হয়। এই শুদ্ধ চৈতন্যই ওঙ্কারের তুরীয় অবস্থা বা চতুর্থ মাত্রা—মাণ্ডুক্য উপনিষদে যাকে 'অমাত্রা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

"অমাত্রঃ চতুর্থঃ অব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ
শিবঃ অদ্বৈতঃ এবম্ ওঙ্কারঃ আত্মা এব।" (১/১২)

এবং শিব উপাসনাও তাই—শিবতত্ত্ব সে কথাই বলে। ওপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে যে, ওঙ্কার দ্বারা কেবল নির্গুণ উপসনাই করা যায় তা নয়, সগুণ উপাসনাও হয়। ওঙ্কার সগুণ ও নির্গুণ দ্বিবিধ ব্রহ্মেরই বাচক—যিনি বিশ্বরূপী তাঁরও বাচক, যিনি বিশ্বাতীত তাঁরও। যিনি বিশ্বরূপী তিনিই তো বিশ্বাতীত। যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার রূপে অরূপে ঈশ্বরের লীলা। প্রথমেই বিশ্বাতীত ব্রহ্মতত্ত্বের ধারণা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব মনে হয় না. তাই বিশ্বরূপী ব্রহ্মতত্ত্বকে ওঙ্কার সহায়ে বুদ্ধিতে আরূঢ় করতে হয়। এই সাধনার ফলসিদ্ধি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মদর্শন যিনি সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্।

শিবহীন দক্ষযজ্ঞে সতীর তনুত্যাগ

আমাদের সমাজ-জীবনের আঙ্গিনা জুড়ে শিবকথার আলপনা আঁকা। বিশ্বনাথ বিশ্বপতি হয়েও আমাদের ঘরের দেবতা। শিব-শিক্ষায় আমরা শিক্ষা পেতে চাই, শিব-আদর্শে আমরা জীবন গড়তে চাই, শিব-চেতনায় আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাই—শিব হব বলে, কারণ শিব হওয়াই আমাদের জীবনের গতি।

আবহমানকাল ধরে নর-নারীকে শিব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তাই নানা শিব কাহিনীর প্রবাহধারা বয়ে চলেছে। বেদ-পুরাণের পাতায় পাতায় সে উপাখ্যানগুলি জীবন্ত হয়ে যুগ-যুগান্তর আমাদের শিব-কথা শোনাচ্ছে—শিব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করছে। এই কাহিনীগুলি শিববাদীদের শৈবধর্ম প্রচারের সোপানও হতে পারে—এগুলির মধ্যে কল্পনা-কিংবদন্তী মিশ্রিত ইতিহাস বা অতি-প্রাকৃতিক ঘটনা-চিত্রও থাকতে পারে, তবে সবই পুরাণ-কথিকা অর্থাৎ শাস্ত্র কথা।

কিন্তু পুরাণের বহু ঘটনা বা উপাখ্যান বৈদিক সংহিতা যুগের ঘটনাবলীর সূত্র ধরেই গাঁথা হয়েছে দেখা যায়। যেমন, দক্ষযজ্ঞের আখ্যানটি। ঋগ্বেদ সংহিতায় আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষের পরিচয় পাই। তাঁকে অদিতির পুত্রও বলা হয়েছে (অন্য এক স্থানে দেখা যায় দক্ষ-কন্যার নামও অদিতি)। বেদ-পুরাণে দক্ষ প্রজাপতি শক্তিধর দেবতা হিসাবে কল্পিত। তিনি প্রবৃত্তিমার্গী বৈদিকদের এক শক্তিমান প্রতিভূ ছিলেন. যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড এই ছিল যাঁদের মূল কর্ম। আর অন্য এক পক্ষ ছিল তাঁরা নিবৃত্তিমার্গী—এঁদের শৈবমতাবলম্বী বলা যায়। ঐ যুগে এই দুই মতধারীদের মধ্যে মত ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের জন্য স্বাভাবিকভাবেই বিরোধ ছিল। ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি-মার্গীরা প্রবৃত্তিমার্গীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। দক্ষের যজ্ঞকে কেন্দ্র করে দক্ষ প্রজাপতি ও শিবের মধ্যে যে বিরোধের ঘটনা পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে তা সম্ভবতঃ এই দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব-কাহিনী। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা অনুমান করেন,

দক্ষযজ্ঞের ঘটনা হল অনার্য দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য দেবতাদের বিরোধ এবং আর্য-সংস্কৃতির ওপর শৈববাদের প্রভাব। প্রকৃত ঘটনা যাইহোক, পুরাণ কাহিনী লোকশিক্ষা ও অধ্যাত্ম শিক্ষা ও সমাজ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতেই রচনা করা হয়েছে বলে মনে হয়। পুরাণোক্ত কাহিনীটি বর্ণনা করা যাক।

দক্ষ ছিলেন এক দেব নেতা। তাঁর প্রতাপ কম ছিল না। তাঁর অনেক কন্যা। সকলেই সুন্দরী ও সুশীলা—উল্লেখযোগ্য দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হয়েছে। তার মধ্যে ধর্ম, অগ্নি ও সোমদেবও আছেন। উল্লেখযোগ্য দেবতাদের শ্বশুর হয়ে দক্ষ নিজে গর্বিত। সতী দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা—নারীর সর্বগুণভূষিতা। পিতা দক্ষের সবচেয়ে আদরিণী মেয়ে সতী। শিবের শৌর্য, বীর্য ও উদার চরিত্রের কথা শুনে তাঁর কিশোরী মনে শিব অনুরাগ জেগে ওঠে। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য সাধনা আরম্ভ করলেন। আপনার ধ্যানে বিভোর ভোলানাথ শিব সতীর প্রেমে ধরা দিলেন, দক্ষের সঙ্গে তাঁর যতই না মতবিরোধ থাক। সতীত্বের পূর্ণ প্রতিমূর্তি সতী শিবকে পেলেন পতিরূপে। পাগল ভোলা শ্মশানে-মশানে পাগলবৎ ভ্রমণ করে ফেরেন, বিভূতি দেহে লেপন করে ধ্যান-বিভোর থাকেন। সতী তাঁরই মত ভিখারিণী সেজে পতির সেবা করে ধন্য হন। জগতের ঐশ্বর্য তাঁদের কাছে তুচ্ছ—শিবই তো জগৎপতি—ত্রিভুবন নাথ। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে সদা ব্যস্ত ধনী দক্ষ। তিনি ও তাঁর গোষ্ঠী প্রবৃত্তিমার্গী। অন্য দিকে নিবৃত্তিমার্গী শিব ও তাঁর অনুচরবর্গেরা ভিন্ন মতাবলম্বী, কঠোরভাবে ত্যাগী, জীবনযাত্রা আড়ম্বরহীন এবং শ্রেণী বা জাতি সম্পর্কে সংস্কার বর্জিত। এঁরা আত্মধ্যানে সদামগ্ন—আত্মজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু। বিরোধ থাকলেও শিবের মত মহাশক্তিধর দেবোত্তমকে সতী পতিরূপে বরণ করেছেন দক্ষকে এ ব্যাপারটা মেনে নিতে হল। হয়ত ভাবলেন শিবকে দলে আনতে পারবেন। তাছাড়া দেবাদিদেব মহাদেবের মান্যতাটুকুও যদি পান তাই বা কম কি ?

কিন্তু প্রথমেই ঘটে গেল গোলমাল। একবার এক বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন দেবতারা। দক্ষ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। ব্রহ্মা, মহেশ্বর এঁরা এসেছেন। সকল দেবতারা উপস্থিত হয়েছেন। বড় বড় দেবতাদের মধ্যে অনেকেই দক্ষের জামাতা। দক্ষ যজ্ঞ স্থলে যখন প্রবেশ করলেন তখন সকল দেবতারাই তাঁকে নমস্কার নিবেদন করলেন।

করলেন না কেবল পিতা ব্রহ্মা এবং পরম যোগী মহেশ্বর। শিবের এ আচরণ দক্ষের মনে আঘাত করল। তবু সম্মান পাবার আশায় তিনি কনিষ্ঠ জামাতার দিকে এগিয়ে গেলেন। শিব তাঁর নির্লিপ্ত চোখ দুটি তুলে চাইলেন মাত্র। অন্য জামাতাদের মত শ্বশুরকে সম্মান দেখালেন না। তিনি আত্মজ্ঞান চিন্তায় সদা নিমগ্ন—লৌকিক ব্যবহারের জ্ঞান কি তাঁর থাকে। তাছাড়া শিব দেবাদিদেব মহাদেব সকল দেবতার প্রধান।

দক্ষ মহাদেবের মহত্ত্ব না বুঝে নিজেকে অপমানিত মনে করে কনিষ্ঠ জামাতার ওপর ভীষণ ক্রোধান্বিত হলেন। শিবের এতবড় স্পর্ধা! সকল দেবতার সম্মুখে তাঁকে হেনস্থা করা। তাঁর ক্রোধ বিলক্ষণ প্রকাশ হয়ে পড়লো। ক্রোধদীপ্ত স্পর্ধিত কণ্ঠে শিবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমার স্বভাব যাবে কোথায়? গুরুজনকে সম্মান জানাতে হয় এই শিষ্টাচারটুকুও শেখোনি। তুমি যেরূপ দুর্বিনীত সেরূপ অশিষ্ট—সমগ্র দেবকুলের কলঙ্ক। আমি অভিশাপ দিচ্ছি যে, যাজনকালে ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে তুমি যজ্ঞের ভাগ পাবে না।" দক্ষের গালিগালাজ ও অভিশাপ শিবের কর্ণে প্রবেশ করলো কিনা বোঝাই গেল না। আশুতোষের কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এই তিরস্কারে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়ায় দেবতারা শীঘ্রই যজ্ঞ স্থান ত্যাগ করলেন।

দক্ষ ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবলেন না। কন্যার প্রতি প্রীতিবশতঃও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হল না। অপমানবোধে জর্জরিত হয়ে তিনি ঠিক করলেন অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। শিবকে জবাব দেবেন এক শিবহীন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। অপমানের প্রতিশোধ নিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প। হায়! কে তাঁকে বোঝাবে যে, ভোলানাথ শিব তাঁকে আদৌ অপমান করেননি। দক্ষ তাঁর যজ্ঞোৎসবের নিমন্ত্রণ পাঠালেন দিকে দিকে সকল দেবতার কাছে—কেবল শিবের কাছে নিমন্ত্রণ গেল না। দক্ষ দেবর্ষি নারদের উপর অতিথিবর্গের নিমন্ত্রণের ভার দিয়েছেন। তিনি ভাবলেন, যজ্ঞোৎসবে শিবকে নিমন্ত্রণ না করায় শিবের বিলক্ষণ অপমান হল। হায়! তিনি প্রকৃতই অন্ধ, তাই না বুঝে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলেন।

কৈলাসে শিব-সতী সুখে কালাতিপাত করছেন। মহেশ্বর আত্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকেন প্রায় সময়ই—তিনি জগৎপতি শিব; তাঁর ধ্যানেই 'জগদ্ধিতায়' ঘটে চলেছে। কখনও অবসর বিনোদন করছেন সতী সঙ্গে

গভীরভাবে সতীর প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে। পতিপরায়ণা সতী যোগিনী সেজে পতি সেবা করে চলেছেন। সঙ্গে পরিবৃত রয়েছেন নন্দী, ভৃঙ্গি প্রভৃতি শিব অনুগতরা।

দেবর্ষি নারদ কৈলাসে এ খবর নিয়ে এলেন। দেবর্ষি হলেও কলহ-বিবাদ ঘটিয়ে তুলতে পারলে তাঁর আনন্দ। অবশ্য কৈলাসে শিব-সতী দর্শনেও তিনি বহুদিন ধরে অভিলাষী ছিলেন। নারদ কৈলাসে এলেন। শিব তখন কোন গিরি গুহায় ছিলেন ধ্যানমগ্ন। নারদ সতীকে প্রণাম নিবেদন করলেন, "জয় শম্ভু, জয় হোক মা।"—

"দেবর্ষি, আসুন। বড় প্রীতি লাভ করলাম আপনার আগমনে। আসন গ্রহণ করুন। অন্যান্য দেবগণের সংবাদ কুশল তো ?"

"হাঁ মা, সংবাদ সবই কুশল, কিন্তু একটি বড়ই বেদনার ঘটনা ঘটতে চলেছে মা ?"

"কি ঘটনা দেবর্ষি"—সতী উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে শুধান।

নারদ তখন সবিস্তারে সতীকে তাঁর পিতা দক্ষের বৃহস্পতি নামক উৎকৃষ্ট যজ্ঞোৎসবের খবর দিলেন এবং জানালেন যে, তাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়নি শিবকে অপমান করার উদ্দেশ্যেই। এই কথা বলে আতিথ্য গ্রহণ করে নারদ চলে গেলেন।

পিতা পতিকে যজ্ঞসভায় নিমন্ত্রণ করেননি শুনে সতী মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। একদিকে জন্মদাতা শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয় পিতা, অন্যদিকে একমাত্র আরাধ্য দেবতা পতি—তাঁর জীবন-দেবতা। তিনি মহাসমস্যায় পড়লেন। সতী শিবের অনুমতি ছাড়া কোন কাজই করতে পারেন না। তিনি স্থির জানেন, তাঁর স্বামী আশুতোষ কখনই তাঁর পিতৃকৃত অপমান গায়ে মাখবেন না—মান-অপমান তাঁর কাছে সমান। কিন্তু পিতা দক্ষ যে শিব নিন্দা করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। এখন পিতাকে বুঝিয়ে শিবের প্রতি তাঁর বিদ্বেষভাব ত্যাগ করানোই আশু কর্তব্য এবং নিশ্চয়ই সেটা কন্যার উপযুক্ত কাজ হবে। এই কথা ভেবে অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্থির করলেন, যজ্ঞোৎসবে পিতৃগৃহে যাবার জন্য শিবের অনুমতি প্রার্থনা করবেন—পিতৃগৃহে গিয়ে পিতাকে বুঝিয়ে বলবেন শিবের প্রকৃতি কিরূপ এবং জামাতার সঙ্গে মনোমালিন্য দূর করার জন্য অনুরোধ করবেন। বলবেন যে, প্রকৃতই শিব তাঁকে কোন অপমান করেননি।

সতী শেষে মনঃস্থির করে শিবকে মনের অভিলাষ জানালেন।

নারদের কাছ থেকে যেমনটি শুনেছিলেন সবই একে একে বললেন। প্রেমের সাগর মহাদেব সতীর মনোবাসনা বুঝতে পেরে তাঁকে নিবারণ করলেন না। অনুরাগের দৃষ্টি মেলে পত্নীকে মহেশ বললেন, "আমাকে তো শ্বশুর মহাশয় নিমন্ত্রণ করেননি, তাই আমি যেতে পারি না। তুমি পিতৃগৃহে যেতে চাইছ, বেশ যাও ঘুরে এস—নন্দী তোমার সঙ্গে থাক।"

শিবের অনুমতি লাভ করে সতী পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন। কৈলাস যেন তার উজ্জ্বল আভা হারিয়ে ফেলে ম্লান হয়ে পড়ল। মহাদেব সতীর ভাবী অবস্থা বুঝতে পেরে স্থির-ধীর-গম্ভীর হয়ে রইলেন।

সতীর পিতৃগৃহে সতী-জননী দক্ষজায়া সতীকে দেখে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—স্নেহের হাত তার কপোলে, মাথায় বুলিয়ে দিতে দিতে কথা বললেন মেয়ের সঙ্গে। জামাতার সঙ্গে স্বামীর মনোমালিন্যের ব্যাপার স্মরণ করে তাঁর চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। সতীর অন্যান্য ভগিনীদের বড় বড় দেবতাদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে—তাঁরা সকলেই বহু-মূল্য পরিচ্ছদে ও ভূষণে বিভূষিত হয়ে আপন আপন পতিসহ পিতৃগৃহে এসেছেন। সতীকে সকলেই স্নেহ-সম্ভাষণ জানালেন। কিন্তু তাঁকে নিরাভরণা দেখে সকলে দুঃখ করে বলতে লাগলেন, "সতীর মত হতভাগিনী আর কে আছে, এক ভিখিরীর হাতে পড়ে বেচারির আজ কি দশা! কোন সাধই ওর মিটল না।" হায়! তাঁরা জানেন না যে, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্যের আধার যে শিব-সতীই। যাঁরা সকলকে ঐশ্বর্যান্বিত করেন তাঁদের আবার ঐশ্বর্যের কি প্রয়োজন? সতী তাঁর ভগিনীদের এই সকল করুণাপূর্ণ কথা সহ্য করতে পারলেন না—এঁদের ওপর রাগও করলেন না। তিনি অন্তঃপুর ত্যাগ করে নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞ সভায় চললেন।. সতী জানেন ঐ শিবহীন যজ্ঞ কোন যজ্ঞই নয়—কেবল সেখানে যাচ্ছেন পিতাকে দুই একটি কথা বলতে।

সমারোহের সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করেছেন দক্ষ প্রজাপতি। যজ্ঞসভাগৃহ ঘিরে বসেছেন অভ্যাগতগণ—ছোট বড় সব দেবতা—কেবল মহাদেব নেই। দক্ষের চালচলনে ও কথাবার্তায় তাঁকে গর্বিত দেখাচ্ছে। শিবকে যে বিলক্ষণ অপমান করতে পেরেছেন তার জন্য মনে মনে সন্তোষ লাভ হচ্ছে তাঁর। শিবের মতাদর্শের সঙ্গে তাঁদের চিন্তাধারার প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। মাঝে মাঝে তিনি শিব নিন্দাও করে চলেছেন। এমন সময় সতী যজ্ঞসভায় এসে পিতাকে প্রণাম করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেন। অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। সতীকে যজ্ঞসভায়

দেখে অগ্নিসম জ্বলে উঠলেন দক্ষ। মেয়ের এতদূর স্পর্ধা! নিমন্ত্রণ করা হয়নি অথচ এসে হাজির হয়েছে! দাম্ভিকতার মোহে আর দ্বেষের বিষ জ্বালায় দক্ষ কন্যার প্রতি পিতৃস্নেহ বিস্মৃত হলেন, কর্কশভাবে বলে উঠলেন, "কোন মুখে এসেছ এখানে—তোমাদের তো আমি নিমন্ত্রণ করিনি। দরিদ্র নির্লজ তোমার স্বামী বুঝি পাঠিয়ে দিল! ছি ছি এতটুকু সম্ভ্রমবোধ নেই? তুমিই বা কোন্ মুখে এলে?" এই কটূক্তির পর তিনি শিবনিন্দা শুরু করলেন। নির্লজ্জার মত অনাহুত সতী পিতৃগৃহে এসেছেন এতে শিবেরই বেহায়াপনা প্রকটিত হয়ে উঠেছে। শিব যে অসংস্কৃত দেবতা তা বেশ ভাল করেই বোঝা যাচ্ছে। নিজের স্ত্রীকে কাঙ্গালের মত এখানে পাঠিয়েছে। এইভাবে দক্ষ সর্বসমক্ষে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে সতীকে অকথ্য ভাষায় কটু কথা বলতে লাগলেন। পতিব্রতা সতী শিবনিন্দা শোনা মাত্র কর্ণকুহর অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করলেন। পতি-নিন্দা শোনা সবচেয়ে দুষণীয় পাপ পতিব্রতা নারীর কাছে। এদিকে পিতাকেও তিনি অসম্মান করতে পারেন না—তাছাড়া তাঁর পিতাকে তিনি ভালওবাসেন। তিনি দক্ষকে রোরুদ্যমানা অবস্থায় বিনীত কণ্ঠে বললেন, "পিতা, আমার স্বামী আপনার কোন অনিষ্টই করেননি। বিনা নিমন্ত্রণে আমিই এসেছি, আপনি আমাকেই তিরস্কার করুন। স্বামী স্ত্রীলোকের সর্বস্ব—একমাত্র দেবতা, দয়া করে আমার সম্মুখে তাঁর নিন্দা করবেন না। আপনি অকারণে আমার সর্বগুণশালী সর্বশক্তিমান পতিকে কটুভাষ করছেন। তিনি নির্লিপ্ত, নির্বিরোধী, মহাযোগী।"

কন্যার এই কথায় দক্ষ আরও ক্রোধাসক্ত হলেন এবং শিবনিন্দায় মুখর হয়ে মনের জ্বালা মেটাতে লাগলেন। পুনরায় সতী তাঁর মিনতি-মাখা নয়ন দুটি পিতার মুখের 'পর নিবদ্ধ রেখে তাঁকে নীরব হতে অনুনয় করলেন। দক্ষ তবুও থামলেন না। সমানে তখনও কটুবাক্য উদ্গীরণ করে যেতে লাগলেন। পিতা কর্তৃক প্রিয়তম পতির নিন্দাবাদ সতীর কাছে নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি অস্থির হলেন, অব্যক্ত বেদনায় তাঁর অতনু দেহবল্লরী স্বেদসিক্ত হয়ে উঠল—অভিমানে রাগে তাঁর সর্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল, পিতার কটুভাষ তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। শিবের অভয় পদ ধ্যান করতে করতে নিজের সতীত্ব মহিমায় যোগাগ্নি সৃষ্টি করে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ঋষিগণের সাক্ষাতে সেই অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করলেন। হতভম্ব দক্ষ প্রিয় কন্যার এই পরিণতি দেখে নিজে কি অন্যায় করে ফেলেছেন তা বুঝতে পেরে স্তম্ভিত ও

বিস্মিত হয়ে বোবা চোখে চেয়ে রইলেন। এই সতীত্বের বিজয় ডঙ্কা বেজে উঠল চতুর্দিকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে শ্রদ্ধা জানালেন প্রয়াতা সতীকে।

নন্দী নিকটেই ছিলেন। সতীর দেহত্যাগে আর স্থির থাকতে না পেরে উন্মাদগ্রস্তের মত কৈলাসে ছুটে গিয়ে মহাদেবকে বিপর্যয়ের সব ঘটনা ব্যক্ত করলেন। সর্বজ্ঞ মহাদেবের কিছুই অগোচর রইল না। সাধ্বী পত্নীর শোকে তিনি অধীর আকুল হয়ে উঠলেন। দিশাহারা উন্মত্তের মত 'হা সতী! হা সতী!' বলে গভীর শোকে চীৎকার করতে লাগলেন এবং তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করলেন। সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল গিরিশের বিক্ষিপ্ত পদভারে। রুদ্র মাতন রুদ্রের।—সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়। দেবতারা সব প্রমাদ গণলেন। ক্রোধে ও শোকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য শিব জটাভার থেকে একগাছি কেশ ছেদন করে ভূতলে নিপতিত করলেন সজোরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীমকান্তি সংহার মূর্তি বীরভদ্রের সৃষ্টি হল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ দক্ষগৃহে যজ্ঞসভার দিকে ছুটে চললেন। শিব-অনুচররাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলল। মুহূর্তে যজ্ঞসভা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। পণ্ড হল শিবহীন যজ্ঞ। বীরভদ্রের নিষ্ঠুর পদভারে দলিত মথিত হয়ে বিনষ্ট হল সর্ব যজ্ঞ সামগ্রী। ব্যোম-ব্যোম-ববম বমম এই ঘোর রব তাঁর কণ্ঠ হতে বিনির্গত হতে লাগল। ভয়ে দিগ্বিদিকে যে পারলো পালালো। পলায়নপর দক্ষ বীরভদ্রের হাতে ধরা পড়লেন। ক্রোধে বীরভদ্র দক্ষের মুণ্ড উৎপাটিত করে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করলেন। এইরূপে শিবহীন যজ্ঞ পণ্ড হল।

মহাদেব উন্মাদের মত যজ্ঞস্থলে এসে দেখলেন তাঁরই অপমান সহ্য করতে না পেরে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী তনুত্যাগ করে ছিন্নমূল ব্রততীর মত পড়ে আছেন। দুঃসহ বেদনায় কণ্ঠে 'হা সতী, হা সতী' উচ্চারণ করতে করতে শিব সতীকে কোলে তুলে স্কন্ধোপরি স্থাপন করে উন্মাদের মত অসংলগ্ন পদবিক্ষেপে ধরা কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জগতের কোন চিন্তাই আর তাঁর মনে স্থান পেল না।

ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা যজ্ঞস্থলে সমবেত—সবাই যেন শোকে-দুঃখে মূহ্যমান কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দেবতারা শিবকে শান্ত করার জন্য তাঁর বন্দনা করতে লাগলেন—কিন্তু অশান্ত মহাদেব শান্ত হলেন না, তাছাড়া কোন কিছুতে তাঁর হুঁশই নেই। এদিকে মুণ্ডহীন দক্ষ ছট-

ফট করছেন—তিনি অমর তাই তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়নি। ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্রের এরূপ অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মহেশ্বরকে দক্ষযজ্ঞ উদ্ধার করতে অনুরোধ করলেন। নিকটেই একটি ছাগ সম্ভবতঃ বলিদানের জন্য রজ্জুবদ্ধ ছিল। শিবের অনুগ্রহে দক্ষের ধরের সঙ্গে ছাগের মুণ্ড কেটে তাই জুড়ে দেওয়া হল। অজমুখী দক্ষ দুঃখ-বেদনায় আপন মনে কি যে বলে উঠলেন তা বোধগম্য হল না কারো, দেখা গেল ছাগ-মুণ্ডের নয়ন দুটি জলে ভরা। হায়! অহংকারের কি পরিণাম! ছাগমুণ্ড নিয়ে দক্ষ পুনরায় যজ্ঞ সমাপন করে মহাদেবের স্তব করে তাঁকে যজ্ঞভাগ প্রদান করলেন।

এই আখ্যানটি কতটা ঐতিহাসিক আর কতটা কাল্পনিক সে আলোচনার এক্ষেত্র নয়। আর তার প্রয়োজনই বা কি? কারণ এই পৌরাণিক উপাখ্যান হিন্দুর ধর্মীয় উপাখ্যান, যা যুগে যুগে ভক্ত ও বিশ্বাসী মানুষের কাছে জ্বলন্ত সত্য হয়ে প্রতিভাত। আখ্যানটির তাৎপর্য কি হতে পারে তা দেখা যাক। দক্ষযজ্ঞের ঘটনাটি পর্যালোচনা করলে এ ধারণা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রাচীনকালে আর্যদের মধ্যে যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ড অবলম্বী প্রবৃত্তিমার্গী ও নিবৃত্তি-মার্গী শিব-সমর্থক (শিব অ-নার্য দেবতা হিসাবে অনেকে ধারণা করেন অবশ্য) দুপক্ষের এই দুই সমর্থক গড়ে উঠেছিল এবং এদের মধ্যে তত্ত্বগত বিরোধ ছিল। ক্রমে শিবমার্গীরাই জয়লাভ করে এবং এদের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে প্রবৃত্তিমার্গীদের উপর। দক্ষযজ্ঞের ঘটনা তারই ইঙ্গিত দেয়। পৌরাণিক যুগে এ বৃত্তান্ত আখ্যান আকারে পল্লবিত হয়ে শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যান হয়েছে। ভক্তিবাদের আদর্শও এখানে প্রতিফলিত। নারীর পাতিব্রত্যই তার সতীত্ব ও তারই বিকাশ তার চরমগুণ বিকাশ সেকথা এখানে বলা হয়েছে, পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতীর দেহত্যাগের মধ্য দিয়ে। এবং শিব-প্রকৃতির উন্মোচন করা হয়েছে সম্যকভাবে ও তার সঙ্গে সঙ্গে শিব-মহিমা প্রচার। মানবচরিত্রের আরও একটি পরিণতির দিকেও দেব-চরিত্রের পটভূমিকায় ইঙ্গিত করা হয়েছে দক্ষের পরিণতির মধ্যে—ক্ষমতাবান সর্ববিদ্যা পারঙ্গম সর্বজন শ্রদ্ধেয় হলেও মিথ্যা অহমিকা, ক্ষমতার দম্ভ যে হিতা-হিত জ্ঞান হারিয়ে মানুষকে ছাগ-বুদ্ধিসম্পন্ন করে তোলে এবং নিজ বুদ্ধির দোষে নিজের ক্ষতি করে। এ কাহিনীর এও এক শিক্ষা। তাছাড়া এই কাহিনীতে আমরা অন্য আর একটি বিষয় লক্ষ্য করি যে, দক্ষ

কন্যা সতী দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী হয়েও অমর হিসাবে কল্পিতা হননি। তিনি সর্বপ্রকারে মানবিক গুণসম্পন্না। দক্ষের কণ্ঠে ছাগ-মুণ্ড জুড়ে দিয়ে তাঁকে জীবিত করা হয়েছে এবং বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। এখানে সর্বজ্ঞ মহাদেবের আশুতোষ ও ভোলানাথের মূর্তির পাশাপাশি তাঁর সংহারক মূর্তিও বিশেষভাবে প হয়েছে।

শিব-পার্বতী কথা

মহাদেব সতীর মৃত শরীর কাঁধে নিয়ে উন্মাদবৎ পৃথিবী পরিভ্রমণ করছেন। সতী বিরহে পাগল প্রায় হয়েছেন তিনি—যেন তাঁর কোন চেতনাই নেই। সংহারকর্তা সংহার চিন্তা ভুলে, মঙ্গলবিধায়ক জগতের শুভ ভাবনা ভুলে প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ শোকে আজ বিহ্বল। এ দেখে দেবতারা সকলেই বড় চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে এ ব্যাপার নিবেদন করলেন—"হে জনার্দন! শঙ্করের এ অবস্থা প্রশমিত করুন, না হলে সৃষ্টি যে রসাতলে যায়।"—

বিষ্ণু দেখলেন পিণাকপাণি সতীদেহ কাঁধে নিয়ে মহাবেগে পৃথিবীতে বিচরণ করছেন। তাঁর স্কন্ধে লীন থাকায় সতীদেহ গলবেও না পচবেও না। সত্যই তো মহাদেব যদি স্থির না হন তবে সৃষ্টির পক্ষে সমূহ বিপদ! তাই সতীর শব তাঁর কাছ থেকে পৃথক করে ফেলতে না পারলে আর উপায় নেই। ক্ষণিক চিন্তা করে বিষ্ণু উপায় স্থির করলেন। তাঁর সুদর্শনচক্রের সাহায্যে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে তাকে শিবস্কন্ধচ্যুত করবেন। তিনি তাই করলেন—অলক্ষ্যে থেকে সুদর্শনচক্র দিয়ে সতী-দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন। বাহান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে দেহখানি ভারতের বাহান্ন স্থানে পড়ল এবং প্রত্যেক স্থান এক একটি মহাপীঠস্থানে পরিণত হল (যুগ-যুগান্তর ধরে সতী-মহিমার পবিত্র-কীর্তি সেইসব মহাপীঠস্থান সকলের কাছে এক মহা-পবিত্র স্মারক হিসাবে পূজিত হয়ে আসছে। তার সঙ্গে প্রতি মহাপীঠে বিশিষ্ট বিশিষ্টভাবে শিবও বিরাজ করছেন)।

মহাদেব যখন বুঝতে পারলেন সতীর দেহ আর তাঁর কাঁধের ওপর নেই, তখন তিনি আরও অধীর হয়ে পড়লেন, তাঁর মনে আরও অধিক বৈরাগ্য-ভাব এল—বৈরাগী শিব চরম বৈরাগ্যের আতিশয্যে আর যত্র-তত্র ভ্রমণে অপারগ হলেন। তিনি হিমালয়ের এক নিভৃত স্থানে বদরী ক্ষেত্রের নন্দ প্রয়াগ হতে উত্তর দিকে সর্ব পাপ প্রমোচনী মাতৃস্বরূপা বিরহবতী নদীর তীরে এসে ধ্যান মগ্ন হলেন। মহাতপস্যায় নিমগ্ন

হলেন শঙ্কর—তিনি সর্বসিদ্ধিযুক্ত ভগবান—তাঁকে লাভ করার জন্য, ত্রিলোক তপস্যা করে—তাহলে শঙ্করের তপস্যা কিসের জন্য ? কে জানে তাঁর কিসের কামনা ! বুঝি সতীকে ফিরে পাবার জন্যই এই তপস্যা।

মহাদেবের তপস্যায় প্রসন্ন-ব্যাকুল হয়ে দেবী চণ্ডিকা তাঁর কাছে এলেন—তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া—শঙ্করেরই শক্তি। মহাদেবকে দেবী বললেন, "আমি হিমালয় গিরি গৃহে জন্মগ্রহণ করবো এবং তদবধি লোকে আমাকে গিরি-সুতা গৌরী বলে অভিহিত করবে। হে দেব মহেশ্বর ! তুমি শোক সম্বরণ কর, আমি পুণরায় তোমার ভার্যা হব। আমি সতীরূপে তোমার ভার্যা ছিলাম এবার পার্বতীরূপে তোমায় পতিত্বে বরণ করবো।" সদাশিব দেবী চণ্ডিকার এই উক্তি শুনে শান্ত ও পুলকিত হলেন। তারপর মহাদেব সর্বকামফলপ্রদ বিরহেশ্বর নামে তাঁর এক অংশ এখানে রেখে কৈলাস গমন করলেন। তখন থেকে এই নদীর নাম হয়েছিল বিরহবতী যার বর্তমান নাম বিরহী।

নগাধিপতি হিমালয় ও তাঁর সাধ্বী পত্নী মেনকার পরিবারে অনেক-গুলি সন্তান। জ্যেষ্ঠ পুত্র মৈনাক দেবরাজ ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নিয়েছেন। রাজ-দম্পতী বহুকাল ধরে ভগবতীকে কন্যারূপে লাভ করার জন্য তপস্যা করছিলেন ; তাই তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে ও প্রেমনিধি-ভোলানাথ শিবের প্রেম অক্ষুন্ন রাখবার জন্যই ভগবতী অর্থাৎ সতী মেনকার গর্ভে পুনর্জন্ম গ্রহণ করলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে বহুদিনের আরাধ্য ধন ও ভোলানাথের তপস্যার ফল 'সতী' ভূমিষ্ঠ হলেন। সমস্ত ভুবন জুড়ে বেজে উঠল আরত্রিকের বাদিত্র। স্বর্গ থেকে দেবতারা করলেন পুষ্প বৃষ্টি। তিনি দিন দিন শশিকলার মত বাড়তে লাগলেন। বিকশিত হয়ে উঠল তাঁর সৌন্দর্য। শরীরে সুষমা যেন আর ধরে না, তাঁর মুখশ্রীর তুলনা নেই ! অতুলনীয় তাঁর আয়ত আঁখি-পল্লব। তুলনা নেই তাঁর রাতুল চরণ-শোভার। তন্বী দেহবল্লরীর গমন-ভঙ্গিমারও তুলনা হয় না কারো সাথে। জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শ্রী-সৌন্দর্য যেন একসাথে এসে সন্নিবেষ্টিত হয়েছে তাঁর অতনু দেহে। গিরি সুতার চরণভঙ্গে স্থল পদ্ম ফুটে ওঠে, চরণের নূপুর নিক্কণে কলহংস লজ্জা পায়। সোহাগভরে কেউ তাঁকে ডাকে গৌরী, কেউ বলে পার্বতী, কারো বা আদরের ডাক উমা। গিরিরাজ ও মেনকা উমাকে চক্ষে হারান। সখীদের সঙ্গে পুতুল খেলেন বালিকা

গৌরী। মাটির শিবই তাঁর পুতুল। কখনও সেই মাটির শিব নিয়ে তিনি খেলা করেন, কখনও বা পূজা করেন। বালিকা এই শিব-পুতুল খেলায় এতখানি মত্ত হয়ে পড়তেন যে তিনি সবই ভুলে যেতেন।

ক্রমে ক্রমে পার্বতী যৌবনসীমায় পদার্পণ করলেন। তাঁর দেহ মনের সৌন্দর্য যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠল। গতজন্মের আহৃত বিদ্যা সকলই আপনি এসে উপস্থিত হল। অধিক আগ্রহ নিয়ে পার্বতী মাটির শিব গড়ে পূজা করতে লাগলেন—পূজায় এবার মিশল ভক্তির সঙ্গে অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষার নির্মল পুষ্পাঞ্জলি। মৃন্ময় শিবমূর্তি পূজা-ধ্যানের মাধ্যমে পার্বতীর কাছে চিন্ময়রূপে প্রতিভাত হলেন। গুণবতী কন্যার শিব পূজায় এত আসক্তি দেখে মহাদেবকে যোগ্য পাত্র মনে করে গিরিরাজ হিমালয় তাঁর হাতেই কন্যাকে সম্প্রদান করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু মহাদেবের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁর অনুমতি চাইবার সাহস তাঁর হল না, ভয় হল যদি শিব অস্বীকার করেন।

পত্নী মেনকাও অতি ব্যস্ত হয়েছেন—প্রায়শঃই তাগাদা দিচ্ছেন তাঁকে। এ সম্পর্কে সুষ্ঠু কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় এই ভাবনায় পর্বত-রাজ যখন আকুল, ঠিক সে সময় দেবর্ষি নারদ এলেন একদিন হিমালয় ভবনে। কথায় কথায় তিনি হিমালয়কে জানালেন যে, শিবের সঙ্গেই পার্বতীর বিবাহ হবে—পূর্ব থেকেই এ স্থিরকৃত। নারদের কথায় হিমালয় কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "মহাভাগ দেবর্ষি, মন বড়ই অস্থির ছিল, আপনার কথায় শান্ত হল।" আতিথ্য গ্রহণের পর নারদ দেবলোক প্রত্যাবর্তন করলেন।

এর পর থেকে শিবগতপ্রাণা পার্বতী নিঃসঙ্কোচে সখীদের সঙ্গে নিয়ে তপস্যা নিরত মহাদেবের কাছে গিয়ে অন্তরের পূজা নিবেদন করতেন। জননী মেনকা প্রথম প্রথম বারণ করতেন কিন্তু দেবর্ষি নারদের মুখে এ কথা শুনে অবধি তিনি ও গিরিরাজ হিমালয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কন্যাকে শিবপূজার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। উদ্দেশ্য, তাঁর সর্বরূপাগ্রগণ্য সর্বগুণান্বিতা কন্যাকে দেখে যদি শিব স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করেন। যাহোক এখন থেকে নিত্য গিরিসুতা পার্বতী সখীদের সঙ্গে শিব সন্নিধানে পূজা করতে যেতে লাগলেন—এখন স্বয়ং মহাদেবই তাঁর আরাধ্য দেবতা, আর মৃন্ময় পুত্তলি নয়।

এদিকে দেবতাদের কাছে আর এক সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। ব্রহ্মার বরে শক্তিমত্ত হয়ে তারকাসুর স্বর্গরাজ্যে উৎপাত শুরু করেছে—

এজন্য দেবতারা খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। ব্রহ্মার বরে তারকাসুর অজেয়—তাকে কেউ বিনাশ করতে পারলেন না। একদিন দেবতারা ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করলেন। সব শুনে ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন। তারপর নয়ন নিমিলিত করে বললেন, "তপস্যার ফলে আমার বরে তারকাসুর অমর না হলেও নর-রাক্ষস-কিন্নর সকলেরই অজেয়। তাকে একমাত্র শিব-তনয়ই বিনাশ করতে সক্ষম, আর অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু শিব এখন মহাধ্যানে নিমগ্ন; যদি গিরিরাজ কুমারী পার্বতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া যায় তবেই এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।"—

ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করলেন। স্থির হল মহাধ্যানে নিমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিয়ে তাঁকে জাগাতে হবেই, তা না হলে পার্বতীকে তিনি দেখবেন কেমন করে? আর পার্বতীর শ্রীমুখকমল দর্শন না করলে, তাঁর মনে চাঞ্চল্য না এলে বিবাহের বাসনা জাগবেই বা কি করে? চরম বৈরাগী মহাদেবের মনে কামনা-বাসনা না জাগলে কিভাবে হর-পার্বতীর বিবাহ হবে? তাই দেবতারা মদনদেবকে এ কাজে নিয়োগ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে বসন্তকেও পাঠানো হলো। সকলের আশা কামদেবই শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে কার্যোদ্ধার করবেন।

একদিন পার্বতী যথারীতি শিবপূজায় এসেছেন। মদনদেবও সুযোগ বুঝে উপস্থিত হয়েছেন। ঋতুরাজের আগমনে প্রকৃতি সৌন্দর্য-ময়ী হয়ে উঠেছে। মোহনবেশে রতিপতি ফুলধনুতে ফুলশর স্থাপন করে উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় রইলেন। তাপসী পার্বতী ধ্যানরত শিবের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পদ্মবীজের মালিকা তাঁর হাতে দিচ্ছেন, ভক্ত-বৎসল মহাদেবও তা গ্রহণ করতে হাত বাড়াচ্ছেন ঠিক এমন সময় কামদেব তাঁর পুষ্পধনুকে সম্মোহন বাণ যোজনা করলেন। ঐ শরপ্রভাবে চতুর্দিক অকস্মাৎ মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ল। মহাযোগী মহেশ ক্ষণিক বিচলিত হয়ে পার্বতীর ব্রীড়ানত আরক্ত মুখপানে চাইলেন। কিন্তু তার পরই সম্বিত ফিরে পেলেন এবং আত্মদমন করে নিজের চিত্তাঞ্চল্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন শঙ্কর। দেখলেন সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন মদনদেব আর অমনি দেবতাদের কৌশল চিত্রটি মন-মুকুরে ভেসে উঠল তাঁর—ক্রোধে ত্রিনয়ন ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল ত্রিলোচনের, সবেগে ছুটে গেল অগ্নিজ্বালা স্ফুলিঙ্গ হয়ে মদনের ওপর, মুহূর্তে কামদেব

পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলেন। দেবতারা স্বর্গে হাহাকার করে উঠলেন। মহাদেব আর কালবিলম্ব না করে সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। হতাশ মনে দুঃখ নিয়ে পার্বতী পিতৃগৃহে ফিরে এলেন।

পার্বতী বুঝতে পারলেন রূপে শুদ্ধ প্রেমের সম্ভব হয় না। বিনা সংযমে বিনা সাধনায় বিনা তপশ্চর্যায় ভালবাসা পাওয়া যায় না আর বিনা প্রেমে শিব-লাভ হয় না। সুতরাং পরা-প্রেম লাভের জন্য পার্বতী মহাতপস্যায় রত হলেন। বসন-ভূষণ ত্যাগ করে তিনি বল্কল ও চীরবাস পরিধান করে যোগিনী হলেন। আহার ত্যাগ করলেন, নিদ্রা বিসর্জন দিলেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা আরাম বিরাম ভুলে সর্ববিধ কষ্ট সহ্য করতে লাগলেন শিবধ্যানে মগ্ন হয়ে। শীত ঋতুতে প্রবল শৈত্যে নদীর বরফ-শীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে, দারুণ নিদাঘে প্রচণ্ড গরমে চারি পাশে লেলিহান অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে, প্রবল বর্ষায় বাত্যা-বিক্ষুব্ধ দিনে রাতে উন্মুক্ত আকাশ তলে দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গ সিক্ত করে শিবধ্যানে তদ্গত হয়ে হিমালয় নন্দিনী উমা যোগিনীর বেশে যোগ-সাধন করতে লাগলেন। এইভাবে কত দিন গেল, কত রাত গেল, কত মাস গেল, কত বছর গেল, কত যুগ গেল পার্বতী হয়ে পড়লেন অতিশয় ক্ষীণতনু দুর্বলা, হতশ্রী কিন্তু অতিশয় প্রদীপ্তা—জ্যোতির্ময়ী। তাঁদের সোনার প্রতিমা পার্বতীর এই অবস্থা দেখে হিমালয়-মেনকা বেদনা-বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

মহাদেবও আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তবৎসল শিব তপস্যায় ভক্ত তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তো আর কাছে না এসে থাকতে পারেন না। তিনি ছদ্মবেশে পার্বতীকে দেখা দিলেন। ছদ্মবেশী মহাদেবকে উমা চিনতে পারলেন না, পরপুরুষের সম্মুখে অস্বস্তি অনুভব করলেন, অনুমান করলেন আগন্তুক হয়ত বা কোন দেবতা বা মুনিঋষি কেউ হবেন।

শিব পার্বতীকে এভাবে যৌবনে যোগিনী সেজে কৃচ্ছ্রসহকারে তপস্যা করার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন এবং যখন কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলেন যে, শিবকে পতিরূপে লাভ করার উদ্দেশ্যেই পার্বতীর এই তপস্যা। তখন তাঁর ভক্তি পরীক্ষা করার জন্য তাঁরই সম্মুখে শিবকে উপহাস করে বললেন—"হায়! গিরিসুতে, তুমি এমন এক নিকৃষ্ট দেবতাকে পতিরূপে লাভ করার জন্য দুশ্চর তপস্যা করছ! শিব সমস্ত দেবতার মধ্যে নিকৃষ্ট, তার ভদ্র-অভদ্র জ্ঞান নেই—সে শ্মশানে-মশানে ঘোরে—চির দরিদ্র।

সুচরিতে, তোমার এ তপঃ সাধনা নিরর্থক। শিবের সঙ্গে বিয়ে হলে তোমার কপালে যথেষ্ট দুঃখ ভোগ আছে, তার চেয়ে অন্য কোন দেবতাকে পতিরূপে বরণ করলে তোমার বিস্তর সুখলাভ হবে।"—

পার্বতী ছদ্মবেশী মহাদেবের মুখে শিব-নিন্দা শুনে আর সহ্য করতে পারলেন না, ক্রোধে তাঁর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল—তিনি আগন্তুককে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। ভক্ত ও শিবগতপ্রাণা পার্বতীর মনের পরিচয় পেয়ে পুলকিত অন্তরে মহাদেব হাসলেন। তাঁর ছদ্মবেশ খসে পড়ল। পার্বতী তাঁর সম্মুখে তাঁর উপাস্য দেবতা, তাঁর হৃদয় দেবতাকে দেখে আনন্দকম্পিত হৃদয়ে লজ্জায় নয়ন নিমীলিত করে আবার উন্মোচিত করলেন। প্রিয়তমা পার্বতীর মুখের 'পরে ভোলানাথের ভুবন ভোলানো হাসি ছড়িয়ে পড়ল। শিব গিরিসুতা পার্বতীকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হলেন—তপস্যা সিদ্ধ হল উমার।

হিমালয় ও মেনকা খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হলেন—তাঁদের মনের বাসনা এতদিনে পূর্ণ হল। হিমালয় স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করলেন। সকল দেবতা মহানন্দে বিবাহোৎসবে যোগদান করলেন। শিব ফিরে পেলেন পার্বতীরূপে তাঁর হারানো 'সতী'কে! দেবতারা আশুতোষকে স্তব করে তুষ্ট করে মদনের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন ও শিবকে তাঁকে ক্ষমা করতে বললেন এবং তাঁর প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। শিব মদনকে ক্ষমা করলেন। মহাদেবের অনুগ্রহে রতিপতি পুনরায় জীবন ফিরে পেলেন।

পার্বতীর শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য দুশ্চর তপশ্চর্যা এবং পরিশেষে তাঁর সে আকাঙ্ক্ষার পূর্তি—মূল এই বিষয়বস্তু নিয়ে উপাখ্যানটি কত যুগ ধরে না জানি মানুষকে অমৃত কথা শোনাচ্ছে।

শিব-পার্বতীর এই আখ্যানটি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, দেবদেবীর আচার-আচরণে মানবিক গুণ আরোপিত। এঁরা যেন আমাদেরই ঘরের মানুষ। এর দ্বারা হয়ত প্রমাণিত হবে না যে, শিব কোন অতিমানস সত্তায় বিরাজিত ছিলেন অথবা এই উপাখ্যান কোন কাল্পনিক উপাখ্যান নয়। এখানে বিশেষভাবে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়, তা হল শিবমাহাত্ম্য প্রচার। শিব দেবশ্রেষ্ঠ তাঁর চিন্তাদর্শই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের একমাত্র পথ—মহৎ হওয়ার সোপান। আর পার্বতীর তপস্যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়েছে রমণীর কাম্য হবে এমন পতি যিনি শিব-গুণসম্পন্ন অর্থাৎ আত্মানুসন্ধানী এবং সেইরূপ পুরুষকে

স্বামীরূপে লাভ করতে হলে পার্বতীর মতই তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ প্রেমে সমুজ্জ্বল হতে হবে। শিব-পার্বতীর এই আত্মিক মিলনই হলো পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের মধ্যে ব্রহ্মের আনন্দ-লহরী। উপাখ্যানে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মার অবিনাশত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—আত্মা অবিনাশী—মানবাকারে জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয় মুক্তির মোহনায়—পার্বতীরূপে সতীর শিবকে লাভ করার মধ্যে এটি প্রস্ফুটিত। তাছাড়া লৌকিকবোধে পুনর্জন্মবাদের বক্তব্যও যেন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। যুগ-যুগান্তর ধরে জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে একই নারী ও পুরুষ যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা এ ধারণাও যেন স্পষ্ট হয়েছে। পূর্ব অধ্যায় ও বর্তমান অধ্যায় এই দুই অখ্যানভাগের মধ্যেই বিশেষভাবে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়, তা হল দেবাদিদেব মহাদেবের ঘরণী দেবতা দক্ষের কন্যা সতী অমর ছিলেন না এবং পার্বতীকেও এখানে অমর বলা হয়নি।

আমাদের বেদ, পুরাণ ও মহাকাব্যাদির মধ্যে দেখা যায় পালনকর্তা বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতাররূপে বারংবার আবির্ভূত হয়েছেন, যখন যখন অধর্মের পুঞ্জীভূত গ্লানি জগৎ-প্রাণকে কলুষিত করেছে—খিন্ন করেছে। অপরদিকে ব্রহ্মা বা শিব জগতে অবতাররূপে প্রকটিত হননি। সংহার-কর্তা হিসাবে শিবকে ধারণা করা হলেও দেবাদিদেব মহাদেব পরমব্রহ্ম হিসাবেই যেন অনুভাবিত। যিনি শাস্ত্রীয় আখ্যানে আমাদের ঘরের মানুষ ভোলানাথ আশুতোষ—বিশ্বমধ্যে লীন হয়ে বিশ্বমানবের সঙ্গে ফেরেন বিভেদনাশের ত্রিশূল হাতে নিয়ে—শুভ চেতনার পিনাক বাজিয়ে। মানুষের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তিনি বর দেন। বৈরাগ্য ও পরাজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে আমাদের প্রাণের অন্ধকার দূর করেন। তাই 'বিশ্ব সাথে যোগে' যিনি সর্বদা বিহার করছেন সেই স্বয়ম্ভু শিবের অবতার হিসাবে প্রকটিত হওয়ার প্রয়োজন বুঝি নেই।

কৈলাসে রহেন শিব

আমাদের ধারণায় ত্রিভুবনপতি দেবাদিদেব মহেশ্বর শিবের বাসভূমি কৈলাস পর্বত। কৈলাস হিমালয় অঞ্চল। মানস সরোবরের উর্ধ্ব দেশ জুড়ে পূর্ব-পশ্চিমে এর বিস্তৃতি। কেদার ক্ষেত্র, বদরী ক্ষেত্র ও তৎ সংলগ্ন কিছু অঞ্চল কৈলাসভূমি বলে ধারণা করা হয়। শিব কৈলাসে অবস্থান করেন বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন। শিবভূমি ভারতভূমি—শিবভূমি পৃথ্বীতল হলেও শিবের খাস তালুক কৈলাস।

কৈলাস তুষারময় পর্বত শিখর (৬৮১৪ মিটার উচ্চ) এবং শিবলিঙ্গাকৃতি। দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতে এর অবস্থান—লাসা থেকে ১২৮৭ কিলোমিটার দূরে। তিব্বতীরা কৈলাসকে তিস্‌রে বলে অভিহিত করে।

মহাভারতে কৈলাস পর্বতকে হেমকূট বলা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কৈলাস মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। কৈলাস পর্বতমালা কাশ্মীর থেকে ভূটান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতমালার মধ্যভাগে লাছু ও ঝংছু পর্বত দুটি দিয়ে ঘেরা অংশকেই বলা হয় কৈলাস পর্বত। এই পর্বতের উত্তরে কৈলাস শিখর। শিবালয় কৈলাসের অন্
কৈলাস যাবার ছটি হাঁটা পথ আছে।

আমরা বেদ গ্রন্থাদিতেও লক্ষ্য করে
উপনিষদের ছন্দোবদ্ধ স্তবকে রুদ্র যিনি শিবেরই প্রতিমূর্তি তাঁকে গিরি অধিপতি, গিরিরক্ষক বা গিরিশ বলা হয়েছে অর্থাৎ পরোক্ষে তিনি কৈলাসবাসী একথা বলা হয়েছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অভিব্যক্তি প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তি বিকাশের মধ্যে জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতির সঙ্গে অনুভব করে আন্তর উপলব্ধির আলোয় মানুষ শিবরূপ অর্থাৎ অনাদিদেব মহেশ্বরের রূপ কল্পনা যদি করে থাকে তাহলে রজত-শুভ্র তুষারাবৃত, বনবনানী পরিকীর্ণ, নদী উর্মির কলোচ্ছ্বাসপূর্ণ, তুফানে ভয়াল ভয়ঙ্কর যে হিমাদ্রি সেখানে মহাদেবের বাসভূমির কল্পনা। ঠিক কপোল কল্পনা নয়। ধ্যান-গম্ভীর ভূধর তার বিশালতা ও স্থাণুত্ব নিয়ে পরমদেবতা মহাদেবেরই মত অভিব্যক্ত।

পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, বহু মহাতীর্থক্ষেত্র বা পুণ্যময় স্থান বা ঘটনার কথা গল্পছলে শিব কৈলাসভূমিতে ভ্রমণ করতে করতে পার্বতীকে শ্রীমুখে বলেছেন। এখানে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় দেবতার ওপর মানবত্ব আরোপিত হয়েছে। এগুলি হয়তো মানুষের দ্বারা ঈশ্বরের রূপ কল্পনা অথবা শিব অনুগামীদের শিব মহিমা প্রচার পরিকল্পনা। তবু মহাদেবের কৈলাস ও মনুষ্য-সুলভ কার্যাদি দেখে এ ধারণাও মনে না জেগে পারে না যে, শিব কি কোন মহাশক্তিধর অতিমানস সত্তা ছিলেন? এ সম্ভাবনা যদি নাও মানা যায় তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষ তার নিজ কল্পনায় শিব গড়ে শিবকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে লাভ করেছে তার ভক্তি উপাচারে—একনিষ্ঠ সাধনায়।

(শিবালয় কৈলাসে হর-পার্বতী অবস্থান করেন। শিব যে কৈলাস শিখরে বাস করেন তারও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে। 'কৈ' শব্দে কৈবল্য বোঝায় যার অর্থ মুক্তি আর 'লাস' শব্দে বিলাস এবং শিখর শব্দে বোঝায় সর্বশ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ মহানির্বাণ বা কৈবল্য মুক্তি নামক সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে শিব বিরাজ করেন—যিনি জ্ঞানস্বরূপ! জ্ঞানস্বরূপ আত্মমূর্তিই হলেন শিব। একমাত্র শিব অর্থাৎ পরমাত্মাই অনাদি অনন্তকাল যাবং ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। কারণ তিনি অক্ষয়, অব্যয়, ভূমা এবং নির্বিকল্প সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাই তিনিই সমস্ত জীবের একমাত্র শ্রোতব্য, জ্ঞাতব্য

ছাড়া তাঁর খাসতালুক আর কোথায় হবে?

এর বর্ণনার ভাষা যেন তাই নেই।)

যে, কেদারক্ষেত্র, বদরীক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্য-শিবক্ষেত্রগুলি কৈলাসভূমি বলে ধারণা করা হয়েছে। এই কৈলাসক্ষেত্রের কথা অতি পুণ্যকথা।

একদা শিবক্ষেত্রে কৈলাসভূমিতে পার্বতীসহ বিচরণকালে মহাদেব পার্বতীকে যে সকল পুণ্যকথা বলেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে 'শ্রীশ্রী কেদার মাহাত্ম্যমে' তা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। কেদারক্ষেত্রের কথা অতি পুণ্যকথা—হিমালয় তু কেদারম্।

বমকেদারেশ্বর হিমাদ্রি শিখর পর
বিরাজিত বম্ বম্ হরে হরে॥
জয় স্বয়ম্ভু শঙ্কর শশাঙ্ক শেখর
ত্রিভুগুণাকর হরে হরে॥

শিব পার্বতীসহ বিচরণ করছেন কৈলাসক্ষেত্রে। কৌতূহলী বালিকার মত গৌরী কৈলাসের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী অবলোকন করছেন এদিক ওদিক। কোন কোন স্থান যেন অতি পরিচিত বলে মনে হচ্ছে তাঁর। চারিদিক দেখতে দেখতে পার্বতী কৌতূহলী হয়ে মহাদেবকে বললেন, "দেব, স্বর্গ ও মোক্ষদাতা কেদারক্ষেত্রের কথা আমায় বলুন। এখানে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্র আছে এবং তাদের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি তা আমায় বিস্তারিত বলুন। এই কেদার তীর্থকে সর্বোত্তম তীর্থই বা বলা হয় কেন?"

স্মিত মুখে ধূর্জটি পার্বতীর মুখপানে চেয়ে বললেন, "প্রিয়ে এ স্থানের বিবরণ আমি তোমায় বলছি শোন। এ আমার অতি প্রিয় ক্ষেত্র। আমি যেমন প্রাচীন এই স্থানও তেমনি অতি পুরাতন। যখন আমি ব্রহ্মামূর্তি ধারণ করে সৃষ্টি কার্য করি তখন থেকেই এই ক্ষেত্র রয়েছে। তদবধি আমি এখানে পরব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছায় সর্বদা বিদ্যমান আছি এবং সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই ক্ষেত্র দেবতাদেরও দুর্লভ হয়েছে। নন্দী ভৃঙ্গী এরা দ্বারদেশে অবস্থিত আছে। প্রিয়ে, ঐ অদূরে যে উচ্চভূমিটি দেখছ, গিরিসুতে, হয়ত তুমি এখন স্মরণে আনতে পারছ না, বাল্যকালে তুমিও ঐখানে ক্রীড়া করেছ।"—

ক্ষণিক নীরব থেকে মহেশ্বর গৌরীর পাশে উপবেশন করে পুনরায় প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "হে মহাদেবি! জেনো কেদারক্ষেত্রে মৃত্যু হলে মনুষ্য শিবত্ব পায় এতে কোন সংশয় নেই। জগতে তারাই ধন্য ও পুণ্যাত্মা। যেমন সতীদের মধ্যে তুমি, দেবতাদের মধ্যে নারায়ণ, সরোবরের মধ্যে সাগর, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্বতের মধ্যে হিমালয়, যোগী-গণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য, ভক্তগণের মধ্যে নারদ, শিলার মধ্যে বিজ্রবী শালগ্রাম, বনের মধ্যে বদরীবন, গাভীর মধ্যে কামধেনু, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্ঞানোপদেশক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীগণের মধ্যে পতিব্রতা স্ত্রী, প্রিয়দের মধ্যে পুত্র, মনুষ্যের মধ্যে নরপতি, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, অসুরদের মধ্যে কুবের এবং পুরীর মধ্যে যেমন আমার বারাণসী, অপ্সরাদের মধ্যে যেমন রম্ভা, গন্ধর্বদের মধ্যে যেমন তম্বুরু শ্রেষ্ঠ তেমন সকল ক্ষেত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল এই কেদার ক্ষেত্র।"—

এই কথা বলে শিব কিছুক্ষণ চুপ করে ধ্যানস্থ হলেন, পরে নয়ন উন্মোচন করে দুর্গাকে বললেন,

প্রিয়ে, আমার এই প্রিয় ক্ষেত্রটির মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি ঘটনা

বিবৃত করছি শোন।—

"এখানে কোন এক গ্রামে এক ভয়ঙ্কর শিকারী ব্যাধ বাস করতো। সে সদাই মৃগ মাংস ভক্ষণ করত এবং মৃগ মাংস বিক্রয় করত। একদা সেই ব্যাধ মৃগয়ার জন্য বনে গেল এবং সেখানে অনেক মৃগ ও অন্যান্য প্রাণী শিকার করল। এইভাবে বনে বিচরণ করতে করতে মৃগ ও পশুগুলি নিয়ে সে কেদার তীর্থে এসে উপস্থিত হল।"

ক্ষণ বিরতি দিয়ে শঙ্কর আবার বললেন—

"দেবীশ্বরি! শোন, ব্যাধ যখন কেদার ক্ষেত্রে ইতস্তত: বিচরণ করছে তখন সেখানে কাষায় বস্ত্র পরিহিত মহামুনি ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদকে ঋষিগণের নিবাস ক্ষেত্রে ভ্রমণরত দেখতে পেল। ব্যাধ নারদকে চেনে না, কাষায় বস্ত্র পরিহিত নারদকে দেখে সে ভাবল যে, এই স্বর্ণ বর্ণ মূর্তি আর কিছু নয় মৃত মৃগগুলি দিব্যরূপ ধারণ করে স্বর্ণ মৃগ রূপ নিয়েছে। তাই সে মনে মনে বিচার করল, এই সোনার মৃগ দ্বারা আমি স্বর্ণময় হব অর্থাৎ অপর্যাপ্ত স্বর্ণ লাভ করব।"—এইরূপ চিন্তা করে ব্যাধ যেমনি স্বর্ণমৃগ বধ করার জন্যে তার ধনুকে বাণ যোজনা করেছে, অমনি অবাক হয়ে দেখল যে, তার চোখের সামনে থেকে মৃগগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেবী দুর্গা পতির মুখপানে চেয়ে গভীর মনোযোগে কপালে কর স্থাপন করে শিব-কথা শুনছিলেন, বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "আশ্চর্য তো! দেব, তারপর কি ঘটেছিল?"

পত্নীর মুখপানে গভীর প্রেমপূর্ণ নয়নে চেয়ে শিব উত্তর দিলেন, "প্রিয়ে, তারপর আরও অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। নিষাদ বিস্মিত ভীতচিত্তে তখন কিছুদূর অগ্রগমন করলে অন্য এক আজব দৃশ্যের সম্মুখীন হল। সে দেখতে পেলে এক প্রশস্ত গহ্বরে এক ভেক বসে আছে এবং একটি ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্প তার অগ্রভাগ ভক্ষণরত। ব্যাধ আরও অবাক হয়ে দেখল যে, চক্ষের নিমেষে দেখতে দেখতে ঐ মণ্ডুক এক সর্পযজ্ঞোপবীতধারী অর্ধচন্দ্রসমন্বিত ও মস্তকে জটাজূট বিরাজিত তাপসমূর্তি পরিগ্রহ করল—ঐ মূর্তি আমার মূর্তি (অর্থাৎ শিব মূর্তি)। তার কান্তি কৈলাস পর্বতের মত ধবল। ত্রিশূলধারী, নীলকণ্ঠ এবং অজিন ও হস্তিচর্ম পরিহিত শিবরূপ ধারণ করে ঐ মণ্ডুক চলে গেল। ঐ দৃশ্য দেখে ভয়ে বিস্ময়ে নিষাদের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এবং সে আপন মনে বলে উঠল, আরে কি তাজ্জব ব্যাপার! ব্যাঙটা ভোলাবাবার রূপ ধরে, সাপের পৈতে গলায় পরে দিব্যি চলে গেল। আমি কি ভেলকি—

বাজি দেখছি ? না কি এ স্বপ্ন ? এ আমি কোন্ যাতুকরের দেশে এলাম। এগুলো কি ভূত-প্রেতের ব্যাপার—হায়, আমি আর বাঁচবো না ! এইসব চিন্তা করে শিকারী ব্যাধ ভীষণ ভয় পেল এবং ভয়ে তার সর্বশরীর শিহরিত হতে লাগল। তখন নিষাদ শিরে হস্তবিক্ষেপ করে ক্রন্দন রত হল এবং বিলাপ করতে লাগল—'বুঝেছি নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হয়েছে এবং সে কারণে আমি বিকারগ্রস্থ হয়েছি। হায় ! আমি অতিশয় মন্দভাগ্য, এই ভূতসেবিত বনে এখন একাকী কোথায় যাই, কি করি ! এই ঘোর মায়া বনে কে আমায় রক্ষা করবে ? হায় ঈশ্বর আমি মরলাম !—এই কথা বলে মহাদেব ক্ষণিক থেমে পার্বতীর মুখপানে চাইলেন। দেবী চমক ভেঙ্গে বললেন, "দেব, তারপর কি হল সেই নিষাদের ?"

"তারপর", শিব বলে চলেন, "সেই ব্যাধের মনে এধরনের ভাবনার উদয় হওয়ায় সে তখন প্রাণভয়ে ঐ বন থেকে পলায়ন করার চেষ্টা করতে লাগল। আর তখনই আবার এক বিচিত্র দৃশ্যের সম্মুখীন হল। সে দেখল যে, একটি পলায়নরত হরিণকে এক ভয়ঙ্কর ক্রূরনখ শার্দুল হত্যা করছে। কিন্তু আশ্চর্য ! মৃগটি গতপ্রাণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীতগ্রস্থ ব্যাধ দেখতে পেল যে, মৃত কুরঙ্গ পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন ও নাগযজ্ঞোপবীতধারী শিবরূপ ধারণ করেছে। হঠাৎ দেখা গেল কোথা থেকে অপর এক ব্যাধ এসে বাণাঘাতে ব্যাঘ্রটিকে হত্যা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঘও একটি বৃষভ রূপ ধারণ করল আর তখন শিবরূপধারী হরিণ বৃষরূপী বাঘের ওপর আরোহণ করে চলে গেল।"

এই বিবরণ দিয়ে শিব তুর্গাকে বললেন, "প্রিয়ে, ব্যাধটি যখন বারংবার এইসব অলৌকিক দৃশ্য দেখে ভয়ে বিস্ময়ে বিবশ হয়ে পড়েছে ঠিক সেই সময় দেবর্ষি নারদকে দেখা গেল তার দিকে আসছেন। নারদ মুনিকে দেখে নিষাদ কিছুটা আশ্বস্ত হল এবং ছুটে তার কাছে গিয়ে ভয় জড়িত স্বরে ভয়ঙ্কর অরণ্য মধ্যে যে সব অত্যদ্ভুত ব্যাপার দেখেছে সেগুলি বিবৃত করল। নিষাদের কথা শুনে দেবর্ষি সুস্মিত কণ্ঠে বললেন, "বৎস, ভয় পেও না, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে সাধু ও অসাধু তুই-ই রয়েছে। আবার এই অরণ্যও সাধু। দেবর্ষি নারদের কথা বুঝতে পারে না নিষাদ, আশ্চর্য হয়—বলে "মহাভাগ, আমি বুঝতে পারছি না আমি কিভাবে সাধু ও অসাধু হলাম। এই বনও কিভাবে সাধু হল ?—তার কথা শুনে নারদ মুনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'হে লুব্ধক শ্রেষ্ঠ !

তুমি ধন্য যে, তুমি এই সর্বোত্তম তীর্থে এসেছ এবং এইসব শুভ দর্শন প্রত্যক্ষ করেছ। সে কারণেই তোমাকে সাধু বললাম আর তুমি অসাধু কারণ তোমার এই শুভ জ্ঞান নেই যে, এই স্থানের মাহাত্ম্যের গুণে পশুযোনি প্রাপ্ত জীবও শিবত্ব পায়।'

এরপর শিব বললেন, "জান পার্বতী, নারদের বাক্য শ্রবণ করে ব্যাধের চৈতন্যোদয় হল। সে তক্ষুণি মুনিবরকে আভূমি প্রণাম করে বলল, 'মুনিবর, আপনার দর্শনে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। এখন দয়া করে এই ভবসাগর থেকে আমায় ত্রাণ করুন। আমি ঘোর পাপী, মুনিদের হত্যাকারী এবং দুষ্ট। হে মহাভাগ, আমায় বলুন কিসে আমি মুক্তি লাভ করবো।' নারদ তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'তোমার জ্ঞানোদয় হয়েছে, তুমি এখানেই বাস করতে থাক, এই শিবভূমির পুণ্যেই তুমি মুক্তি লাভ করবে।'

শিব এই কথা বলে পার্বতীকে বললেন, "দেবি, নারদ ব্যাধকে এই উপদেশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং শিকারী ব্যাধ সেখানে বসবাস করতে লাগল, পরে পরমগতি প্রাপ্ত হল।"

"প্রিয়ে, তোমাকে আমার প্রিয় ক্ষেত্রের কথা বললাম। এর মাহাত্ম্যের শেষ নেই। অন্যান্য আরও যে সমস্ত গুপ্ততীর্থ এখানে আছে সে কথা তোমায় বলছি শোন।"—

মহেশ্বর তখন একে একে দুর্গাকে বললেন ;—

"দেবি, দক্ষিণে ঐ দূরে যে রেতঃ কুণ্ড নামে পবিত্র জলকুণ্ড আছে তার জল পান করা মাত্র জীবের শিবত্ব লাভ হয়। (ঐ জলে পারদ এমনভাবে মিশ্রিত আছে যে তা শরীরের কল্যাণকারক) শিবলোক দাতা, শিবকুণ্ড নামে বিখ্যাত কুণ্ড রয়েছে সেখানে মানুষের শিব সাযুজ্য-লাভ হয়। তাছাড়া রয়েছে পাপীগণের মুক্তিদাতা ভৃগুকুণ্ড। শ্রীশিলা যাঁর নাম তুঙ্গনাথ তার ওপর বসে তপস্যা করলে তার পুণ্যে গো হত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যাজনিত পাপ মোচন হয়। এখানে যে প্রাণ ত্যাগ করে তার ঘটে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি।

এরপর আছে তীর্থশ্রেষ্ঠ হিরণ্যগর্ভ। এখানকার মৃত্তিকাগর্ভ থেকে বুদ্বুদাকার লোহিতবর্ণের জল বিনির্গত হচ্ছে সর্বদা। যার স্পর্শে লৌহ প্রভৃতি ধাতু স্বর্ণময় হয়ে যায়। এই সুদুর্লভ তীর্থের দর্শন করলে মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে।

ক্ষণ বিরতির পর শিব পুনরায় বললেন, "দেবি! হিরণ্যগর্ভ তীর্থের

উত্তরে প্রতিষ্ঠিত আছেন এক উত্তম স্ফটিক জ্যোতির্লিঙ্গ, যাঁর অর্চনা করলে মানব সঙ্গে সঙ্গে শিবকে পায়। সেখান থেকে পূর্বদিকে গেলে পড়বে বহ্নিতীর্থ—অগ্নিময় বরফগলা জল বরফের মধ্য থেকে নির্গত হচ্ছে কিন্তু অতি উষ্ণ—সঘৃত আহুতি দিয়ে এস্থানে দেব পূজা করতে হয়, তাহলে বহ্নি পরিতৃপ্ত হয়ে ঈপ্সিত বরদান করে থাকেন। হে শিবে, আরও উত্তরদিকে রয়েছে এক অতিশয় আশ্চর্য বিবর, সেখানে পর্বত শৃঙ্গের অগ্রভাগ থেকে জল মাটিতে পড়ছে ও জলবিন্দু তক্ষুণি মুক্তাবিন্দু হয়ে যাচ্ছে। প্রিয়ে, মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন মুক্তা দিয়ে আমার পূজা করেছিল। আর সেখানে মুক্তা ও প্রবালখচিত নানা হর্ম্যরাজি বিদ্যমান আছে। দেবেশ্বরি! সেই সমস্ত অট্টালিকায় গন্ধর্ব এবং অপ্সরগণ আনন্দোৎফুল্ল হয়ে পরম ঈশান মহাদেবের গুণগান করে থাকে। সেখানে একমাত্র মহাবুদ্ধিমান ও পুণ্যাত্মাগণই যেতে পারেন। তারপর আছে মহাপন্থা তীর্থ, যেখানের পরিমণ্ডল এতই পবিত্র, স্নিগ্ধ ও শান্ত যে, সেখানে গেলে কারও কোন অনুতাপ থাকে না। সেই মহাপথে রত্নজড়িত স্বর্ণের ভূমি এবং সোনার পক্ষী শোভা পাচ্ছে। সেখানকার বৃক্ষগুলি সোনার এবং সেগুলি প্রবালের লতাবেষ্টিত। তাছাড়া সেখানে গরুড়ের ন্যায় মহাতেজসম্পন্ন অনেক মহাগৃধ্র পক্ষী আছে। আর আছে চতুর্দিকে ছড়িয়ে এক এক যোজন বিস্তৃত বৃহদাকার সর্পকুল। দেবি, আমার সেই স্থানের ধাম সাত প্রকোষ্ঠ বেষ্টিত। যেখানে ব্রহ্মা আদি দেবগণ সর্বদা আমার সেবা করে থাকেন ও মহাভৈরব দণ্ড হাতে করে শাসন করে থাকেন। ভূত, বেতাল, প্রেত, কুষ্মাণ্ড, জৃম্ভক, নন্দী, ভৃঙ্গী আদি আনন্দে ক্রীড়া করে থাকে। হে বল্লভে, আমি সেই মহাপথ তীর্থে সর্বদা উপস্থিত আছি। হে দেবেশ্বরি, এই স্থান থেকে অধিক প্রিয় স্থান আমার আর কোথাও নাই। যে কোন লোক যদি সভক্তিতে বলে "আমি মহাপন্থ" যাব এবং সেখানে গিয়ে প্রাণত্যাগ করবো, সেও আমার প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়, আর যারা সকল প্রকার পার্থিব আসক্তিহীন তাদের কথা আর কি বলব।"

এই কথা শেষ করে শিব নীরব হলেন। ক্ষণপরে পুনরায় আত্মগত স্বরে বললেন, "আমাকে হৃদয়ে স্থাপনপূর্বক আমার কৈলাসস্থ মন্দিরে লোকে গমন করবে। আমার সেই পরম মহৎ স্থান স্বর্গারোহণ পর্বতের শিখরের মধ্যস্থলে। এই কৈলাস হল তীর্থময় পর্বত, সেখানে আমার সর্বদা অবস্থান। কৈলাস দর্শনেই ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাপ নাশ হয়। হে,

দেবেশি, পূজা ও স্পর্শ করলে যে কি হয় তা আর কি বলবো, সর্বপাপ নাশ হয়। ক্ষীরগঙ্গা নাম নিয়ে ঐ যে ধারা এসে মন্দাকিনীতে পড়েছে সেই পঞ্চম স্থানকে মহাতীর্থ বলা হয়—সে স্থান মঙ্গলপ্রদ। ঐ স্থানে স্নান করলে মানুষের কৈলাস বাস হয়—ঐ মহাতীর্থের নাম ব্রহ্মতীর্থ। ব্রহ্মতীর্থ হতে দক্ষিণদিকে যে বুদ্বুদ উঠে থাকে ঐ জল সামুদ্রিক বলে অভিহিত করা হয়, তার স্পর্শ কল্যাণদায়ক। আমার মন্দির (শ্রীশ্রী কেদারনাথের মন্দির) হতে বামদিকে যে সুন্দর পর্বতটি দেখা যায় তার নাম পৌরন্দর পর্বত—সুরপতি ইন্দ্র আপন স্থিতির জন্য এখানে আমার আরাধনা করেছিল। সেখানে আমার এক শিবলিঙ্গ আছেন, যাঁকে দর্শনমাত্র মানুষের মুক্তি লাভ হয়। আমার মন্দির থেকে দশ দণ্ডের পথ ব্যবধানে হংস কুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে, ঐখানে ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করে এসেছিলেন। যখন শিবানুচরগণ হংসরূপী ব্রহ্মাকে চিনতে না পেরে আক্রমণ করেছিল তখন ব্রহ্মা কুণ্ডের জলে ডুব দিয়ে অবস্থান করেছিলেন। সেজন্য ঐ স্থানের নাম হংসকুণ্ড হয়েছে। হংসকুণ্ডে পিণ্ডদান করলে পিতৃলোক মুক্ত হয়।

হে মহেশি, কেদারনাথরূপী আমাকে দর্শন এবং আমার রেতঃজল পান করলে মানবের হৃদয়ে শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হয়। সে ব্যক্তি পাপী বা পুণ্যাত্মা যাই হোক না কেন, যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে নেমেও লোকে যদি ভাবে আমি কেদারেশ্বরকে দেখতে যাব এবং এই ভাবনায় যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলেও সে শিবলোকে গমন করে। ভীমসেন নামে যে শিলা সেখানে আছে সেটি আমার পর্যঙ্ক স্বরূপ—আমি সেখানে সর্বদা উপস্থিত থাকি। এই কথা বলে মহাদেব নীরব হলেন। গৌরী পতির মুখপানে চেয়ে বললেন, "এ মহাতীর্থের কথা শোনাও মহাপুণ্যের কাজ—দেব আমায় আরও বলুন এই কৈলাসের কথা।"

শিব স্মিতমুখে পার্বতীর পাশে উপবেশন করে বলতে লাগলেন, "কেদারধামের দক্ষিণে প্রায় তিন যোজন* দূরে সর্বপ্রকার সিদ্ধিদাতা গৌরীতীর্থ। প্রিয়ে, এই স্থানের কথা তোমার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে। মন্দাকিনী তীরে এই স্থানে পূর্বকালে তুমি ঋতু স্নান করেছিলে, তাই এর নাম হয়েছে গৌরীতীর্থ। হে নিষ্পাপে, তুমি বিস্মৃত হয়েছ যে, মহাসেন কার্তিকেয়র উৎপত্তির জন্যে তুমি চেষ্টা করেছিলে। যাতে তুমি গৌরীতীর্থের মঙ্গলকারক গুণসকল বুঝতে পার সেজন্য

*এক যোজন = প্রায় চার মাইল।

এর চিহ্ন বলছি। এখানকার জল কটু ও উষ্ণ—মৃত্তিকা রক্তিম। গৌরীতীর্থ আমি কখনও পরিত্যাগ করি না—সেখানে আমি গৌরীশ্বর লিঙ্গরূপে অবস্থান করছি। গৌরীতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করে মস্তকে মৃত্তিকা ধারণ করে সে আমার প্রিয় হয়।

"গৌরীতীর্থ থেকে দক্ষিণদিকে গোরক্ষক আশ্রম—সেখানে সিদ্ধ গোরক্ষনাথ সর্বদা বিরাজিত। গোরক্ষ কুণ্ডের জল সর্বদা উষ্ণ। প্রিয়ে, এইখানে সপ্তরাত্রি কাল মঙ্গলময় শিবের আরাধনা করলে গোরক্ষনাথের মত সিদ্ধ হওয়া যায়। সেই মহাপর্বতে দেবিকা, ভদ্রকা, শুভ্রা ও মাতঙ্গী নাম্নী চারটি ধারা আছে। দেবিকা ধারায় মানব মিথ্যা বর্জিত হয়ে সাতরাত্রি ষড়ক্ষর অর্থাৎ ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্র জপ করলে স্পর্শমৌক্তিক দর্শন লাভ করে। স্পর্শমৌক্তিক স্পর্শমাত্র সমস্ত ধাতু নিঃসন্দেহে সোনা হয়ে যায়। সে স্থানে স্নান করলে অন্যান্য সিদ্ধিও পায় মানুষ।

"গৌরীতীর্থ হতে উপরের দিকে অগ্নিকোণে যে পর্বত আছে সেখানে চীরবাস পরিহিত এক ভৈরব আমার কেদারক্ষেত্র রক্ষা করছে—তাই সেখানে বস্ত্রখণ্ড দান মানবের পক্ষে এক মহাপুণ্যের কাজ।" ক্ষণ বিরতির পর শিব পুনরায় বললেন, "কল্যাণী। এর পরই বৈনায়ক তীর্থ, যেখানে তোমার পুত্র পরম সিদ্ধিদাতা বৈনায়ক অবস্থান করছে, যাঁকে তুমি তোমার অঙ্গরাগ থেকে জন্ম দিয়েছিলে। প্রিয়ে, নিশ্চয়ই তোমার সেই দুঃখপূর্ণ ঘটনার কথা স্মরণে আছে—তুমি অন্তঃপুরে বস্ত্র পরিবর্তন, প্রসাধন বা এরূপ কোন কাজে ব্যস্ত ছিলে - দ্বারে তোমার অঙ্গরাগ হতে উপজাত পুত্র বৈনায়ককে পাহারায় রেখেছিলে যাতে কেউ যেন অন্তঃপুরে না যেতে পারে—সেদিন তোমার সঙ্গে কি ব্যাপারে না জানি আমার বিশেষ প্রয়োজন পড়ায় আমি গৃহে আসছিলাম কিন্তু বৈনায়ক বাধা দিল এবং আমার পরিচয় পেয়েও বলেছিল, যে সে মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারে না। সে যে তোমার অঙ্গরাগজাত তা আমি জানতাম না অর্থাৎ ধ্যানযোগে জানিনি তাই তার মুখে 'তুমি তার জননী' এই কথা শ্রবণমাত্র এ তার ঔদ্ধত্য মনে করে আমি তার শিরশ্ছেদ করি এবং বৈনায়কের সেই মুণ্ড গিয়ে পড়ে শিবক্ষেত্রে। পরে তোমার কাছ থেকে সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে আমি প্রসন্ন হয়ে তার স্কন্ধে হস্তিমুণ্ড যুক্ত করে দিয়েছিলাম এবং সেই থেকে গণেশের নাম গজানন হয়েছে। নানাপ্রকার নৈবেদ্য উপচার সাজিয়ে সর্বপ্রথম গণেশের পূজা না করলে অন্য কোনও

দেবতার এমনকি আমার পূজাও সিদ্ধ হয় না। গণেশের পূজা করে তবে আমার মহাস্থান কেদারক্ষেত্রে গমন করলে শিবরূপ লাভ হয়।”

এই কথা বলে শিব প্রসন্ন হাস্যে দুর্গার মুখপানে চাইলেন—দেবীর মুখমণ্ডল জুড়ে তৃপ্তির আনন্দ খেলছে দেখা গেল।

শিব বললেন, “গঙ্গার অঙ্গ হতে নির্গতা হয়েছে কালিন্দী নদী, যাকে বাসুকী ও অন্যান্য নাগেরা সর্বদা সেবা করছেন। সেখানে এক সরোবরে শেষেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন—বড় বড় বিষধর সর্পকুল তাদের বিষ অগ্নিতে এই স্থান ভস্ম করে ফেলে। তবে সেই মহাবিষধরেরা যখন অতি ক্রুদ্ধ হয় তখনই এরূপ করে থাকে।” তারপর শিব বললেন, “মন্দাকিনী ও ত্রিবিক্রমের মঙ্গলস্থল অতিশয় পুণ্যপ্রদ স্থান, প্রিয়ে, আমি এখানে কালীশ্বর লিঙ্গ নামে অবস্থান করছি। এখান থেকে আমি জীবকে শিবলোকে নিয়ে যাই। এই তোমাকে, শিবে, আমার কেদার-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলাম।” এই কথা বলে দেবাদিদেব মহেশ নীরব হলেন।

কেদারক্ষেত্র, বদরীক্ষেত্র, মণিমহেশ প্রভৃতি শিবক্ষেত্র মহাতীর্থ—দেবতীর্থ। ‘তৃ’ ধাতু হতেই তীর্থ শব্দ হয়েছে। তীর্থ শব্দের অর্থ উত্তীর্ণ হওয়া। কি সে উত্তীর্ণ হওয়া? না, সংসারের পাপ-তাপ-জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। আর তারই জন্য অজ্ঞ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা শিবজ্ঞান যার লাভ হয়নি এমন লোকের তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজন হয়। অবশ্য গূঢ় অর্থে সে তীর্থ ঘরেও হতে পারে আবার ঘরের বাইরেও হতে পারে। সর্বত্র আছেন ঈশ্বর। তবু কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থানের মাহাত্ম্য এমনই যে, সেখানে স্বতঃই প্রাণে যেন তাঁর সান্নিধ্য লাভ হয়। ঐ সকল তীর্থের মহিমা প্রচারের জন্য অনেক অলৌকিক আখ্যায়িকা প্রস্তুত করে পুরাণাদি গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে।

শাস্ত্র তীর্থকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—ভৌমতীর্থ, জঙ্গমতীর্থ ও মানসতীর্থ। যে প্রদেশের জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত মনোরম এবং সাধুজন যেখানে বাস করেন, সেই সকল স্থানকে ভৌমতীর্থ বলা হয়। এই ভৌমতীর্থে গিয়ে তীর্থের মাহাত্ম্যে দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মানুষ অব্যাহতি পায় অর্থাৎ ঐ ব্যাধি হতে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে।

জঙ্গম তীর্থ হল আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ। জঙ্গম তীর্থের অর্থাৎ আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গ করে কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করতে পারলে ক্রমে

তার দ্বারা মনের হিংসা-দ্বেষ, মায়া-মোহ বিদূরিত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং এই জঙ্গম তীর্থের মহিমায় মানব প্রত্যক্ষই অবিদ্যার মোহ-সাগর হতে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে।

মানসতীর্থ হল নিজের মন, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট হয়ে সুনির্মল অন্তর। মানসতীর্থ যাত্রী হয়েই মানব ভব-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে মহানির্বাণ প্রাপ্ত হন। তীর্থং পরং কি ? পরম তীর্থ কি ? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে "স্বমনো বিশুদ্ধং" অর্থাৎ নিজের বিশুদ্ধ ও নির্মল মন।

উপরিলিখিত তিন প্রকার তীর্থের মিলিত ফল যে তীর্থের মাধ্যমে লাভ করে মানব-আত্মা মোক্ষত্ব অর্থাৎ শিবত্ব পায়, সেই দেবতীর্থকে বলা যায় মহাতীর্থ। কেদার-বদরী, মণি-মহেশ প্রভৃতি সেই মহাতীর্থ।

শিবের প্রিয় কেদারতীর্থ

"তুষারমণ্ডিত কৈলাস শিখরে, ফুলরাশি মাঝে মন্দাকিনী তীরে।
সুরম্য প্রদেশে, মহালিঙ্গবেশে, বিরাজিত সুন্দর মন্দিরে॥
জয় গঙ্গাধর, ত্র্যম্বক ঈশ্বর, বিশ্বআত্মা বিশ্বনাথ বিশ্বম্ভর।
বিশ্বসহ বিশ্বরূপ পরাৎপর, ভেলাভব সাগরে॥
তুমি সর্বব্যাপী তুমি সর্বেশ্বর, তুমি সর্বতত্ত্ব তুমি সরাৎসার।
তুমি সর্বসাক্ষী তুমিই ওঁকার, সেতু ভব পারে॥
তুমিই চিন্ময় বহির্মুখে জীব, অন্তর্মুখে তুমি আত্মীয় শিব।
অখণ্ডেতে আত্মা খণ্ড জ্ঞানে জীব, কে জানে তোমারে॥
চরাচর বিশ্ব তোমারি বিকাশ, তুমি ঘটাকাশ তুমি মহাকাশ।
চিদাকাশে যেন তব পরকাশ, পাই দেখিবারে॥
তুমি চিদাভাষ তুমি চিদানন্দ, চিদাত্মা চিদ্রূপ তুমি ব্রহ্মানন্দ।
আনন্দ নিলয় রাখ নিত্যানন্দ জ্ঞানানন্দে ভবপারে।"—

কেদার নামধেয় এক তীর্থ গয়া এবং অন্যটি কাশ্মীরে অবস্থিত হলেও সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ হিমালয়স্থিত কেদারক্ষেত্রেই অধিষ্ঠিত। দেবী পুরাণ অনুসারে কেদার একটি পিতৃতীর্থ। হিমালয়ের এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ (উচ্চতা ৩,৫২৫ মিটার বা ১১,৭৫০ ফুট) চামোলি জেলায় উখীমঠ মহকুমায় অবস্থিত। হৃষীকেশ থেকে কুণ্ডচটি। সেখান থেকে হাঁটা পথে ৫১ কি. মি. (৩২ মাইল) দূরবর্তী ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে কেদারনাথ পৌঁছুতে ৩ দিন লাগে। প্রায় ৩ বর্গ কি. মি. গোলাকৃতি প্রস্তরময় ঊষর উপত্যকা, মধ্য দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিণী মন্দাকিনী, পূর্বতীরে মন্দির ও লোকালয়, পশ্চিম তীর বসতিহীন। শীতের ছ'মাস এখানে বরফে ঢাকা থাকে। উপত্যকার তিন দিকে মহাপন্থ বা সুমেরু পর্বতমালা— রুদ্র হিমালয়, বিষ্ণুপুরী, ব্রহ্মপুরী, উদ্‌গারীক১ ও স্বর্গারোহিণী। এইখানে পঞ্চগঙ্গা ও পঞ্চকুণ্ড আছে।

উপত্যকার উত্তরে কেদারনাথ পর্বতের পাদদেশে কেদারনাথের প্রস্তর নির্মিত মন্দির। এখানে শিবের কোন মূর্তি নেই। আকারহীন কেদারনাথ-শিলাকে মহিষরূপী মহেশ্বর বলে কল্পনা করা হয়। কর্ণাটকের

লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের বীর শৈব বংশীয় জঙ্গম গোস্বামী কেদারনাথ মন্দিরের বালয়াল বা প্রধান পূজারী। মন্দিরের উত্তরে অমৃতকুণ্ড ও নীলকণ্ঠ মহাদেব।

সাধারণের বিশ্বাস, কেদারনাথে এসে পঞ্চকেদার না দেখলে এই মহাতীর্থে আসা সম্পূর্ণ হয় না। বৃষরূপী শিবের পৃষ্ঠদেশ কেদারনাথে, বাহু তুঙ্গনাথে (৩,৬২১ মিটার), মুখাবয়ব রুদ্রনাথে (৩,৫০১ মিটার), জটা কল্পেশ্বরে এবং নাভি মদমহেশ্বরে (৩,৪৪২ মিটার) দেহের বাকি অংশ আছে পশুপতিনাথে, যদিও পশুপতিনাথ পঞ্চকেদারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দূর থেকে কেদারনাথ মন্দিরের আত্মপ্রকাশটি বড় মনোরম। খাড়া পথ বেয়ে ওঠার সময় প্রথমে চোখে পড়বে মন্দিরের ধ্বজা, তারপর স্বর্ণ-কলস—তারপর চত্বর শ্রেণী এবং তারপর ক্রমশঃ গোটা মন্দিরটি দিকচক্রবাল থেকে দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠবে। যত নিকটে যাওয়া যায় মন্দিরটি ততই ভাস্বর হয়ে ওঠে।

মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিরাট চত্বরের বেষ্টনী। মাটি থেকেই মন্দিরের গাঁথুনী উঠেছে—তার সম্মুখভাগে বিস্তীর্ণ স্থান নিয়ে বিরাট নাটমন্দির। নাটমন্দিরে ছন্দ নেই—ভিতরে জমে থাকে তুষার। ধাপে ধাপে বড় বড় পাথরের সিঁড়ি নাটমন্দিরের উপর উঠে গেছে—সামনেই এক বৃহৎ বৃষভ মূর্তি যার ককুদটি ঘৃত, চন্দন ও সিঁদুরে অনুলিপ্ত। নাটমন্দিরের ভিতর দিয়ে ভক্ত যাত্রীদের প্রবেশের ব্যবস্থা—তার মধ্যে ঢুকলে মন্দিরের আসল প্রবেশ-দ্বারের সন্ধান মেলে। এই নাটমন্দির ও প্রবেশ-দ্বারের মধ্যে যে চত্বরের গাঁথুনী তাতে সারি সারি পাষাণের ক্রমবিস্তার। এই বিস্তারের সমান্তরালে মন্দিরের আসল ভিত্তিমূল যা শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। মন্দিরের এই পাষাণস্তূপ একের পর এক চতুষ্কোণে গিয়ে শেষ হয়েছে, ওপরে যেখানে পাথরেরই চাতাল একটি ষড়ভূজের আকারে মন্দিরের চূড়া আর তার আসল দেহকে এক বন্ধনীর মত আড়াল করেছে। এই বন্ধনীর ওপরেই স্বর্ণ কলসটি রয়েছে আর তার ওপরে শঙ্করাচার্যের স্থাপিত ধ্বজা। লক্ষ্য করার বিষয় যে, মন্দিরের উপরিভাগ নিরাভরণ, অলঙ্করণ নেই তেমন—নগ্নভাবেই মন্দিরের ঊর্ধ্বমুখী প্রসারতা। মনে হয় এর কারণ হল অহরহঃ ঝঞ্ঝাপাত ও তুষারপাত থেকে রক্ষা করার জন্যই মন্দিরের উপরিভাগ ঐরূপ নগ্ন রাখা হয়েছে—পাথরের অলঙ্করণ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করা হয়নি—এ প্রকার মন্দিরের সকল কিছু

স্থাপত্য গোড়ার দিকে। অথচ দক্ষিণ ভারতের দেব-দেউলগুলির শীর্ষভাগ নানাভাবে অলঙ্কারিত করা হয়।

কেদার-মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে এক বিরাট দীপাধার আছে—তাকে কেন্দ্র করেই প্রদীপের আলো অনেকটা স্থান নিয়ে প্রসারিত থাকে এবং ঐ দীপালোকে কেদারনাথ শিলা পরিদৃশ্যমান হন। মন্দিরের দ্বার একটিই—কোন গবাক্ষ নেই।

কেদার-দেউলের পাশেই পূর্ব ও পশ্চিমে অত্যুচ্চ শৈলশ্রেণীর সমারোহ। তারই মধ্য থেকে মন্দাকিনীধারা যেন স্বর্গ থেকে মর্ত্য ভূমিতে নেমে আসছে এক রজতশুভ্র সূত্রের মত। এখানে কেদার শৃঙ্গের অনন্ত পটভূমিকায় নিভৃত হিমতুষার প্রান্তরে এক জাঁক-জমক-হীন নিরাভরণ মন্দির মধ্যে স্তূপীকৃত অন্ধকারে ঢাকা প্রশান্ত নীরবতায় সমাহিত হয়ে পরম দেবতা শিবের মহিমাকে উপলব্ধি করা—এ এক আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতি। মন্দাকিনী সর্বদাই উচ্ছ্বাসময়ী—যেন, মহাদেবের জটাভার থেকেই এর জন্ম। এখানকার আকাশমণ্ডল সর্বদাই মেঘমালায় ঢাকা।

যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, অমরনাথ, মণিমহেশ, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থগুলি সর্বোত্তম বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে। তবে বাস্তবিক, সমগ্র ভারত-তীর্থই তো মহাতীর্থ—সমগ্র ভারতভূমিই তো দেবভূমি আর ভারতের এমন কোনও স্থান নেই যেখানে দেবাদিদেব শিব তাঁর প্রসন্ন কল্যাণ বিছিয়ে দেননি।

কেদারনাথ মন্দিরের পর আছে উখীমঠ। পুরাণে বর্ণিত বাণাসুর-কন্যা উষার নামানুসারে এ স্থানের নাম উখীমঠ হয়েছে বলে প্রবাদ। দাক্ষিণাত্যে শিবভক্ত বাণাসুরের বিবরণ পাওয়া যায়—তাঁর কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করে বিবাহ করেন—এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিববাদী ও কৃষ্ণবাদীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। সে বৃত্তান্ত যথাস্থানে বিবৃত করা হবে। উখীমঠের স্থানমাহাত্ম্য অশেষ—এখানকার মন্দিরটিও শঙ্করাচার্য নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানকার অনাবিল প্রাকৃতিক পরিবেশ অধ্যাত্মজ্ঞানের সহায়ক।

এই উখী থেকেই প্রবলতুষারপাতের সময় ছয়মাস ধরে কেদারনাথের পূজা দেওয়া হয়। কেদারের পাণ্ডারা ও বাওয়ালজী এখানে শীতের শুরুতেই চলে আসেন যখন কেদার অঞ্চল তুষারে আবৃত হয়ে থাকে।

দেবপ্রয়াগেই গঙ্গার নাম ভাগীরথী হয়েছে, এরপর আর ভাগীরথী

নাম নেই। অলকানন্দা ও মন্দাকিনী গঙ্গার অপর নাম। পাতাল গঙ্গা, দুধ গঙ্গা, গড়ুর গঙ্গা ও ঋষি গঙ্গা এসব মূল ভাগীরথীর পোশাকী নাম—স্থান বিশেষে তার নাম গেছে বদলে। এই গঙ্গার প্রবাহের ধারে ধারেই মানুষের যুগ-যুগান্তরের আধ্যাত্মিক সঞ্চয়। এই পুণ্য প্রবাহিণী যে কত ভাবে মানুষকে চরমতম তিতিক্ষার খোরাক যুগিয়েছে তার পরিমাপ নেই—এরই তীরে মানুষ গড়েছে দেব-দেউল, সঞ্চয় করেছে যা কিছু কল্যাণকর বা মহত্তম—পরমেশ্বরকে এখানেই মানুষ নিবিড়ভাবে পেতে চেয়েছে এবং পেয়েছেও। দেবপ্রয়াগের পর থেকেই এই সার্থকতার শুরু আর এর বিকাশ উঠে গেছে সোপান বেয়ে একদিকে কেদারনাথ ও অন্যদিকে বদরীনাথ পর্যন্ত। দুটো পথ দেবপ্রয়াগ থেকে দুদিকে গেছে—একটি ভাগীরথীর ধারে ধারে অন্যটি অলকানন্দার।

দেবপ্রয়াগ থেকে যাওয়া যায় কীর্তিনগর এবং কীর্তিনগর থেকে শ্রীনগর। শ্রীনগরে বিখ্যাত কমলেশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত। বহুকালের প্রাচীন এই মন্দির খুবই প্রসিদ্ধ ও অধ্যাত্ম গরিমামণ্ডিত। কিম্বদন্তী যে, শ্রীরামচন্দ্র সত্যযুগে এখানে শিব পূজা করেছিলেন। তাঁর পূজার ঘটনাটিও বড় বিচিত্র। শিবের পূজা দিতে বসেছেন শ্রীরামচন্দ্র, যাঁর নীলোৎপল আঁখি। একশটি নীলকমল নিয়ে তিনি শিব আরাধনায় বসেছেন—সম্মুখে জ্বলছে হোমাগ্নি শিখা—সাধনায় নিমগ্ন শ্রীরাম। পূজা শেষে তিনি দেব চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে গিয়ে দেখলেন একশটি প্রস্ফুটিত নীলকমলের মধ্যে একটি পদ্ম নেই। চারিদিকে অন্বেষণের পরও সে ফুলের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আর তা পাওয়া যাবেই বা কেমন করে? সে ফুল হরণ করে লুকিয়েছেন স্বয়ং মহামায়া—রঘুপতির ভক্তির পরীক্ষা করতে চান তিনি।

একটি ফুলের অভাবে তাঁর শিব্ পূজা সম্পন্ন হবে না—শ্রীরামচন্দ্র আকুল হয়ে পড়েন। আচ্ছা, সকলে তো তাঁর নয়ন দুটিকে একজোড়া নীলকমলের সঙ্গে তুলনা করে থাকে—তাই যদি হয় তা হলে একটি নয়ন-কুসুমের যোগে শত পুষ্পের অঞ্জলি দেবেন তিনি। অনন্যোপায় হয়ে রঘুকুলতিলক রাম ধনুর্বাণ তুলে নিলেন হাতে—নিজের একটি নয়ন তিনি উপড়ে নেবেন অক্ষিগোলক থেকে। ঐকান্তিকতার তথা সত্যানুরাগের এত বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে! মহামায়া শ্রীরামের এই চরম উৎসর্গে প্রসন্না হয়ে দেখা দিলেন ও সেই অপহৃত ফুলটি ফেরত দিলেন। একশটি পদ্মের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শিব পূজা সম্পন্ন করলেন

রঘুমণি। শিব তাঁকে দেখা দিয়ে কল্যাণ আশীর্বাদ করলেন।

কমলেশ্বর মন্দিরের অভ্যন্তরে দাঁড়ালে সেই পূজারী রামচন্দ্রের ধ্যানময় ছবিটি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে হয় দেবমূর্তির সম্মুখে তিনি বসে আছেন পূজাসনে—পাশে রাখা ধনুক বাণ—অদ্ভুত সুন্দর পদ্মপলাশ আঁখি দুটি সাধনার গভীরে নিমগ্ন। মূর্তির সামনে একশটি নীলকমল যেন এইমাত্র তুলে আনা হয়েছে।

. কমলেশ্বর মন্দিরে কুমারী পূজা বিখ্যাত। অগ্রহায়ণের শীতের সন্ধ্যায় নানা স্থান থেকে ঘৃতচর্চিত প্রদীপ জ্বেলে হাতে নিয়ে কুমারীরা এখানে আসে। সমগ্র রাত্রি কেটে যায় প্রদীপ শিখার নির্বাণ ও অনির্বাণের প্রশ্ন নিয়ে। যাদের দীপ নেভে—অনামী দুঃখ আর অভিমানে তারা হয় মুহ্যমান ও শোকাচ্ছন্ন। আবার কারো কারো প্রদীপ জ্বলতেও থাকে নিশাবসানে--তারা ভাগ্যবতী—শিবের করুণা পেয়ে করুণাময়ী। দূর-দূরান্ত থেকে মেয়েরা আসে, সেই সময় শ্রীনগরে কুমারী কন্যাদের চরণধ্বনিতে পাহাড়ে পাহাড়ে অভ্যর্থনার সুর বেজে ওঠে।

শ্রীনগর থেকে রুদ্র প্রয়াগ বেশি দূর নয়। মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গমে রুদ্র প্রয়াগ—ধ্যান গম্ভীর। রুদ্র প্রয়াগ কেদারনাথের প্রথম প্রবেশ দ্বার বলা চলে। মন্দাকিনীর জল ঘন নীল—অলকানন্দার জলের রং ধূসর। এই সঙ্গমের রূপ অপরূপ-বর্ণনাতীত। রুদ্র প্রয়াগে রুদ্রদেব অর্থাৎ শিবের মাহাত্ম্য স্পষ্টভাবে ধরা আছে। এখানে এলে মনে হবে, শিবলোকের কাছাকাছি এসে গেছে মানুষ। সঙ্গমের কাছে সমতল ভূমি কোথাও বিস্তৃত—কোথাও পাহাড়কে কেন্দ্র করে দূর-দিগন্তে আদৃশ্য। নির্জন স্থানটিতে এসে দাঁড়ালে দেখা যায় সাধু-সন্ন্যাসীদের নিভৃত আস্তানা গড়ে উঠেছে একের পর এক—সাধনা চলছে তাঁদের। সঙ্গমের কাছটিতে এলে ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত দুটি ধারার ফেনিল উচ্ছ্বাস দেখা যায়, জীবনের উচ্ছ্বাসও এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে নবজন্ম নেয়। এ উচ্ছ্বাস বা প্রাণাবেগ আর কিছু নয়, বুদ্ধির পরপারে সেই অপরিসীম সর্বমঙ্গল বিধায়ক পরম পুরুষকে প্রাণে পাওয়ার উচ্ছ্বাস ও আকুলতা।

এখানেই দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতকে চরমভাবে গ্রহণ করার সাধনায় দেবাদিদেব রুদ্রদেবের আরাধনা করেছিলেন শতবর্ষ ধরে। শিব এসেছিলেন প্রসন্ন হয়ে আর নারদকে এখানেই সঙ্গীতের গূঢ়তম তথ্যটি, তার সূত্রটি দান করেছিলেন।

রুদ্রনাথের মন্দির ওপর থেকে ধাপের পর ধাপ ধরে নেমে এসেছে সঙ্গমে—মধ্যে মন্দিরের ক্রম বিস্তৃতি। রুদ্র প্রয়াগ থেকে কেদারনাথ মাত্র ৭৬ কি. মি. দূরে অবস্থিত। মন্দাকিনীর পাশ দিয়ে পূর্ব দিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সরু পথ চলে গেছে। যাত্রী বা পুণ্যার্থী সেই একমাত্র পথ ধরে চলে একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে মনে—সে লক্ষ্য কেদারনাথ দর্শন। অনাদিকাল ধরে এই রহস্যময় পাষাণ লিঙ্গের টানে মানুষের এই পথ চলা। নারী-পুরুষের ভেদ নেই, মানুষ চলেছে সত্যানুসন্ধানের টানে—পুণ্য লাভের আশায়।

রুদ্র প্রয়াগের পর কেদারনাথের পথে পড়ে ছাতৌলি, রামপুর ও অগস্ত্য মুনির চটি। অগস্ত্য মুনি সম্পর্কে নানা কল্প-কথা ছড়িয়ে আছে আমাদের পুরাণে—ইতিহাসে। শিববাদী এই প্রতিভাবান মুনি ছিলেন সত্যসাধক, ধর্মপ্রচারক ও লোকগুরু। অগস্ত্য মুনি এই অঞ্চলে অনেক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন বলে জনপ্রবাদ। নির্দিষ্ট দিনে এখানে অগস্ত্য মুনির পূজা হয়। এখানে প্রচুর রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ জন্মায়। রুদ্রাক্ষ হল রুদ্রের অক্ষি—রুদ্র অক্ষ।

কেদারনাথের পথে পড়ে সৌরীচটি। সৌরী পেরোলেই হঠাৎ যে নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে সে অতুলনীয়—হঠাৎ গোটা কেদার শৃঙ্গটি আত্মপ্রকাশ করে। স্বয়ম্ভু শিব স্ব-প্রকাশ হয়ে উঠে ভক্তকে যেন কাছে ডাকেন। দূর-দিগন্তের সীমারেখায় কেদারের ধূম্র পাহাড় শ্রেণীকে যারা প্রথম দেখে তারা ডুবে যায় তৃপ্তির মহাসমুদ্রে। নগাধিরাজ হিমালয়ের বিরাট ছবি চোখে ভাসে যা অতুলনীয়। যেন এক নবতম-বোধের দিগন্তে ঊষার আলোর আলিম্পন। এ যেন অনন্তের পটভূমি-কায় জটাজুট সমাসন্ন মহাতাপস মহেশ্বরের ধ্যান-সাধনা।

কিছুদূর গেলেই চন্দ্রপুরী। চন্দ্রপুরীর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষুদ্রকায়া তন্দ্রা। এখানে দুটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে। একটি চন্দ্রশেখর মহাদেবের অন্যটি দেবী দুর্গার। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের ওপর এই দুটি মন্দিরের মহিমা অশেষ।

চন্দ্রশেখর মন্দিরের আরতি-পূজা অপূর্ব বৈশিষ্ট্যময়। রক্তজবা ও শ্বেত বিল্ব দিয়ে ঘণ্টাধ্বনি সহযোগে আরতি আরম্ভ হয়, নানাবিধ উপচার অর্ঘ্য দেওয়ার পর দীপাধার ও তার উজ্জ্বল আলোকে শিবলিঙ্গ দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় ধ্যানগম্ভীর কেদার শৃঙ্গের পটভূমিকায় এ আরত্রিকের অন্তর্নিহিত সত্যরূপটি চরম ও

সর্বাতীত। এই চন্দ্রশেখর মন্দিরে মানুষের শিবের কাছে গুপ্ত ইচ্ছা জানানোর প্রথা আছে—দেবাদিদেব শিব সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন বলে মানুষের বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় সবকিছু। একটি গোটা নারিকেল ছিদ্র করে সমস্ত জীবন ধরে যে সব গুপ্ত ইচ্ছাগুলোকে মনের মধ্যে পোষণ করা হয় সেগুলি তার ভিতর ঢুকিয়ে ভগবানের কাছে নিবেদন করতে হয়। ভগবান মহেশ মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ করেন বলে জন-বিশ্বাস। এখানে শিবমন্দির ছাড়া অন্য একটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে—অর্ধনারীশ্বর মন্দির—হর ও পার্বতী এক মূর্তিতে প্রকাশমান। এখানেও মনিকর্ণিকা আছে তবে ঘাট নয় কুণ্ড। এই কুণ্ড থেকে দুটি শীর্ণধারা মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রবহমান। চন্দ্রশেখর মন্দির-থেকেও এই অর্ধনারীশ্বর মন্দির প্রাচীন বলে অনেকের অনুমান। পুরাণে এর বিশেষ ইতিহাস আছে। এই হল গুপ্তকাশী—এর অশেষ মাহাত্ম্য।

এরপর কেদারের পথে পড়ে মহীখণ্ড। এখানে আছে মহিষ-মর্দিনীর মন্দির—কতকালের যে প্রাচীন তার ইতিহাস নেই। প্রবাদ, এখানেই ঘোররূপা মহামায়া চণ্ডরূপী মহিষকে শূলাঘাতে বধ করে-ছিলেন—সে ঘটনা শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই মন্দিরের ভয়ঙ্করী দেবী মূর্তিকে দেখলে অজানিত শঙ্কায় মন ভীত হয়—শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। স্থান মাহাত্ম্য এ কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, সম্ভবামি যুগে যুগে। পুরাকালে মহীখণ্ড দেবভূমি ছিল আর এখানেই মহিষাসুরের অত্যাচারে ধরায় অশান্তির আগুন জ্বলার পর ঘোররূপা প্রলয়ঙ্করী মহামায়া দুর্গতি নাশিনী দুর্গারূপে আবির্ভূতা হয়ে অসহায় দেবতাদের দুশ্চিন্তা ও ভয় দূর করেছিলেন অসুর নিধন করে। কত যুগ-যুগান্তর ধরে এ কাহিনী চলে আসছে। কিন্তু মহীখণ্ডের স্থান মহিমা এমনই যে, এখানে এলে এক অব্যক্ত অনুভূতিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আজও। কেদার ভূমি বললেই যে শিবভূমি বা শিবক্ষেত্র বুঝতে হবে তা নয়—এ স্বর্গরাজ্যে কালীকরালীও আছেন, দশপ্রহরণধারিনী দুর্গাও আছেন—আর এঁরা ভার্যারূপে কল্পিতা শিবের শক্তি অর্থাৎ পরমা প্রকৃতি। এ ছাড়া আছে নারায়ণ বিগ্রহ। সাধকরা ঈশ্বরকে যে যে ভাবে দেখে গেছেন, যে যে মূর্তিতে আরাধনা করে ভগবানকে পেয়েছেন সেই সেই ভাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। মহীখণ্ড বা মৈখণ্ডার মহিষাসুরমর্দিনীও সেই প্রতিষ্ঠার এক স্বর্ণময় অধ্যায়।

মৈখণ্ডা থেকে পার্বত্য গ্রাম রায়পুর হয়ে ত্রিযুগীনারায়ণ যাওয়া যায়। কেদারনাথের রাস্তা অবশ্য অন্য দিকে গেছে। খাড়াই পথ—ঘোরানো সিঁড়ির মত পাহাড়ী পথ—পাকদণ্ডী। চতুর্দিকে পার্বত্য প্রাচীর—তার মধ্যে ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির।

হয়ত সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এই ত্রিযুগ থেকেই এ স্থানের পরিচয়। প্রবাদ হিমালয়-তনয়া হৈমবতী দুর্গার সঙ্গে ত্রিনেত্র মহাদেবের পরিণয় হয়েছিল এখানেই। স্বয়ং নারায়ণ ছিলেন সে বিবাহের অগ্নিহোত্রী যিনি সর্বমন্ত্রের সর্বময় পুরোধা। যে পুণ্য হোমাগ্নির সম্মুখে মহামিলনের শুভদৃষ্টি ঘটেছিল ত্রিযুগীর মন্দিরে এখনও সেই হোমশিখা নিরন্তর ঊর্ধমুখে জ্বলছে—মানুষের তাই বিশ্বাস। এখনও তার জ্যোতি এতটুকু ম্লান হয়নি। অতীতে যে সাধকরা এই পূতঃ হোমাগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করে গেছেন, বর্তমান কালের পুরোহিত এখনও তাকে অম্লান রেখে চলেছেন। কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে মন্দিরের দরজা যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন এই অগ্নিকুণ্ডে মন্দির পুরোহিতরা প্রচুর কাঠ ও পরিমাণ মত ঘৃত নিক্ষেপ করে দ্বার বন্ধ করে নীচে চলে আসেন—শুধু খোলা বাতাস চলাচলের জন্য একটিমাত্র প্রবেশ পথ। পুনরায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন মন্দির দ্বার খোলা হয় তখন দেখা যায় অনির্বাণ জ্বলছে সেই অনাদি হোমশিখা। এমনিভাবে বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী গড়িয়ে গেছে যুগের অনন্ততায়, কিন্তু শিব-পার্বতীর বিবাহের সাক্ষী অগ্নিহোত্রী বিষ্ণুর প্রজ্বলিত হোমাগ্নি আজও অম্লান—এখনও অশেষ। মন্দিরের অভ্যন্তর তমসাবৃত। চারিদিকে প্রশস্ত পাথরের গাঁথুনী—শুধু প্রবেশ পথটি ছাড়া আর কোন দরজা নেই। ধক্ ধক্ জ্বলছে হোমাগ্নি শিখা—ছড়িয়ে আছে চারিদিকে ঘনীভূত আঁধার আর ধূপের, ঘিয়ের আর ফুলের গন্ধ। বুঝি এই পবিত্র হোম-শিখা মানুষের কল্যাণের আলো। ঐ আগুন বুঝি প্রত্যেক প্রাণীর বোধের আগুন।

এরপর গৌরকুণ্ড—পথে পড়বে দুধ গঙ্গা। মন্দাকিনীর ধারার সঙ্গে এর সঙ্গম। ত্রিযুগী থেকে সোমধারা—সোমধারা থেকে গৌরীকুণ্ড। এখানে আকাশ সদা তমিস্রায় ভরা—তুষার রাজ্য—সূর্য জ্যোতিহীন। গৌরীকুণ্ডের পথে মুণ্ডহীন বৈনায়কের মন্দির। গভীর নিশ্ছিদ্র অরণ্যে এটি অবস্থিত—জীর্ণ ও ভগ্ন—কেবল ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গৌরীকুণ্ডে গৌরীদেবীর মন্দির। এখানে কুণ্ড আছে দুটি—তার মধ্যে একটির জল উষ্ণ—সর্বদা বাষ্পসহ মৃত্তিকা বক্ষ বিদীর্ণ করে হলুদ রং-এর জল ধক্ ধক্ করে নির্গত হচ্ছে। (উষ্ণ গন্ধক মিশ্রিত জল) প্রবাদ এখানে উমার গায়েহলুদ হয়েছিল, সে কারণে কুণ্ডের জল হলুদ বর্ণ। উমা এখানে শিব লাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। তুষার গলিত মন্দাকিনীর হিমশীতল প্রবাহে চরণযুগল নিমজ্জিত করে মেনকার আদরের কন্যা উমার যুগান্তরব্যাপী তপশ্চর্যা পরমপুরুষ শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য। পার্বতী শেষ পর্যন্ত সাধনায় সিদ্ধা হয়েছিলেন —তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল। শিব দেখা দিয়ে বলেছিলেন "আমি তোমার তপস্যায় খুশী—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার সঙ্গে আমার মনোস্কামনাও সিদ্ধ হল।"

শিবের পঞ্চমুখের কল্পনার একটি সম্ভাব্য কারণ হয়ত পঞ্চকেদারের অস্তিত্ব যা পৃথকভাবে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রচণ্ড শীত পড়লে উখীমঠের মন্দিরে কেদারনাথের পূজারতি স্থানান্তরিত হয়। যে ঘরে কেদারনাথের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয় সেখানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন যাঁর পঞ্চমুখ। শিবের পঞ্চ-মুখের কল্পনার হয়ত প্রথম নিদর্শন। জগৎগুরু আদি শঙ্করাচার্য একই সময়ের মধ্যে একদিকে কেদার, তারপর উখীমঠ তারপর জ্যোতির্মঠ আর একদিকে বদরী বিশালের মন্দির স্থাপনা করেছিলেন—তাঁর প্রধানতম কীর্তি।

পঞ্চকেদার থেকেই পঞ্চানন শিবের কল্পনা করা হয়ে থাকতে পারে। শিবের পঞ্চমুখ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, এখন পঞ্চ-কেদারের বর্ণনায় দেখা যাক তার সম্ভাব্যতা।

সমগ্র কেদারনাথকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে আর এর অদ্ভুত বর্ণনা তথা ইতিহাস ধরা আছে পদ্মপুরাণে। আসল কেদার-নাথ হলেন প্রথম কেদার যাঁর বিস্তারিত কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় কেদার হলেন মধ্য মহেশ্বর, তৃতীয় কেদার বলা হয় তুঙ্গ-নাথকে, চতুর্থ কেদার হলেন রুদ্রনাথ এবং পঞ্চম কেদার হলেন কল্পেশ্বর।

মহাভারতের ঘটনা। একবার কি এক কারণে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ক্রোধে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শিবরূপী মহিষকে কাঁধের ওপর তুলে চারিদিকে বনবন করে ঘোরাতে লাগলেন। আর সে ঘূর্ণন-সংঘটন তো

আর যে সে লোকের কীর্তি নয় স্বয়ং বৃকোদর ভীমসেনের ; কাজেই মহিষ আর অক্ষত থাকে কি করে ? খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে দেহটি তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর তার কিছু কিছু অংশ পতিত হল পঞ্চ-কেদারের পাঁচ জায়গায়। সৃষ্টি হল পঞ্চকেদারের—কেদারেশ্বর, মধ্য মহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর।

তৃতীয় কেদার তুঙ্গনাথের মন্দির কেদারের থেকে প্রায় এক হাজার ফুট উঁচু, তবু এখানে কার্তিকের আগে তুষারপাত নেই—কার্তিক মাসের শেষাশেষি সমগ্র অঞ্চলটি তুষারে ঢাকা পড়ে যায়। তুঙ্গনাথে আচার্য শঙ্কর এসেছিলেন সম্ভবত বৌদ্ধযুগের শেষে যোগীবর গোবিন্দ দাসের কাছ থেকে সাধনায় সিদ্ধ হয়ে আর তিনিই এই বিখ্যাত মন্দিরটি স্থাপন করেন। তুঙ্গনাথের স্থান মাহাত্ম্যের তুলনা নেই। এখানে সর্বদা চতুর্দিক জুড়ে অখণ্ড নৈঃশব্দ বিচরণ করে—মানুষের প্রাণে সে নৈঃশব্দ অনাদি সত্যের প্রথম বাণীটি পৌঁছে দেয়। তুঙ্গনাথের মন্দিরের গঠনের সঙ্গে ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দিরের সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রভেদের মধ্যে কেবল তুঙ্গনাথের মন্দিরের প্রবেশ দ্বারটি ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দিরের চেয়ে অনেক ছোট।

আর একটি মন্দির আছে গোপেশ্বর মন্দির। গোপেশ্বর মন্দির অতি প্রাচীন, অনেকের মতে কেদার বদরীর মন্দিরের চেয়েও এ মন্দিরের প্রাচীনতা বেশী। মন্দিরের গোটা কাঠামোতে একটা যুগের চিহ্ন আঁকা আছে। মন্দিরের সম্মুখেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ত্রিশূলটি প্রোথিত। মন্দিরের যতটা উচ্চতা, ত্রিশূলটির উচ্চতা তার চেয়েও বেশি। ত্রিশূলটি অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত। প্রবাদ যে, এই অতিকায় ত্রিশূলটি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের হস্তধৃত আয়ুধ, যেটি পরবর্তীকালে জমদগ্নি পুত্র পরশুরামের হস্তগত হয়েছিল। ত্রিশূলের মূল দণ্ডটি ক্ষুদ্র কিন্তু তিনটি ফলা যেন আকাশ স্পর্শ করছে। এই ত্রিশূল গোপেশ্বরের এক বিরাট সম্পদ তথা স্থান মাহাত্ম্যের মূল কাঠামো। এটি যে সাধারণ কোন মানুষের ব্যবহারের জন্য ছিল না, ছিল অসাধারণ কোন মানুষ বা অতিমানুষ কারো তা অনায়াসেই বোঝা যায়। গোপেশ্বর মন্দিরটি দীর্ণ।

অলকানন্দার তীরে পাণ্ডুকেশ্বর তীর্থটিও তীর্থমহিমামণ্ডিত। এখানে ভূর্জগাছের অসংখ্য বন, অসংখ্য ডাল-পালা আর তাতে লক্ষ লক্ষ পাতার বাহার। প্রবাদ যে, পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হয়েছিল এখানে এবং এখানেই মহাভারত বর্ণিত মাদ্রী সহমৃতা হয়েছিলেন। মৈথুনাসক্ত

কিন্নর মিথুনের প্রতি শরক্ষেপ করায় পাণ্ডু রাজা এখানেই শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন যার ফলে তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্যোগের ছায়া। বর্তমানে যে শিবদেউলটি দৃষ্টিগোচর হয় তার নাম যোগ্‌বদরী এবং প্রবাদ এই মন্দির ও লিঙ্গ মূর্তি রাজা পাণ্ডুই স্থাপন করেছিলেন। মন্দিরটি অতি সুন্দর, দেখলে চোখ জুড়োয়—মন চলে যায় মহাভারতের পাতায় পাতায়। শিববিগ্রহ ছাড়াও মন্দিরে বিষ্ণু ও বাসুদেবের আটটি ভঙ্গীর মূর্তি আছে। পূর্বে এখানে প্রাচীন তাম্রলিপির সম্পদ ছিল মন্দিরে সেগুলি বদরিকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অমৃত বদরী বিশাল
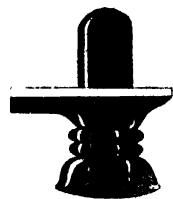
মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁর সাধ্বী পত্নী অরুন্ধতীকে এই মহাতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে শুনিয়েছিলেন। অরুন্ধতী বদরী মাহাত্ম্য জানতে ব্যগ্র হলে বশিষ্ঠ তাঁকে বদরীনাথ শিবের কথা বলেছিলেন। সাধারণ মানুষ এই অমৃত কথা শুনে পুণ্য সঞ্চয় করে—এই অমৃততীর্থ দর্শনের প্রেরণা পায়।

একদা শিবারাধনার জন্য এখানে এসে পূজার পর অবসর বিনোদন-কালে বশিষ্ঠ জায়া পতিকে বললেন, "প্রভু। শুনেছি মহাদেব স্বয়ং দেবী দুর্গাকে একান্তে এই বদরীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন। সেই কথা আমি জানতে অভিলাষী। দেব, আমায় বলুন বদরীক্ষেত্র কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আশ্রমমণ্ডলে কোথায় দেবাদিদেব মহাদেবের অধিষ্ঠান ও তাঁকে লাভ করার জন্য কোন্ কোন্ মহাপুরুষ এখানে তপস্যা করেছিলেন, আমায় সবিস্তারে অনুগ্রহ করে বলুন।"

প্রিয়তমা পত্নীর অনুরোধে দ্রুহিন পুত্র মহামুনি বশিষ্ঠ নয়ন নিমি-লিত করে মহেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হলেন ক্ষণকাল, তারপর চক্ষু উন্মীলিত করে ভাবকণ্ঠে পত্নীকে বললেন, "প্রিয়ে, বদরী স্থানের মাহাত্ম্য শোনা অতি পুণ্যকর্ম। ভগবান শিবের কাছ থেকে দেবী দুর্গা এই কথা শোনেন। শিব শিবানীকে এ বিষয়ে যেমন যেমন বলেছিলেন আমি ঠিক তেমনই তোমায় জানাচ্ছি শোন।"—এই কথা বলে বশিষ্ঠ আরম্ভ করলেন—

"বদরীক্ষেত্র কণ্বমুনির আশ্রম থেকে আরম্ভ করে নন্দগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত। পুণ্যময় ও ভক্তি-মুক্তিদাতা ক্ষেত্র এই বদরীতীর্থ। ঋষি কণ্ব ছিলেন প্রাচীনকালের এক উন্নত চরিত্রের মহাতেজস্বী মানুষ—শিব-সাধক মহাপুরুষ। তিনি শিবসাধনার দ্বারা ব্রহ্মলাভ করে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

বদরীক্ষেত্র শিবক্ষেত্র ও বিষ্ণুক্ষেত্র—কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, গয়া, প্রয়াগ, অযোধ্যা, অবন্তী, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি ক্ষেত্র এবং অন্যান্য কোন তীর্থই বদরীক্ষেত্রের মত মুক্তিক্ষেত্র নয়। বদরী বৃক্ষরাজিমণ্ডিত

এই সুখময় স্থানের পাশ দিয়ে সরিৎশ্রেষ্ঠা সাক্ষাৎ পাপবিমোচনী গঙ্গা বয়ে চলেছেন।"

এই কথা বলে বশিষ্ঠ পত্নীকে বললেন, "কল্যাণি! নন্দ প্রয়াগের বৃত্তান্ত শোন। পুরাকালে নন্দ নামে এক ধর্মাত্মা ও সত্যবাদী মহারাজা ছিলেন। তাঁর নামানুসারে এই স্থানের নাম হয়েছে নন্দ প্রয়াগ। মহারাজ নন্দ এখানে প্রভূত দক্ষিণা ও বহু অন্ন দান করে যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সেই মহাত্মা মহীপতির ভক্তিতে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণের জন্য মূর্তিমান হয়ে যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছিলেন। দেবতারা সন্তোষ লাভ করেছিলেন এবং মহারাজা নন্দের নামানুসারে এই স্থানের নাম রেখেছিলেন নন্দ প্রয়াগ। নন্দ প্রয়াগ অতি পবিত্র স্থান—দুই পুণ্যতোয়া নদী শ্রীনন্দা ও অলকানন্দার সঙ্গমে অবস্থিত। এই স্থান, প্রিয়ে, আমার অতি প্রিয় স্থান। কারণ এখানে মহাদেবসহ বিষ্ণু অধিষ্ঠান করেন। নন্দ প্রয়াগের অদূরে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে—ঐ শিবলিঙ্গ আমি স্থাপনা করে শিব পূজা করেছিলাম, সে কারণে লোকে ঐ লিঙ্গ বিগ্রহকে 'বশিষ্ঠেশ' বলে।" এই কথা বলে মহামুনি নিরুত্তর হলেন, চক্ষু নিমীলিত করে শিব ধ্যান করলেন—তাঁর কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হয়—"ওঁ শিবায় নমঃ"। তারপর বললেন, "কল্যাণি, নিশ্চয় জেনো। এই মহাপবিত্র স্থানে যে ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করে শিব তাঁকে গ্রহণ করেন। এখানে এলেই মানুষ সর্বকামনারহিত হয়। একমাত্র শিব-কামনা ছাড়া, আর তাতেই সে সর্ব বন্ধন মুক্ত হয়ে শিব-বন্ধনে বাঁধা পড়ে।"

মহামুনি বশিষ্ঠের কথা শুনে অরুন্ধতী পুলকিত কণ্ঠে বললেন, "স্বামিন, আপনার মধুর পুণ্য কথা শ্রবণে আমার অন্তর সুখে শিহরিত হচ্ছে—এই সকল বৃত্তান্ত যে শোনে তার মহাভাগ্য, আমায় আরও বলুন।" বশিষ্ঠ মুনি স্মিতহাস্যে বললেন, "শোন, ঐ যে উত্তর দিকে দেখা যায় পরম পাবনী নদী বয়ে চলেছে ওর নাম ব্রীহিকা—সর্বপাপহরা মাতৃস্বরূপা নদী। তারপর রয়েছে পাপ প্রমোচনী বিরহবতী যার বর্তমান নাম বিরহী গঙ্গা। এই নদীর নাম বিরহীবতী বা বিরহী নাম হয়েছিল কেন সে কথা জান অরুন্ধতী? বলছি শোন",—এই কথা বলে বশিষ্ঠ পুনরায় বলতে লাগলেন,—

"সতী বিরহে মহাদেব আকুল পাগলপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন! বিরহ-জর্জরিত ত্রিলোচন এখানে এসে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। তাঁকে

ধ্যানলীন হতে দেখে দেবী চণ্ডিকা তাঁর কাছে এলেন। মহাদেবকে দেবী বললেন, "হে মহেশ্বর, তুমি শোক সম্বরণ কর। আমি হিমালয়ে গিরি-গৃহে জন্ম নেব এবং লোকে আমায় হৈমবতী গৌরী বলে অভিহিত করবে, আমি সতীরূপে তোমার ভার্যা ছিলাম, পুনরায় পার্বতী বা দুর্গারূপে তোমার ভার্যা হব। সদাশিব দেবী চণ্ডিকার এই উক্তি শ্রবণ করে শোক সম্বরণ করেছিলেন। তখন থেকে এই নদীর নাম বিরহীবতী। তারপর মহাদেব সর্বকামফলপ্রদ বিরহেশ্বর নামে এক অংশ এখানে রেখে কৈলাস গিয়েছিলেন।

"হে কল্যাণি! এখানে স্নান, দান ও মরণ এ তিনেই বিশেষ ফল হয়ে থাকে তা হল মুক্তি লাভ। এখান থেকে পূর্বদিকে মণিভদ্র নামে এক বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ সরোবর আছে। সেখানে তিনরাত্রি বাস করলে মানব মণিভদ্র লাভ করে। এই মণিভদ্র লাভ হলে কি না লাভ হল! মণিভদ্র সরোবরের দক্ষিণে মহাভদ্রা নদী সেখানে সাত সাত পত্রযুক্ত বটবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষের পত্রে দৃষ্টি সন্নিবেশ করলে দৃষ্টি স্তম্ভন হয়ে থাকে। এখানে চতুর্বর্গ ফলপ্রদ সূর্যতীর্থ নামে তীর্থ আছে। সূর্যতীর্থের পূর্বদিকে এক মহাতীর্থে দেবী গাণেশ্বরী অধিষ্ঠিতা আছেন।

দণ্ডাশ্রম নামে এক স্থান সেখানে অবস্থিত। পূর্বকালে সেখানে বাস করতেন দণ্ড নামে এক নরপতি। তিনি সূর্যকুণ্ডে পরম তপস্যা করে শিবকৃপা লাভ করেছিলেন। এঁরই নামানুসারে বিখ্যাত দণ্ডকারণ্য নাম হয়েছে। সেই মহাবাহু দণ্ডরাজা এখানে শতবর্ষ ধরে পরম শিব-নাম জপ করে শিবলোকে গমন করেন। যে ব্যক্তি দণ্ডাশ্রমে স্নান, দান ও শিব-নাম জপ করে তার সর্ববন্ধন মুক্তি হয়, এ শিবোক্তি। এই কথা কটি বলে মহামুণি বশিষ্ঠ শিবোদ্দেশে প্রণতি জানালেন—দেবী অরুন্ধতীও শিব প্রণাম করলেন। বশিষ্ঠ পুনরায় বললেন। "অলকানন্দা নদীর উত্তরে বৃক্ষ ও লতা-গুল্মে পরিবৃত এক স্থানে বিল্বেশ্বর নামে লিঙ্গ মূর্তি বিরাজমান। এখানে বিল্ববৃক্ষে কাঁটা হয় না ও বিল্বফল বদরীফলের মত ক্ষুদ্রাকার হয়ে থাকে। এরপর পুণ্যতোয়া গরুড় গঙ্গা তারপর চর্মবতী নদী—তারপর ঐ দেখ, কল্যাণি, অনঙ্গীরাজার আশ্রম। এই আশ্রম থেকে মেবাদ্রি পর্বতে এক অত্যুত্তম শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন—এখানে এক অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে থাকে। ঘটনাটি বলছি শোন। এখানে প্রতি মধ্যাহ্নে এক দীর্ঘকায় মহামানব এসে থাকেন—ঐ মানব রূপ ধরেন চণ্ডীদেবী। তিনি পরমেশ্বর শিবলিঙ্গ

দর্শন করে এবং পূজা করে পুনরায় ফিরে যান। সিদ্ধপুরুষ ছাড়া এ দৃশ্য কেউ দেখতে পায় না।

মেষাদি পর্বতের পূর্বোত্তরে গৌরী আশ্রম। গৌরী উমা পর্ণমাত্র আহার করে বহু সহস্র বর্ষ এখানে তপস্যা করেছিলেন, তাই এর নাম গৌরী আশ্রম। তখন থেকেই এই স্থানের প্রসিদ্ধি। পর্ণখণ্ডাশনা নামে দেবী এখানে বিরাজিতা। এখানে গঙ্গাতীরে এক স্বয়ম্ভুব মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং শিবলোক প্রদায়ক শিবকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে।"

"শুধু শিবের ব্যাপার নয়" বশিষ্ঠদেব বলছেন, "এখানে বিষ্ণুকুণ্ড আছে, নৃসিংহদেবের মূর্তি ও মন্দির আছে। কিছুদূরেই রয়েছে প্রসিদ্ধ জ্যোশীমঠ। জ্যোশীমঠে যোগেন্দ্র প্রহ্লাদ হরিভক্তপরায়ণভাবে বর্তমান আছেন। এরূপ বিষ্ণু প্রীতিকর পরমতীর্থ আর নেই। জ্যোশীমঠে নৃসিংহ মূর্তি পূজন এক মহাপুণ্যের ফল।

বিষ্ণু প্রয়াগে স্নান করে জীব বিষ্ণুলোকে যায়। এখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। বিষ্ণুপ্রয়াগে সর্বকামপ্রদা নানা তীর্থ আছে। তার মধ্যে প্রধান দশটি"—এই কথা বলে বশিষ্ঠদেব পত্নী অরুন্ধতীকে বললেন, "প্রিয়ে, স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর এ সম্পর্কে দেবী দুর্গাকে যা বলেছিলেন তা তোমাকে বলছি। প্রথমে ব্রহ্মকুণ্ড, তারপর বিষ্ণুকুণ্ড—তৃতীয় কুণ্ডটির নাম শিবকুণ্ড, চতুর্থ গণেশ কুণ্ড, পঞ্চম ভৃঙ্গিকুণ্ড, ষষ্ঠ ঋষিকুণ্ড, সপ্তম সূর্যকুণ্ড, অষ্টম দুর্গাকুণ্ড, নবম ধনদাকুণ্ড, এবং দশমতীর্থ হল প্রহ্লাদকুণ্ড। এই পবিত্র কুণ্ডগুলির বর্ণনা করে শিব দুর্গাকে বলেছিলেন—

"গন্ধমাদন বদরীঞ্চ পাপিনো যদি কুর্ব্বতি।
গমনাদেব পাপানি নশ্যন্তীতি শিবেরিতম্॥

পাপীজনও যদি গন্ধমাদন ও বদরিকাশ্রম যাত্রা করে তাদের তথায় যাওয়া মাত্র সর্ব কলুষ মোচন হয়।

অমরনাথের অমরকথা

অমরনাথকে বলা হয় তুষারতীর্থ—অমরনাথ বা অমরেশ্বর শিবের নাম অনুসারেই এই মহাতীর্থের নামকরণ। হিমালয়ের পাদদেশেই এই তীর্থের অবস্থান। হিমালয় কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরত্ন আকর নয়, পক্ষান্তরে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্তির পুণ্যক্ষেত্র। শিব যেমন ধ্যানমগ্ন হয়ে আপন মহিমা আপনি উপভোগ করেন, তেমন হিমালয় যেন ধ্যানস্তিমিত নয়নে আপন সৌন্দর্যে ও মহিমায় আপনিই মগ্ন। কত মুনি-ঋষি সত্যানুসন্ধানী তাপস যুগ-যুগ ধরে হিমালয়ের বুকে, কোথাও সুরধুনী তীরে কোথাও বা নিভৃত গুহায় অবস্থান করে অনন্তের ধ্যানে বিভোর হয়েছেন। পবিত্র গাম্ভীর্যে ও অনাবিল আনন্দে পূর্ণ এখানকার আকাশ-বাতাস।

আচার্য শঙ্কর যেমন ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন যাদের প্রসিদ্ধ চারি ধামের নাম নিয়ে, তেমনি ভারতের উত্তরাখণ্ডে আছে অন্য চারধাম। ঐকান্তিক আগ্রহ ও ভক্তি নিয়ে ভারতের সর্বস্থান থেকে মানুষ ঐ চারধাম দর্শন করতে প্রতিনিয়ত গমনাগমন করছেন। ঐ চারধামের নাম হল—বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী। এছাড়া আরও কয়েকটি প্রধান তীর্থ আছে এই হিমালয় দেশে, যেখানে দলে দলে মানুষ আসে দেব-দর্শন মানসে, পুণ্য অর্জনে। এই তীর্থভূমিগুলির নাম কৈলাস, পশুপতিনাথ ও অমরনাথ। উত্তর প্রদেশের আলমোড়া শহর থেকে কৈলাসের পথ শুরু হয়েছে ; পশুপতিনাথ নেপাল রাজ্যের রাজধানী কাটমুণ্ড শহরে এবং তুষারতীর্থ অমরনাথ কাশ্মীরে। এছাড়া আছে আরও অনেক তীর্থ এই হিমালয়ে।

প্রবাদ যে, কাশ্মীরের পূর্ব নাম ছিল 'সতীসর'। এখানে নাকি অনেক সরোবর ছিল এবং সতী ঐ সকল সরোবরে জলক্রীড়া করতে আসতেন। কিছুকাল পরে কশ্যপমুনি এখানে শিবের জন্য কঠোর আরাধনা করেন। তাঁর তপে তুষ্ট হয়ে আশুতোষ তাঁকে দেখা দেন এবং বর দিতে চান। মুনি কশ্যপ প্রার্থনা করেন যে, কাশ্মীরধামে বিশ্বনাথ

দর্শনে যেমন পুণ্যফল অর্জন হয়, 'সতীসরে' এসে শিবদর্শন করলেও যেন ভক্তদের অনুরূপ কল্যাণ হয় এবং তাঁর নামের সাথে ঐ স্থানের যেন স্থায়ী সহযোগ হয়। মহাদেব 'তথাস্তু' বলে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন এবং সেইদিন থেকে কশ্যপমুনির নামানুসারে 'সতীসরে'র নাম হয় কাশ্মীর। অবশ্য এ বিষয়ে অন্যান্য কল্প-কথা বা কিম্বদন্তীও চালু আছে অনেক। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে পহলগাঁও হয়ে অমরনাথ যেতে হয়।

শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমার দিন রাখীবন্ধন হয়। ঐ দিনই অমরনাথ দর্শনের প্রশস্ত দিন। কারণ, ঐ দিনই নাকি দেবাদিদেব মহাদেব ওখানে তাঁর স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত করেন। অবশ্য আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতেও (গুরু পূর্ণিমা) কয়েকজন যাত্রী দর্শন করতে যান।

শ্রীনগরে দশনামী সাধু সম্প্রদায়ের একটি আখড়া আছে। এর অধ্যক্ষের পরিচালনাধীনে শ্রাবণ শুক্লা পঞ্চমীর দিন 'ছড়ি'জীর শোভাযাত্রা বের হয়। তুটি রূপোর 'ছড়ি'কে মহাদেবের প্রতীকরূপে ঐ দিন বিশেষ পূজা করা হয় এবং ছড়িকে পুরোভাগে রেখে অমরনাথ যাত্রা সুরু হয়। কথিত আছে, পুরাকালে দস্যু ও রাক্ষসের অত্যাচারে যাত্রীরা অমরনাথ দর্শনে যেতে না পারায় তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের কঠোর তপস্যায় মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের তুটি ছড়ি দিয়ে বলেন যে, ঐ ছড়িকে সামনে করে নিয়ে গেলে দস্যুরা আর বাধা দিতে পারবে না। তদবধি নাকি এই প্রথা চলে আসছে। যাত্রাপথে যেখানে যেখানে রাত্রে বিশ্রাম করা হয় সেখানে সেখানে সুন্দর চন্দ্রাতপের নীচে ফুলমালা দিয়ে প্রথমে ছড়িকে স্থাপন করা এবং সন্ধ্যায় আরত্রিক ও ভজন করা হয়। আরতির পর অমরনাথ মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়। পহলগাঁও হতে চন্দনবাড়ী তারপর শেষনাগ এবং তারপর যেতে হয় পঞ্চতরণী।—বড় খাড়া পথ—প্রচণ্ড শীতে ঘোড়ার সাহায্যেই সাধারণতঃ যাত্রীরা এই পথ অতিক্রম করে। পহলগাঁও হতে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দূরে অমরনাথ গুহা।

পঞ্চতরণী অমরনাথ যাত্রার শেষ বিশ্রাম স্থান। এখানে ক্ষুদ্রকায়া পাঁচটি নদী এসে মিলিত হয়েছে। যাত্রীরা এখানে স্নান এবং শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করেন। চন্দনবাড়ী, শেষনাগ ও পঞ্চতরণী এই তিন জায়গাতেই আছে বিশ্রামাগার। পঞ্চতরণী থেকে অমরনাথধাম মাত্র সাড়ে চার মাইল দূর। এখান থেকেই অমরনাথ দর্শন করে আবার ফিরে আসতে হয়—অমরনাথে থাকার জায়গা নেই। চড়াই-উৎরাই পথ। বরফে

ঢাকা। অমরনাথ গুহার অপর পাড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে এক সুন্দর ঝর্ণা নেমে বইছে তার নাম অমরগঙ্গা। অমরগঙ্গা নীচে এসে অন্য একটা বড় ঝর্ণার সঙ্গে মিলেছে। প্রবাদ অমর গঙ্গার জল পান করলে পুনর্জন্ম হয় না। অমর গঙ্গার শাদা পাথরের গুঁড়ো—ঠিক শ্বেত চন্দনের মত—যাত্রীরা শিব-বিভূতি জ্ঞানে তা ললাটে লেপন করে "ব্যোম, ব্যোম মহাদেব, জয় অমরনাথজী কি জয়" বলে গুহা অভিমুখে রওনা হয়।

অমরনাথ গুহা বিরাটাকার—এর মূল প্রায় ৫০ ফুট (১৫ মিটার), দৈর্ঘ্য ৫৫ ফুট (১৬ মিটার) এবং উচ্চতা ৪৫ ফুট (১১ মিটার)। প্রায় সমুদ্র বক্ষ হতে অমর-গুহার উচ্চতা ১২,৫১৯ ফুট-এর (৩,৭৫৬ মিটার) মত। এখানে কোন মন্দির নেই—গুহার মধ্যেই অমরনাথজীর অধিষ্ঠান। গুহার ভিতর প্রায় হাজার জন যাত্রী ধরে। গুহার অভ্যন্তরে ৩/৪টি ধাপ আছে এবং ওপরের ধাপটি রেলিং দিয়ে ঘেরা। সবচেয়ে উঁচু জায়গায় প্রায় ২ মিঃ × ১·৫ মিঃ বরফের পিণ্ড জমা হয়—উনি গণেশ হিসাবে পূজিত হন। এই সিদ্ধিদাতা গণপতির পূজাই প্রথম করতে হয়। এঁর বামদিকে দু'পাশ রেলিং দিয়ে ঘেরা এবং বাকি দু'পাশে পাহাড়ের দেওয়াল তারই মধ্যে শ্রীশ্রীঅমরনাথজী। এই লিঙ্গ বিগ্রহও তুষার নির্মিত। শীর্ষদেশে শিবলিঙ্গের মত খানিকটা বরফ উঁচু হয়ে পাহাড় পর্যন্ত ঠেকে—প্রায় ৯১ সেন্টিমিটার উঁচু। বরফের লিঙ্গ বলে এঁকে রসলিঙ্গও বলা হয়। প্রবেশদ্বার থেকে প্রায় ৬ থেকে ৮ মিটার দূরে শেষ প্রান্তে লিঙ্গ মূর্তির অবস্থান। যোনি পীঠের পরিধি প্রায় ২ মিটার, উচ্চতা ৬১ সেন্টিমিটার। যোনি পীঠের মধ্যস্থল থেকে উত্থিত সর্পাকৃতি তুষার পিণ্ডের দ্বারা মূর্তি বেষ্টিত। ডলোমাইট (চুনাপাথর) শিলাকে আশ্রয় করে এই তুষার লিঙ্গের সৃষ্টি হয়। আরও বাম পাশে অপেক্ষাকৃত কম উঁচু একটি বরফ পিণ্ড রয়েছে—তাঁকে পার্বতীদেবী বলে পূজা করা হয়। গুহার উপরে পাহাড়ের ছাদ দিয়ে অনেক স্থান থেকে অবিরত জলের ফোঁটা পড়ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার! গুহার মধ্যে কিরূপে বরফ জমে যায় এবং জমলে ঐ বিশেষ তিন জায়গায় কেন জমে? এ অলৌকিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি—কোন বৈজ্ঞানিকের ধারণায় আসেনি এই প্রাকৃতিক সংঘটনের কারণ। যদি একে কেউ শুধু অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক ঘটনা বলেও মনে ভেবে থাকেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীশ্রীঅমরনাথজীর লিঙ্গ-বিগ্রহ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে ধীরে ধীরে বর্ধিত হতে সুরু করে এবং পূর্ণিমায় পূর্ণ

উচ্চতা পায়। আবার কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে আরম্ভ করে এবং অমাবস্যার দিন বরফের পিণ্ডের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে যায়। এ মহেশ্বরের অপূর্ব মাহাত্ম্য! তাঁর লীলা রহস্যের আবরণ তিনি উন্মোচন করতে পারেন—কেবল মানুষ তার জন্ম সার্থক করে তাঁকে দর্শন করে। সরল ও পবিত্র প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্য নিয়ে সুদুর্গম পথ অতিক্রম করে একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র কামনা শিব-দর্শন, এই আশা বুকে নিয়ে পুণ্যকামী ভক্ত মানুষ এখানে ছুটে আসে—ভগবান আবির্ভূত না হয়ে পারেন কি করে? এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করার জন্য হয়তো অনেক যুক্তি খুঁজে পেতে পারে অবিশ্বাসী মানুষ কিন্তু তার প্রাণ যে ফাঁকাই থেকে যায়—দেব-দর্শন করে বিশ্বাসী ভক্তের মত চিদানন্দে ভরে ওঠে না।

অমরনাথজীর গুহায় গিয়ে পাণ্ডার সাহায্যে পূজার্ঘ্য নিবেদন করা যায়।

গুহার ভিতর আর এক আশ্চর্য বস্তু আছে, তা হল কয়েক জোড়া পায়রা। তারা ঐ গুহার মধ্যেই ফোকরে বংশানুক্রমে বাস করছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তারা কি করে যে থাকে বা কি যে আহার করে তারাই জানে। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, পায়রার দর্শন না পেলে নাকি অমর-নাথজীর দর্শনের পূর্ণ ফল লাভ হয় না। সেজন্য যাত্রীরা উৎসুক হয়ে থাকেন কখন পায়রা দেখবেন এই আশায়। পায়রাগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট—নীচের দিকের রং শাদা, ওপর দিকটা কালো দাগকাটা। পায়রা সম্বন্ধে কথিত আছে যে, একদা শিব আপন মনে আত্মভোলা হয়ে নৃত্য করতে থাকেন। বহুক্ষণ ধরে নৃত্য চলে, সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে যায়, কিন্তু ভোলানাথের কোন খেয়াল নেই। তিনি নৃত্য করেই চলেছেন। সময় মত সন্ধ্যা আহ্নিক না করায় সেখানে উপস্থিত ডামরুক নামে শিবের এক অনুচর মনে মনে শিবের নাচ দেখে হেসে ফেলে। মহাদেব তা বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দেন, "এত স্পর্ধা তোর ডমরুক, তুই আমার অনুচর হয়ে আমাকেই উপহাস করিস, আমার প্রতি এই তোর ভক্তি? যা, তুই পায়রা হয়ে যা।"

তখন নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ ভুল বুঝতে পেরে মহাদেবের পদতলে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে আছড়ে পড়ে ডমরুক। শিব তুষ্ট হয়ে বলেন, "তুই পায়রা হয়ে এই গুহাতেই থাকবি, তবে যে যাত্রী

আমায় দর্শন করতে এখানে আসবে তারা যতক্ষণ না তোর দর্শন পাবে ততক্ষণ তাদের দর্শন সম্পূর্ণ হবে না।" তদবধি তারা বংশানুক্রমিক এখানে এই গুহাভ্যন্তরে বসবাস করছে।

অমরনাথ গুহার মধ্যে শৈত্য অত্যন্ত বেশী। জুতা পরে গুহায় প্রবেশ নিষিদ্ধ—যাত্রীরা পহলগাঁও থেকে একপ্রকার খড়ের জুতো কিনে পরেন। অমরনাথজীর পূজায় যা প্রণামী পড়ে তা তিন ভাগ করা হয়। একভাগ পান মোহান্তজী, দ্বিতীয় ভাগ পান পাণ্ডারা ও তৃতীয় ভাগ এক মুসলমান পরিবারকে দেওয়া হয়। এক সময় নাকি অতিরিক্ত তুষারপাতে অমরনাথ যাবার পথ বরফে ঢাকা পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল, ফলে কয়েক বছর কোনও যাত্রী দর্শনে যেতে পারেননি। তখন এক মুসলমান মেষপালক কোনও প্রকারে গুহার রাস্তা এবং গুহা আবিষ্কার করে সকল তীর্থকামীর কৃতজ্ঞতাভাজন হল। তখন থেকে তাঁর পরিবারবর্গ প্রণামীর এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে আসছে। দেবাদিদেব মহাদেবের কি অপার মহিমা।

বাস্তবিক তুষার তীর্থ অমরনাথের মাহাত্ম্যের শেষ নেই। এই গুহাতীর্থের নাম অমরনাথ কেমন করে হল সে সম্পর্কে প্রচলিত আছে কয়েকটি উপাখ্যান, সেগুলির মধ্যে ভৃঙ্গী পুরাণের আখ্যানটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এটি পৌরাণিক আখ্যান—কল্পনা কিম্বদন্তী নিয়ে গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসী ভক্ত অমরনাথজীর অমররূপ দেখতে দেখতে, অমরনাথের অমর কথা শুনতে শুনতে মহাদেবের করুণায় প্রাণের সকল চাওয়ার শেষে পেঁছে যায় সব পেয়েছির দেশে আর যুক্তিবাদী যাদের মন দোলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় তাদের যুক্তির গলি ঘুঁচিতে ঘোরাই হয় সার।

যে কাহিনী নিয়ে অমরনাথ কথা তার মূলে আছে পার্বতীর অমর হওয়ার ইতিহাস। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, মৃত্যুঞ্জয় শিবের ভার্যা 'সতী' অমর ছিলেন না। পার্বতীও অমরত্ব নিয়ে শিবকে বরণ করেননি। এই বিষয় নিয়েই অমরনাথের উপাখ্যান-কথা।

একদা কৈলাসে দেবী পার্বতী একাকী রয়েছেন। মহাদেব অন্যত্র কোথায় যেন গেছেন। এমন সময় নারদ মুনি "জয় শঙ্কর, জয় বিশ্বম্ভর" বলে কৈলাসে এসে উপস্থিত হলেন। শঙ্করকে না দেখে এবং পর্বতীকে একাকী চিন্তামগ্ন দেখে তিনি ভাবলেন হয়ত হর-পার্বতীর কিছু মান-অভিমান হয়েছে এবং সেই কথা চিন্তামাত্র তাঁর মনে এক মতলব খেলে

গেল। দেবর্ষি নারদ ভক্ত শিরোমণি—ভগবানের প্রতি তাঁর ভক্তির তুলনা নেই। তাছাড়া শিবানুকূল্যে তিনি সঙ্গীত-বিশারদ—তাঁর মত মন-প্রাণ ভরিয়ে কেউ গাইতে পারে না গান। তাঁর মন মন ভুলান কথাই বা কে পারেন বলতে ? কিন্তু এত সব ভাল ভাল গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর ছিল এক দুষ্ট বুদ্ধি। দেবতাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে রগড় দেখতে তাঁর আর জুড়ি ছিল না। কিন্তু মতলবের মধ্যেও সর্বদা উঁকি দিত শুভ ভাবনা। দেবী দুর্গাকে একাকিনী বসে থাকতে দেখে নারদ বিমর্ষ স্বরে বীণার তারে মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, জগজ্জননি, মহেশ্বরের কণ্ঠে দোলে যে মুণ্ডমালা সেটি কার কার মুণ্ড দিয়ে তৈরী জানেন কি ?" পার্বতী শির সঞ্চালন করে 'জানি না' এই কথা বলায় নারদ ইতস্ততঃ করে বলেন, "যদিও বলা উচিৎ নয়, ওগুলি কিন্তু মা আপনারই মাথা। এর পূর্বে আপনি যতবার জন্মেছেন, ততবারই আপনার শরীর যাওয়ার পর আপনার মাথাগুলি নিয়ে শিব মালা করে বুকে দুলিয়েছেন। শিব নিজে অমর, তিনি মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু জননি, অপরাধ নেবেন না, মহেশ আপনাকে অমর করেননি। হায় ! আপনাকে কিরূপ তিনি ভালবাসেন জানি না !"—এই কথা বলে উদ্দেশ্য সফল বিবেচনা করে নারদ অন্তর্হিত হলেন। দুঃখে-অভিমানে পার্বতী ব্যথিত হয়ে বসে রইলেন—সত্যিই তো শিবছাড়া তিনি কিছুই জানেন না, কিন্তু হায় তিনি অমর নন, আবার শিবকে ছেড়ে তাঁকে যদি দেহত্যাগ করতে হয়। না, কিছুতেই না—এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে তাঁকে। কিছুক্ষণ পর মহাদেব এলেন এবং গৌরীকে বিষণ্ণ মনে বসে থাকতে দেখে তাঁর বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন হাসতে হাসতে। ত্রিকালজ্ঞ তিনি, জানতে কিছুই বাকি নেই। শিবজায়া স্বামীকে উল্টে প্রশ্ন করলেন, "দেব, আপনার বক্ষে যে মুণ্ডমালা শোভা পাচ্ছে ঐ মালার মুণ্ডগুলি কার ?

অন্তর্যামী ভগবান নারদের কাণ্ড বুঝতে পেরে পার্বতীকে তুষ্ট করার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু দেবী জিদ ধরলেন যে, তাঁকে অমর না করা পর্যন্ত তাঁর মনোকষ্ট কমবে না—তিনি তাঁর শিবকে ছেড়ে যেতে পারবেন না। গৌরী বললেন, "দেব, আমায় এমন কথা বলুন যা শ্রবণমাত্র আমি অমর হয়ে যাব।"—

নিরুপায় মহাদেব শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে বললেন, "এমন একটা নিভৃত স্থান বেছে নিয়ে তোমায় উপদেশ করতে হবে, যাতে ঐ কথা

অপর কেউ না শুনতে পায়, কারণ ঐ মহামূল্যবান উপদেশ যে শুনবে সেই অমর হয়ে যাবে। প্রিয়ে, তুমি এ কথা শোনার উপযুক্ত পাত্রী হলেও, অপরে নয়।" এইকথা বলে তাঁরা উভয়ে নির্জন স্থান অন্বেষণ করতে করতে বর্তমান অমরনাথ গুহার কাছে এসে ঐ স্থানটি একান্ত নিরালা দেখে পছন্দ করলেন। ঐখানে বসেই উপদেশ দেবেন বলে মনস্থ করলেন মহাদেব। উপবেশনের স্থান না থাকায় শঙ্কর ত্রিশূল দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করলেন—সৃষ্টি হল এক বিরাট গহ্বরের। ওঁরা দুজনে সেই গুহার মধ্যে সামনা-সামনি বসলেন। গৌরীকে খুব মনোযোগ-সহ অমূল্য উপদেশ শুনতে বলে শিব সমাধিস্থ হলেন। সমাধি ভঙ্গের পর নিমিলিত নেত্রে শিব অমর উপদেশ আরম্ভ করলেন। মহেশ পূর্বেই দুর্গাকে বলেছিলেন "প্রিয়ে তুমি উপদেশ শুনছ বা বুঝছ কিনা তা 'হুঁ' 'হুঁ' করে আমার কথায় সায় দিলেই বুঝতে পারব।"

এর মধ্যে আর এক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। এক ধর্মপ্রাণ রাজা কোন এক মুনির বিরাগভাজন হওয়ায় মুনি রাজাকে 'তোতা' হয়ে যাও বলে অভিশাপ দিলেন। ফলে নৃপতি হয়ে গেলেন একটি তোতাপাখী। সেকালে মুনি-ঋষি কেউ কেউ কখনো চটে গিয়ে অমন অভিশাপ দিয়ে বসতেন। ধর্মপ্রাণ রাজা মুনির পদতলে পড়ে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করায় মুনি বললেন, "বৎস, মুনি-ঋষির বাক্য কখনও বৃথা হয় না, অমুক পার্বত্য স্থানে মহেশ্বর পার্বতীকে অমর কথা উপদেশ দিচ্ছেন, তুমি কোনও রকমে তাঁদের অগোচরে গুহায় ঢুকে ফোকরের মধ্যে বসে ঐ উপদেশ শুনলে অমর হয়ে যাবে এবং তোমার নাম ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে ত্রিভুবনে।"—

এদিকে শিব উপদেশ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী হঠাৎ গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হলেন, কিন্তু মহাদেব কিছুক্ষণ উপদেশ দেওয়ার পর যখন 'শুনছত' এই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তখনই সেই তোতা ফোকরে বসে 'হুঁ' 'হুঁ' করে সায় দিতে লাগল। উপদেশ শেষ করে মহাদেব নেত্র উন্মীলন করে দেখলেন, পার্বতী নিদ্রাভিভূতা। তাঁকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রিয়ে, উপদেশ সব শুনেছত?" পার্বতী অতিমাত্রায় দুঃখিতা হয়ে বললেন, "হায় প্রভু! হঠাৎ মোহনিদ্রা আমায় অভিভূত করায় আমি ঘুমের ঘোরে কথা শুনতে শুনতে কখন যে নিদ্রাভিভূত হয়েছি কিছুই জানি না—এই কথা বলে তিনি দুখ করতে লাগলেম। শিব বিস্মিত হয়ে বলেন, "সেকি। তবে 'হুঁ' 'হুঁ' করে সায় দিল কে?"

শিব ক্রোধে আরক্ত লোচনে ইতস্ততঃ এদিক ওদিক চাইতে

চাইতে দেখতে পেলেন একটা তোতা পাখী ফোকরে বসে আছে। তক্ষুণি ত্রিশূল হাতে তাকে বধ করতে উদ্যত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোতাও প্রাণভয়ে উড়ে পালিয়ে গেল, মহাদেবও তার পশ্চাতে ধাবমান হলেন। তোতা উড়তে উড়তে সমস্ত ত্রিভুবনে ঘুরতে লাগলো, কোথাও আশ্রয় মেলে কিনা সে চেষ্টায়। প্রথমে অনেকেই অসহায় তোতাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করলেও, সে শিবের কোপে পড়েছে জেনে আর কেউ তাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করলেন না। অবশেষে তোতাটি উড়তে উড়তে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এক পুকুরের কাছে এসে দেখে যে, এক মহিলা স্নান সমাপন করে মাথার চুল থেকে জল ঝারছেন। মাথা পিছন দিক করে জল ঝাড়তে ঝাড়তে মুখ হাঁ করায় তোতা অনন্যোপায় হয়ে তার মুখে ঢুকে গেল।

এখন সেই মহিলা হলেন ব্যাসপত্নী এবং তাঁর মত সাধ্বী রমণী তখন কেউ ছিল না বললেই চলে। তাঁর কাছে দেবতারাও হার মানেন, কাজেই মাহাদেব আর কিছু করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তোতাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। শিবের বরে তোতারূপী রাজা অমর হলেন। আশুতোষের এই রাগ, আবার এই তুষ্টি।

কিছুদিন পর ব্যাসদেবের স্ত্রীর গর্ভ লক্ষণ দেখা দিল, কিন্তু দশ মাস দশদিন পরও কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। এইভাবে দীর্ঘ বার বছর কেটে গেল, তখন ব্যাসদেব আর থাকতে না পেরে গর্ভস্থ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আপনি যেই হোন না কেন সত্বর নির্গত হয়ে আসুন, নতুবা আমার পত্নীর জীবন সংশয়।"

ব্যাসদেবের এই কথা শুনে এক পরম রূপবান পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েই জঙ্গলের দিকে চলতে লাগলেন—ইনিই হচ্ছেন সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ শুকদেব। তোতার অন্যনাম শুক। মুনিবাক্য সফল হল।

যেহেতু এই গুহায় বসে শিব পার্বতীকে অমর কথা শুনিয়েছিলেন সেজন্য এর নাম হল অমরনাথ। ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে যাঁরা অমর-নাথজী দর্শন করেন তাঁরাও মোক্ষ অর্থাৎ অমরত্ব প্রাপ্ত হন।

দেবতারা যখন শুনলেন যে, শিব ঐ গুহায় বসে পার্বতীকে অমর কথা উপদেশ করেছেন, তখন তাঁরাও তা শুনবার আশায় ঐ গুহায় এসে শিবের আরাধনা আরম্ভ করেন। তাঁরা যেদিন এসেছিলেন সেদিন হল শ্রাবণী অমাবস্যা। এক পক্ষকাল ধরে কঠোর তপস্যা করেন নিভৃ এবং পরে শিব সন্তুষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে তাঁর স্বরূপ দেবতাদের

সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করতে থাকেন। দেবতারা খুশী হয়ে চলে যাওয়ার পর মহেশ্বর নিজেকে ধীরে ধীরে আবার অপ্রকট করেন। তদবধি এরূপ জন-বিশ্বাস যে, প্রতি শ্রাবণী শুক্লপক্ষে তিনি বর্ধিত হয়ে পূর্ণ কলেবর ধারণ করেন। পূর্ণিমায় আবার কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস পেতে আরম্ভ করেন। যেহেতু শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন তিনি প্রথমে ঐ গুহায় নিজের পূর্ণরূপ প্রকটিত করেন সে কারণে ঐ দিনই সকলে তাঁকে দর্শন করেন। এই হল অমরনাথের অমর কথা।

পৌরাণিক কাহিনী অনেক সময় আজগুবি ও ছেলে-ভুলানো গল্প মনে হলেও একথা ভুললে চলবে না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সবই হয়—তাঁর কাছে সবই সাধ্য। দেবাদিদেব মহেশ্বর যেমন তোতাকে কৃপা করেছেন তেমনি আমাদের সকলকে কৃপা করুন এবং আমাদের ভববন্ধন মোচন করুন।

স্থানীয় লোকেরা অমরনাথকে কৈলাস বলে।

শিবের গদী মণিমহেশ

মণিমহেশ। হিমগিরির তুষারে আচ্ছাদিত মনোমুগ্ধকর একটি বিরাট হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে আছে মণিমহেশ গিরিশিখর। কৈলাস শিখরেরই মতন স্বয়ম্ভু জ্যোতির্ময় মণিমহেশ। স্থানীয় লোকেরা বলে, চম্বা-কৈলাস। হিমালয়ের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করার সিংহদ্বার হল পাঠানকোট—এখান থেকে পূর্বদিকে খানিকটা গিয়ে এক শাখা পথ হিমালয়ের উত্তরদিকে গেছে। সেদিকে আছে সুন্দর পার্বত্যনগর—ডালহৌসী। তারই নীচে ইরাবতীর উপত্যকা। তার কিছুদূরে চম্বা। পাঠানকোট থেকে বাস পথে প্রায় ১১৬ কি. মি. (৭৫ মাইল)। ব্রিটিশ রাজত্বে চম্বা ছিল এক করদ রাজ্য, যার রাজধানী ছিল চম্বা। ইরাবতীর তীরে এই সুরম্য সমতল উপত্যকা এক রাজকুমারীর চোখে পড়ে এবং তিনি পিতা নৃপতি সহিলবর্মাকে এখানে রাজধানী নির্মাণ করতে উৎসাহ দেন। সময়টা ছিল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী। রাজকুমারীর নাম ছিল চম্পাবতী—রাজধানীর নামও তাই হয় চম্পা। ক্রমে ক্রমে তার রূপ দাঁড়ায় 'চম্বা'।

চম্বায় এক অতি প্রাচীন শিব দেউল আছে—পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ—অতিশয় জাগ্রত দেবতা হিসাবে মানুষজন মানে। নাম গৌরীশঙ্কর। এছাড়া আছেন চন্দ্রগুপ্ত শিব। মন্দিরগুলিতে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য। এই সকল মন্দির জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিস্তর জনকথা—কিম্বদন্তী। তারই স্মরণে চম্বায় বিভিন্ন সময়ে এখনও নানা মেলা বসে। চম্বা থেকে প্রাচীন রাজধানী ভারমোর শহর হয়ে মণিমহেশ যেতে সময় লাগে দু'দিনের মত। মণিমহেশ শিবের রাজ্য—শিবভূমি। কারও কারও মতে, এই অঞ্চলই হল শিবের গদী, তাই সেখানকার লোকেদের বলে গদ্দী। এরা সবাই শিবভক্ত।

কোন কোন পণ্ডিতের অনুমান যে, গদ্দীদের পূর্বপুরুষরা ছিল আর্যদের সগোত্র শক জাতি। পূর্বকালে মধ্য এশিয়ার এরা ছিল ভ্রাম্যমাণ যাযাবর। সেই শকেদেরই কয়েকটি শাখা ভারতবর্ষের দিকে চলে

আসে। তার মধ্যে একটি শাখা এসেছিল চম্বা, মণ্ডী, লাহুল এইসব অঞ্চলে। তাদের নাম হয় গদ্দী। এরা এখানে শৈবধর্ম গ্রহণ করেছিল। ব্রাহ্মণরা যেমন উপবীত গ্রহণ করে থাকে তাদের মত গদ্দীরা কোমরে একরকম 'ডোরা' পরে। একে বলে 'শিউজীকা জটা'। শিউজীকা জটা সম্পর্কে এক উপাখ্যান এখানে প্রচলিত। সেই জনশ্রুতি অনুসারে গদ্দীরা বিশ্বাস করে যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা এখানে রাজস্থান থেকে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। চম্বা বংশাবলীতে চম্বার প্রথম রাজার নাম উল্লেখ আছে জয়স্তম্ভ বলে। প্রবাদ যে, তিনি রাজস্থানের কোন এক রাজবংশের সন্তান। পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় স্বভূমি ত্যাগ করেন। জয়স্তম্ভ নাকি প্রথমে সন্ন্যাস নেবার সঙ্কল্প করেছিলেন কিন্তু তাঁর গুরুদেব তাঁকে সে পথ থেকে ফেরান এবং রাজপুতের জীবনের আদর্শ নিয়ে চলতে আদেশ করেন। তিনিই জয়স্তম্ভকে হিমালয়ের এই অঞ্চলে সদলবলে চলে আসার নির্দেশ দেন। কুমার এই পথে আরও একটু এগিয়ে খাড়া মুখে উপস্থিত হলে অগ্রচারী নামে এক শিবভক্ত সাধকের দেখা পান। ঋষি অগ্রচারী শিবের কাছ থেকে পূর্বে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে, জয়স্তম্ভকে এই প্রদেশে স্বাগত জানাতে হবে এবং শিবের অঙ্গসজ্জা—টোপ (টুপি), চোলা (ঝোলা, আলখাল্লার মত জামা) ও ডোরা (কোমরে জড়ানো দড়ি) এইসব তাঁকে উপহার দিতে। কুমার জয়স্তম্ভ সন্ন্যাসী মারফত শিব প্রদত্ত সেই শিববেশ পরিধান করে তারমোরে রাজ্য স্থাপন করলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতি রাজস্থান থেকে। সকলেই উল্লিখিত শিবের বেশ ধারণ করে। সকলে শৈবধর্ম গ্রহণ করে শিব উপাসক হয় এবং নিজেদের শিবভক্ত বলে প্রচারও করে। কালপ্রবাহে এই শিব-ভূমিতে যাকে বলা হয় শিবের গদ্দী, এখানে বাস করার জন্য এদের নামকরণ হয় গদ্দী।

আবার অপর এক কিম্বদন্তী অন্য কথা বলে। জয়স্তম্ভের পিতার নাম ছিল মরু। তিনিই নাকি প্রথমে তারমোরে এসে রাজ্য স্থাপন করেন। গদ্দীদের মধ্যে আরও এক ধারণা আছে যে, ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা অজয় বর্মণের রাজত্বকালে গদ্দীদের পুর্বপুরুষেরা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি) দিল্লি ও পাঞ্জাব থেকে এখানে চলে আসে। অর্থাৎ একথা বোঝা যাচ্ছে যে, গদ্দীরা এখানকার আদি অধিবাসী নয়, এক হাজার বা দেড় হাজার বা তারও আগে থেকে এই অঞ্চলে এসে বসবাস করে। এরা হিন্দুই ছিল—এখনও হিন্দু কিন্তু সকলেই শৈব। শিব গদ্দীদের

প্রধান দেবতা। নিজেদের বেশভূষা শিব-পার্বতীর বেশভূষা বলেই এদের বিশ্বাস। অন্য দেবতাদের মন্দিরাদি থাকলেও এখানে শিব পূজাই প্রধান পূজা। এখানকার মত রাজস্থান বা পাঞ্জাবে অর্থাৎ যে অঞ্চল থেকে গদ্দীদের পূর্বপুরুষরা এখানে এসেছিল বলে অনুমান করা হয়, সেখানে কিন্তু এখানকার মত শৈব ধর্মের এত প্রচার বা প্রভাব সে অঞ্চলে ছিল না। হিমালয় শিবের বাসভূমি এবং মণিমহেশের অন্য নাম চম্বা-কৈলাস। তাই একথা মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে, গদ্দীদের পুর্বপুরুষরা যখন এখানে এসেছিল তখন এখানে যে আদিবাসীদের বাস ছিল এবং তাদের দেবতা ছিলেন শিব। হয়ত তারা অনার্য ছিল কিম্বা আর্য-অনার্য মিশ্রিত কোন জাতি। মনে হয়, রাজপুত রাজকুমার জয়স্তম্ভ বা তাঁর পিতা এই সুদূর পার্বত্য দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে দিয়ে রাজ্যস্থাপনের প্রয়াস না করে এখানকার অধিবাসীদের ধর্মগ্রহণ করে এদেশ বশ করেন। এর দ্বারা সহজেই তাঁর কার্য সিদ্ধি হয় এবং রাজাকে দেবতার প্রতিনিধি বিবেচনা করে শিবের বেশ-ভূষায় তাঁকে সজ্জিত করে তারা তাঁকে তাদের রাজা হিসাবে মেনে নেয়।

তারমোর মণিমহেশ তীর্থভূমির সিংহদুয়ার। মণিমহেশের পথে চন্দ্রভাগার উপত্যকাভূমিতে আছে বিখ্যাত ত্রিলোকনাথের মন্দির জাগ্রত শিবলিঙ্গ।

মণিমহেশ সম্পর্কে প্রচলিত আছে এক কিম্বদন্তী। অমরনাথ নিজেই এখানে এসে নাকি তাঁর এই শিবভূমি নির্মাণ করেছিলেন। কাশ্মীরে মুসলমানদের ঘোর অত্যাচার দেখে অমরনাথ এইখানে চলে আসেন বলে কথিত। তিনি নিজের নতুন নাম নেন মণিমহেশ। শিব এখানে গোপনে হিমালয়ের তুষার রাজ্যে থাকেন—কেউ তাঁর সন্ধান জানে না। একবার হল কি, এক গরীব গদ্দী তার ভেড়াগুলি চরাতে চরাতে পাহাড়ের এদিকে চলে আসে। আর এসে এখানকার অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখে মন হারিয়ে ফেলে। শিবের নিজের পছন্দ করা কৈলাশ —অপরূপ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সুষমা। সেই মেষপালক গদ্দী তন্ময় হয়ে যায়—মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে থাকে কেবল।

এমন সময় হঠাৎ আকাশে দৈববাণী হয়, কে যেন গভীর নিনাদিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—"এদিকে এসেছিস কেন? কি চাই তোর?" দৈববাণী শুনে ভয়-ব্যাকুল চোখে এদিক-ওদিক চায় মেষপালক। হঠাৎ দেখে সম্মুখে এসে উদয় হয়েছেন জটাজুটধারী এক বিরাট পুরুষ।

ইনি ছদ্মবেশী শিব। সেই বিরাট পুরুষ আবার প্রশ্ন করেন "কি চাই তোর বল?"—মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি—চোখে অপার করুণার আলো। মহেশ্বরকে চিনতে পারে না ভাগ্যবান অথচ অভাগা গদ্দী, ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে জানায়, "এক হাজার ভেড়া কামনা করি।" সেই মহাপুরুষ হেসে ওঠেন, তারপর বলেন "তথাস্তু, তাই পাবি তুই, কিন্তু কাউকে বলবি নে একথা। বললে আর আমার দেখা পাবিনে—তোরও ভাল হবে না।" এই কথা বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। প্রাণে আনন্দের হিল্লোল নিয়ে গদ্দী ফিরে চলে ঘরে। এসে দেখে তার ঘরে হাজার ভেড়ার ভীড়। মহাপুরুষ তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। কিন্তু একি হল তার! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলেও ভেড়াগুলোর প্রতি কই সে তো তেমন আকর্ষণ অনুভব করতে পারছে না। পার্থিব বস্তুতে যেন তার আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। সেই মহাপুরুষ যাঁকে সে পাহাড়ে দেখেছিল তাঁরই কথা ভাবে সে কেবল। মেষগুলির দিকে ফিরেও তাকায় না যত্ন নেয় না—সদা উন্মনা ভাব। প্রাণে তার জেগেছে বৈরাগ্য—ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন এক মহাত্মা মণিমহেশ দর্শনে এলেন, কিন্তু কিভাবে মণি-মহেশ যাবেন পথ খুঁজে পান না। দেখা হয়ে গেল ঐ গরীব উদাসীন মেষ পালকের সঙ্গে। "বাপু হে, আমায় মণিমহেশ যাবার পথটি দেখিয়ে দাও—আমি বড় আতান্তরে পড়েছি, পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি জানো সে পথ?" মেষ পালক বলে—"মহাশয় আমি জানি সে পথের সন্ধান, কিন্তু বলবো না।—সরল গদ্দী সোজা বলে। "কেন গো বলবে না? আমি যে মহা মুস্কিলে পড়েছি।"

"বলবো না। মহাপুরুষ আমায় মানা করেছেন সে কথা বলতে।" —কিছুতেই বলতে চায় না সরল পাহাড়ী ঐ মেষপালক। বহু অনুরোধের পর সে রাজি হল যদি আর একবার সেই মহাপুরুষকে দেখতে পায় এই আশায়, ওঁকে দেখার জন্যই তো সে ব্যাকুল। আগন্তুক মহাত্মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে মণিমহেশের উদ্দেশ্যে, সঙ্গে নেয় এক পাল ভেড়া ও একটি কুকুর।

পাহাড়ের উপর অর্ধেক পথ তারা উঠেছে এমন সময় হঠাৎ দৈববাণী ধ্বনিত হল আকাশে—"আমি তোকে বারণ করেছিলাম, তুই আমার নিষেধ সত্ত্বেও অন্যকে পথ দেখিয়ে আনছিস। থাক তুই ঐখানে দাঁড়িয়ে।" গদ্দী দাঁড়িয়ে গেল প্রস্তরবৎ—না পারে এগুতে না পারে পেছোতে। ভয় পেয়ে একে একে দিশাহারা হয়ে মণিমহেশের উদ্দেশ্যে তার মেষগুলিকে

বলি দিতে থাকে। দুটো ভেড়া যখন বলি দিতে বাকি আবার দৈববাণী শোনা যায়, "যেমন আছিস তোরা তেমনি পাথর হয়ে থাক ওখানে দাঁড়িয়ে।"

সেই থেকে ঐ মেষ পালক গদ্দী, দুই-ভেড়া, কুকুর ও মহাত্মা প্রস্তরী-ভূত অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একটা বিরাট সর্প ও একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বায়স অজানিতে তাদের সঙ্গে এসেছিল। তারাও পাথর হয়ে গেল।

এরপর থেকে এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে এখানে গদ্দীরা বছর বছর মেলা বসায় এবং মেলার সময় হাজার হাজার ভেড়া মনি-মহেশের উদ্দেশ্যে বলি দেয় মণিমহেশ হ্রদের ধারে। সেই সব পাথরের মূর্তি আজও দেখা যায় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মণিমহেশের তীর্থযাত্রী মণিমহেশে গিয়ে পূজার্পণ করার আগে তারমোরে ব্রাহ্মণী দেবীর মন্দিরে যদি পূজা না দেন তবে তাঁদের তীর্থ যাত্রা সফল হয় না বলে জনসাধারণের বিশ্বাস। এ সম্পর্কে প্রচলিত আছে এক কিম্বদন্তী যার বর্ণনা এই রকম।

তারমোর গ্রামে ছড়িয়ে আছে নানা দেবদেবীর মন্দির যদিও শিবই প্রধান দেবতা। গ্রামের কেন্দ্রস্থলকে চৌরাশী বলে। ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মণী দেবী থাকতেন। এখন পাহাড়ের ওপর যেখানে তাঁর মন্দির রয়েছে সেখানে তিনি থাকতেন। ব্রাহ্মণী নালার উৎসমুখের কাছে এই মন্দির। তাঁর ছিল এক বালক ছেলে। ছেলেটির ছিল এক পোষ মানা চকোর পক্ষী। গাঁয়ের এক চাষী পাখীটাকে মেরে ফেলে। তারই শোকে আকুল হয়ে ছেলেটি মারা যায়। মায়ের একমাত্র ছেলে—ব্রাহ্মণী দেবী পুত্র বিয়োগ সইতে পারলেন না। পুত্রের চিতানলে নিজের প্রাণ আহুতি দিলেন। তারপর থেকে গ্রামবাসীদের ওপর সেই মৃতা জননীর ও চকোরের প্রেতাত্মার উপদ্রব আরম্ভ হয়। গ্রামের লোকেরা ভয় পায়—দেবী বলে তাঁর পূজা দেয় এবং মন্দির নির্মাণ করে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। কিছুকাল পর মহাদেব চুরাশি জন সিদ্ধ পুরুষ নিয়ে মণিমহেশ যাত্রা করলে এক প্রবল তুষার-ঝড়ের সম্মুখীন হয়ে এখানে এসে রাত কাটান। ধূনি জ্বেলে বিশ্রাম করেন। ব্রাহ্মণী দেবী তাঁর এলাকার মধ্যে ৮৫ জন সিদ্ধ পুরুষের অনধিকার প্রবেশের জন্য নাকি বিশেষ কুপিতা হন এবং মহাকায়া রূপ ধারণ করে তাঁদের সম্মুখে প্রকটিত হন। শিবকে তক্ষুণি সেখান থেকে চলে যেতে

বলেন। শিব সবিনয়ে অনুমতি চান, রাতটুকু শুধু এখানে কাটিয়ে যাবেন। সম্মতি দিয়ে দেবী তাঁর মন্দিরে চলে যান। রাত্রি অতিবাহিত হয়ে ভোর হলে দেখা গেল, সেই ৮৪ জন সিদ্ধ সাধক পাথরের লিঙ্গমূর্তি পরিগ্রহ করে সেখানে অধিষ্ঠান করছেন। সেই থেকে এই ক্ষেত্রের নাম হয় চৌরাশী। এখনও ৮৪টি ছোটবড় শিব দেউল রয়েছে সেখানে।

শিব কিন্তু ব্রাহ্মণী দেবীকে বর দিয়েছিলেন যে, মণিমহেশগামী তীর্থযাত্রী প্রথমে এই পথে যাবার সময় ব্রাহ্মণী ধারায় স্নান করবে, দেবীর পূজা দেবে—তা না করলে তীর্থ ভ্রমণের পুণ্য ফল তাদের অভিগত হবে না। ব্রাহ্মণী দেবী হতেই নাকি ব্রহ্মপুত্র ও ক্রমে তার-মোর নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে জনপ্রবাদ।

তারমোরে মণিমহেশ বা হরিহর মন্দির অপূর্ব শিল্প-সুষমা নিয়ে বিরাজ করছে। বর্মণরাজ খ্রীষ্টীয় ৭ম/৮ম শতকে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মণিমহেশের মন্দিরের সামনে পিতলের তৈরী প্রকাণ্ড বৃষভমূর্তি শোভা পাচ্ছে। এখানে অন্যান্য দেব-দেবীরও মন্দির আছে, যেমন সূর্যদেব, লক্ষ্মণা দেবী বা গণপতির মন্দির। কিন্তু এসব মন্দিরের অবস্থিতি সত্ত্বেও এখানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শিব দেউল। এখানে একটি বাঁধান কুণ্ড আছে—নাম অর্ধগয়া কুণ্ড। এর সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদিন শিব ও পার্বতী গণেশকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করছেন, হঠাৎ পার্বতীর মনে পড়ে যে, সেদিন গয়াতীর্থের জলে পুণ্যস্নানের তিথি। তিনি গয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু শিব তখন হিমালয় ছেড়ে গয়া যেতে চান না। পার্বতী এজন্য বিমর্ষ হন। মাতৃভক্ত গণেশ তখন ভূমিতে পদক্ষেপ করলে সপ্তধারায় জল নির্গত হয়। ভারতবর্ষের সকল পবিত্র নদনদীর জলধারায় সৃষ্ট হয় এই প্রসিদ্ধ কুণ্ডের। নাম হয় অর্ধগয়া। পার্বতী ঐ কুণ্ডে অবগাহন করে গয়া তীর্থের জলে পুণ্য স্নান করেছিলেন সেদিন।

মণিমহেশ গিরিশৃঙ্গের নীচে রয়েছে মণিমহেশ হ্রদ যার জলের ওপর বিছিয়ে থাকে ঘন তুষার-চাদরের আচ্ছাদন। হ্রদের একপাশে জলের কাছে মাটিতে রয়েছে কয়েকটি শিবলিঙ্গ ও কয়েকটি ত্রিশূল গ্রথিত।

চারিপাশে তুষার কিরীট গিরিশ্রেণী আর তারই মধ্যভাগে নীল মহাকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মণিমহেশ—ধ্যান গম্ভীর উন্নত শির —স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গিরিরাজ। এ কোণাকার—দেখতে যেন অবিকল

এক শিবলিঙ্গ। শিখরের গায়ে কোথাও তুষারের প্রলেপ, কোথাও বা পাথর খণ্ড। মনে হয় যেন, পূজার শেষে শিবের চরণে শ্বেত পত্র ও বিশ্বদলের অঞ্জলির নিদর্শন। পাথরগুলি এমনি বিচিত্রভাবে রয়েছে যে, দেখে মনে হবে গিরিশিখরের গায়ে অজস্র ত্রিশূল গাঁথা রয়েছে। কোথাও বা মনে হয়, জীবজন্তু সব পড়ে আছে। চূড়ার অনেক নীচে তুষারাবৃত জীবজন্তুর মত দেখতে কয়েকটি পাথর দেখিয়ে লোকে বলে এরা হল সেই মেষপালক, ভেড়া, কুকুর আর মহাত্মা।

কৈলাশ শিখর যেমন দেবতার প্রতীক, এখানে তেমনি মণিমহেশ শিখরই স্বয়ং শিবলিঙ্গের প্রতিকৃতি। তারই পাদদেশে বিস্তীর্ণ মণি-মহেশ হ্রদ যেন কৈলাশের কোলে গৌরী কুণ্ড।

বিষহারী শিব নীলকণ্ঠ

শিবের অমর উপদেশ শুনে পার্বতী লাভ করেছেন অমরত্ব। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, দক্ষ প্রভৃতি দেবতাগণ সকলেই অমর। অমরনাথের অমরকথা শোনার জন্যে স্বর্গরাজ্যের ছোট বড় দেবতাদের ভীড় লেগেছিল মহেশ্বরের দরবারে। তাঁরা অমরনাথকে স্তবে প্রসন্ন করে অমর উপদেশ শুনতে চেয়েছিলেন অমর হবার অভিলাষে। তার-পর সকল দেবতাই অমরত্ব লাভ করলেন জলধি-মন্থনে উত্থিত অমৃত পান করে। যুগে যুগে এই কাহিনী শুনে আসছে মানুষ—দেবতাদের অমৃত খেয়ে অমরত্ব লাভ আর শিবের হলাহল গলাধঃ করে নীলকণ্ঠ হওয়ার কথা-কাহিনী; জলধি-মন্থন পুরাণের উপাখ্যান—যদি একে নিছক কল্প-কথা মনে করা হয় তবে কল্প-কথাই, কিন্তু এ কাহিনী বড় মন আকর্ষক এবং ধর্মকথা। আবার যদি রূপক আশ্রিত কোন তত্ত্বের প্রকাশ হয় এ কাহিনী, তারই বা মূল্য কম কি মানব-জীবন চলায়। যুগে যুগে কথক ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনের আখ্যান শোনায় ভক্তপ্রাণকে—শিবের নীলকণ্ঠ হওয়ার বৃত্তান্ত শোনে মানুষ ভক্তি নম্রচিত্তে,—মহান মহেশ্বরের মহিমার প্রকাশ। এ ঘটনার তুলনা নেই।

লক্ষ্য তার যাই-ই থাক না কেন, একটা ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করেই ঘটেছিল সিন্ধু মন্থন। ঘটনাটি হল কোপন স্বভাব দুর্বাসার দুর্নিবার ক্রোধ অভিব্যক্তির ফল। ঋষি দুর্বাসা এসেছেন সুরলোকে। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতা এবং দেববালারা তাঁকে আপ্যায়ন করলেন। ঋষিবর প্রীত হয়ে তাঁর কণ্ঠের পারিজাত মালিকা সুরপতিকে দিলেন। গজপৃষ্ঠে ছিলেন ইন্দ্র, মাল্য শ্রদ্ধাবনত হয়ে গ্রহণ করে গজ শিরোপরি স্থাপন করলেন। কিন্তু মালিকা ভূতলে পড়ে গেল এবং মথিত হল গজপদভারে। দুর্বাসা দেখলেন তাঁর কণ্ঠ মালিকার হেনস্থা, যা তিনি প্রীতিভরে ইন্দ্রকে অর্পণ করেছিলেন। তাঁর উপহার দেওয়া বস্তুকে হেয় করলেন সুরপতি? ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত ঋষিবর দেবরাজকে অভিশাপ দিলেন—"ঐশ্বর্যমদে মত্ত তুমি আমার দেওয়া

উপহার অনাদর করতে সাহসী হও—আজ হতে সুরপুরী লক্ষ্মীহীন হবে।"—ঋষি দুর্বাসাকে কিন্তু দেবরাজ এই কথা বলার অবসরটুকুও পেলেন না যে, ব্যাপারটি স্বেচ্ছাকৃত হয়নি, সম্পূর্ণ অনবধানতা বশত: ঘটে গেছে। এমন কি ক্ষমা ভিক্ষা করারও অবসর দিলেন না দুর্বাসা—ক্ষর ক্ষিপ্র গমনে সুরপুরী ত্যাগ করে চলে গেলেন।

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীও সুরপুরী ত্যাগ করে সাগর জলে প্রবেশ করলেন—স্বর্গরাজ্য শ্রীহীন, ঐশ্বর্যহীন হল।

দেবতাদের মনের হাহাকার নিয়ে পিতামহ ব্রহ্মা সকল দেবতার হয়ে বিষ্ণুর কাছে গেলেন। লক্ষ্মী-বিহনে কাতর বিষ্ণু বললেন, "লক্ষ্মীকে সমুদ্র গর্ভ হতে উত্তোলিত করতে হবে" তারপর পরামর্শ দিলেন মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড করে জলধি মন্থন করতে। নারায়ণ আরও বললেন, "দেবদৈত্য মিলে ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করবে—সর্পরাজ বাসুকি হবে মন্থনরজ্জু। ঐ সাগর মন্থনে অমৃতের উৎক্ষেপণ হবে। অমৃত অমরত্ব দেবে সকলকে।"

বিষ্ণুর আজ্ঞা ব্রহ্মা সকল দেবাসুরকে জ্ঞাত করালেন—অমৃতের লোভে সকলে জলধি মন্থনে উৎসাহ প্রকাশ করল। দেবতারা মন্দর পর্বতে গেলেন—অভ্রংলিহ মন্দরগিরি তার বিশালত্ব নিয়ে অবস্থান করছে—দেবতারা তাঁদের সীমিত শক্তি দ্বারা মন্দরকে তুলে আনতে পারলেন না। সকলে পুনরায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তখন কমলাপতি কমলা উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হয়ে অনন্ত মহীধরকে আজ্ঞা দিলে সে স্বীয় ভুজবলে মন্দরকে তুলে নিয়ে এলেন। তারপর দেবগণ সমুদ্র কিনারে গিয়ে সিন্ধুপতি বরুণদেবকে বললেন, "দেব আপনি মন্দর গিরিকে আপনার মধ্যে ধরে রাখুন।" কিন্তু বরুণ বললেন, "এই পর্বতের বিস্তার অনেক, আমার এত শক্তি নেই যে, এঁকে ধরে রাখি। তবে এক উপায় আছে, আমার জলে অতি মহাকায় এক কূর্ম আছে, তার পৃষ্ঠদেশে পর্বতকে স্থাপন করে মন্থন কার্য করা যাবে।" দেবতারা তখন স্তবে তুষ্ট করে কূর্মটির পৃষ্ঠোপরি মন্দরকে স্থাপন করলেন। বাসুকি নাগকে মন্থন রজ্জু করা হল। সর্পরাজের পুচ্ছ প্রান্তটি ধরলেন দেবগণ। মন্দার পর্বতকে বেড় দিয়ে মুখের প্রান্ত ভাগ ধরলো দৈত্যরা—সুরু হল সিন্ধু মন্থন। গিরি ঘর্ষণে বাসুকির মুখ-গহ্বর হতে তপ্ত বাষ্প, নাসিকা হতে উষ্ণ নিশ্বাস নির্গমন হতে লাগল এবং সেই কৃষ্ণধূম আকাশে মেঘ হয়ে জন্মাল, তারপর হল বৃষ্টি। সেই

সিন্ধু শীতল ধারায় দেবগণের ক্লান্তি দূর হল।

কিন্তু ক্রমে দীর্ঘকালব্যাপী জলধি মন্থন চললে ঘর্ষণ ও বিকর্ষণ জনিত বেদনায় বাসুকির গর্জনে কেঁপে উঠল ত্রিভুবন। দৈত্যরা বিষের জ্বালায় মরল অনেকে। আবার অন্যদিকে সাগরের জলমধ্যে মন্দরের প্রবল আন্দোলনে জলধিপতি ত্রাসে কম্পমান। জলচর বহু প্রাণী এই জলতাণ্ডবে প্রাণ হারালো। এদিকে গিরি বৃক্ষগুলিতে ঘর্ষণে ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হল এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে স্থলচর পর্বতবাসী সব প্রাণী জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখে ইন্দ্র মেঘমালাকে আজ্ঞা দিলেন বর্ষণধারা ঢালতে। বৃষ্টি অগ্নি নির্বাপিত করল—ঔষধ উৎপাদক তরুরাজি থেকে রস নিয়ে জল সমুদ্রে পড়লে সেই জল পান করে জলচর প্রাণীরা জীবন লাভ করল।

দেবদৈত্য প্রাণপণে জলধি মন্থন করতে লাগলেন। কিন্তু পরিশ্রমই হল সার—অমৃত উঠল না—লক্ষ্মীও নির্গতা হলেন না। সকলের শক্তি হল নিঃশেষিত—ক্লান্তি ও অবসাদে সবাই পর্যুদস্ত। দেবদৈত্য অশক্ত হয়ে পড়েছে এই সংবাদ ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জানালেন এবং তাঁকে বললেন যে, বিষ্ণু-শক্তি ব্যতীত সমুদ্র মন্থন সম্ভব নয়। তখন নারায়ণ দেবতাদের নারায়ণী শক্তিতে সঞ্জীবিত করলেন। আবার শুরু হল সিন্ধু মন্থন। তার ফলে আচম্বিতে চন্দ্রের উদ্‌গমন হল :—

> "সুধাংশু ষোড়শ কলা নামধরে সোম।
> দুইলক্ষ যোজনে করিল স্থিতি ব্যোম॥
> দরশনে সকলের হৈল পরিতৃপ্তি।
> যোজন পঞ্চাশ কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে দীপ্তি॥"

চন্দ্রের উৎপত্তিতে সুরাসুর নর হর্ষ লাভ করল। আবার সমুদ্র-মন্থনে তৎপর হলেন দেবদৈত্যগণ। এবার সাগর গর্ভ হতে উত্থিত হল ক্রমান্বয়ে গজশিরোমণি ঐরাবত—শ্বেত অঙ্গ তার চতুর্দন্ত আকারে পর্বততুল্য। তারপর অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা পারিজাত বৃক্ষ জন্মে সুরপুরীর শোভা বর্ধন করল। এরপর অমৃতের কুম্ভ কাঁধে নিয়ে উঠলেন বৈদ্য শ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি! এত সম্পদ ও রত্নরাজির প্রাপ্তি দেখে আরও একবার সিন্ধু মন্থন করা হল। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস উঠল—উথাল পাতাল হল সমুদ্র—বরুণরাজ ক্ষীরোদ সমুদ্র মধ্যে মন্দরের আন্দোলন সহ্য করতে পারলেন না। তখন মন্ত্রী তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, কমলা নামে যে কন্যারত্ন কমলকাননে জন্মেছে সেই কন্যাকে চক্রপাণি বিষ্ণুকে অর্পণ

করতে। কমলা লক্ষ্মী দেবী—শাপভ্রষ্টা হয়ে সমুদ্রে লুকিয়েছেন—এঁকে লাভের জন্যেই সমুদ্র মন্থন। লক্ষ্মী লাভ হলে বিষ্ণু সমুদ্র মন্থনের দেব-দৈত্যগণকে নিবারিত করবেন। এই কথা শুনে জলেশ কমলাকে বিষ্ণু হস্তে অর্পণ করে বললেন, "এবার সিন্ধু মন্থন নিবারণ করুন প্রভু, আমি বড়ই ক্লেশ অনুভব করছি।" লক্ষ্মীকে যখন পাওয়া গেল, স্বর্গের ঐশ্বর্য যখন ফিরে এল তখন আর সমুদ্র মন্থনে কি কাজ। বিষ্ণু জলধি-পতি বরুণের ক্লেশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং সমুদ্র মন্থনে নিবারিত হতে বললেন সকলকে।

এদিকে অলক্ষ্যে দেবর্ষি নারদ আর এক কাণ্ড বাধিয়েছেন। জলধি মন্থনের খবরটা দেব-দৈত্য যক্ষ-রক্ষ কিন্নর-নর সকলে জানলেও কৈলাসে সে খবর যায়নি। মহাদেবকে দেবগণ জানাননি খবরটা। দেবর্ষি নারদ সমুদ্র মন্থন দেখতে দেখতে ভাবলেন খবরটা শিবকে জানানো দরকার—দেবতাদের মধ্যে একটা গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে মজা দেখা যাবে। এই ভেবে তিনি ঢেঁকি বাহনে উড়ে গেলেন কৈলাসে। সেখানে শিব-পার্বতী এক শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করে আত্মসমাধিমগ্ন ছিলেন। "জয় জয় শঙ্কর, জয় জয় শঙ্করী" বলে নারদ তাঁদের সম্মুখস্থ হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন। দেবী দুর্গা আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, "কোথা থেকে আসছেন দেবর্ষি? কি সংবাদ সুরপরীর?" ব্রহ্মানন্দন বললেন, "জননি! আমার পক্ষে সংবাদ বড়ই ক্লেশকর। সুরপুরী গিয়েছিলাম, দেখলাম বিরাট ব্যাপার চলছে—সমুদ্র মন্থন করছেন দেবতা-দৈত্যে মিলে বিষ্ণুর আজ্ঞায়। জলধি মন্থনে উঠেছে অমূল্য বৈভবরাজি—বিষ্ণু পেয়েছেন ষড়ৈশ্বর্যশালিনী কমলাকে—কৌস্তুভমণিও হয়েছে তাঁর অধি-গত। ইন্দ্র নিয়েছেন করী-শ্রেষ্ঠ ঐরাবত ও অশ্বপতি উচ্চৈঃশ্রবা। দেব-দৈত্যরা অধিকারী হয়েছেন নানা রত্ন মাণিক্যের। আর সাগর থেকে উঠেছে অমরত্বের আশ্বাস নিয়ে অমৃত কুম্ভ। নরলোক পেয়েছে নানাবিধ ঔষধি বৃক্ষ ও ধাতু। হে জননি! আমার শুধু দুঃখ যে, আপনারা কেউ কিছু পেলেন না—এমন কি আপনাদের এই সংবাদটুকু জানাবার প্রয়োজনটুকুও কেউ মনে করল না! যিনি দেবাদিদেব মহেশ্বর ত্রিভুবনের অধিশ্বর, তাঁর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা দেখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না—কৈলাসে ছুটে এলাম।"

নারদের কথা শুনে শিব মৃদু হাসলেন। তিনি জানেন সবই। ঐ সব মণিমুক্তা-অমৃত-ঐরাবত এসবে তাঁর হবে কি? সবই তো তাঁর—

তিনি ত্রিলোকনাথ। এ সব নিয়ে মাতামাতি দেবতাদের ছেলে-মানুষী ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু শিব উপেক্ষা করলেও শিবজায়া দেবতাদের এরূপ আচরণে কুপিতা হয়ে উঠলেন এবং তাঁর যত অভিমান গিয়ে পড়ল পতির ওপর। নারদকে উদ্দেশ্য করে শিবকেই যেন বললেন দুর্গা, "দেবর্ষি, আপনি কাকে একথা বলছেন—ত্রিকালজ্ঞ মহেশ্বরকে? উনি তো সবই জানেন। জেনে শুনে উদাসীন হয়ে আছেন; যাঁর কণ্ঠ-বিভূষণ হাড়ের মালা তাঁর কৌস্তুভ মণিতে কি কাজ, যাঁর অঙ্গ বিভূষণ রজঃ তাঁর চন্দনে কি হবে—যাঁর বলদ বাহন তাঁর ঐরাবত কি দরকার? সবই তো আমাদের জিনিস, তাই কোন বস্তুতে আমাদের স্পৃহা নেই—কিন্তু তা বলে দেবতারা কোন ঘটনা জানাবে না আমার পতিকে—যিনি দেবাদিদেব মহাদেব? এ সবই হয়েছে শঙ্করের অতিরিক্ত উদাসীনতায়।" অভিমানে পার্বতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

পার্বতীর অন্তরে কাতরতা উপলব্ধি করে আশুতোষ হঠাৎ রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি বুঝতে পারেন, পৃথিবীর কলুষ হরণ করার সময় এসেছে। তাঁর ক্রোধে সমস্ত জগৎ থর থর করে কম্পিত হতে থাকে। নারদ ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝে প্রস্থান করেছেন। ডমরু ত্রিশূল হাতে নিয়ে শিব রুদ্র মাতন নৃত্যের তালে তালে তড়িৎ বেগে উপস্থিত হলেন দেব-দৈত্যদের মাঝে, যেখানে সমুদ্র মন্থন সবেমাত্র শেষ করে তাঁরা বিশ্রামে রত। শিবকে দেখে দেব দৈত্যগণ সকলে করযোড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শিব তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা ক্ষান্ত কেন দেবাসুরগণ? মন্থন করো সমুদ্র, দেখি কি সম্পদ উত্থিত হয়।"

ইতস্ততঃ করে ইন্দ্র মহাদেবকে জানালেন, "দেব, হৃষীকেশের আজ্ঞায় আমরা মন্থন কার্য বন্ধন করেছি।"

ব্যস, অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। এমনিতেই রেগেছিলেন ধূর্জটি, ইন্দ্রের বাক্য শুনে যেন সুতপ্ত লৌহবৎ হয়ে উঠলেন, পরুষ কণ্ঠে বললেন, "এত অহংকার হয়েছে তোমাদের? আমাকে অবহেলা কর। না জানিয়ে সাগর থেকে মন্থন করে রত্নরাজি তুলেছ তোমরা, সুধাও লাভ করেছ, আরও কত সম্পদ প্রাপ্তি হয়েছে—আর সবই করেছ আমার অগোচরে—এই তোমাদের শিষ্টাচার! যাক যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমি বলছি তোমাদের পুনরায় সাগর মন্থনে উদ্যোগী হতে হবে।"

মহেশ্বরের কথার উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে পারলেন না। সকলে ভয়ে নীরব হয়ে থাকলেন। তখন মহামুনি কশ্যপ যোড় করে মহাদেবকে ক্ষীরোদ সাগর মন্থনের কারণ বর্ণনা করে নিবেদন করলেন। যখন লক্ষ্মীলাভ হয়েই গেছে তখন অনুগ্রহ করে মহাদেব পুনরায় সাগর মন্থনের ইচ্ছা সংবরণ করুন। তাছাড়া দেবতারা এখন প্রচণ্ড পরিশ্রমে অশক্ত, ক্লান্ত, জলের ওপরেও অনেক উপদ্রব ঘটেছে, মন্থন রজ্জু নাগরাজ বাসুকিও ভীষণরূপে পর্যুদস্ত—তাঁর শরীরের হাড়-গোড় ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ প্রায়। এইসব বিবেচনা করে তিনি ক্রোধ সম্বরণ করুন এবং সকলের প্রতি করুণা পরবশ হোন।

কশ্যপের কথা শুনে আশুতোষ ঈষৎ হেসে বললেন, "মুনিবর, আপনার কথা শুনে সবই অধিগত হলাম। কিন্তু এখানে আমার আগমনের এক বিশেষ হেতু আছে। আমার জন্য অন্ততঃ একবার সমুদ্র মন্থন করতে হবে এবং যে বস্তু উত্থিত হবে তা সমস্তই আমার।"

শিববাক্য লঙ্ঘন করার সাধ্য কারো নেই। সুরাসুরে পুনরায় মন্থন কার্যে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু সুরাসুর সকলে এখন শক্তিহীন—সামান্য শ্রমে সকলে হাঁপিয়ে উঠছেন—ঘন ঘন নিশ্বাস বইছে তাঁদের নাসিকা মুখগহ্বর থেকে, এবং ঐ নিশ্বাস অগ্নিসম উত্তপ্ত—ঘর্ষণে ঘর্ষণে মন্দর পর্বত জ্বলন্ত অঙ্গার মত তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং সে তপ্ত হাওয়াও চারিদিক পরিব্যাপ্ত করেছে। আন্দোলিত সাগর জল ভয়ানক তপ্ত হয়ে উঠেছে, অগ্নিসম গরম বাষ্পীভূত বাতাস চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছে এবং সর্বোপরি কাতর নাগরাজ বাসুকির শরীর প্রচণ্ডভাবে জর্জরিত হল—তাঁর মুখ থেকে আতপ্ত গরল নির্গত হতে থাকল—রক্তে ক্ষীরোদ সাগরের জল লাল হয়ে উঠল। এই প্রচণ্ড অগ্নিসম বিষবাষ্প ও অগ্নির ঝলক আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল—সমস্ত ত্রি-জগৎ ঢেকে গেল। বিষজ্বালায় পুড়ে পুড়ে জ্বলে জ্বলে জগৎ সংসার ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগল। দেবাসুর-কিন্নর-নর সকলে শিবস্তুতি করে বলতে লাগলেন, "তুমি রক্ষাকর্তা, তুমি মঙ্গল-কারক, হে ভূতনাথ—আমাদের ত্রাণ করো প্রভু। তুমি বিদ্যমান থাকতে জগৎ কি ধ্বংস হবে—তুমি শিব মঙ্গলবিধায়ক, তুমি রুদ্র, অশুভের সংহারক।" বিষণ্ণ বদনে মহাদেব চাইলেন চতুর্দিকে—প্রবল বিষের দাহনে ত্রিজগৎ জ্বলে যাচ্ছে। তিনি তো সমুদ্র মন্থন করতে আদেশ করেছিলেন—পৃথিবীর পুঞ্জীভূত কলুষকে নিঃশেষ করবেন তিনি। নিজে বলেছেন, জলধি মন্থনের উৎপন্ন বস্তু তাঁর। শিব অঙ্গীকার পালন করবেন।

হলাহলকে অবলুপ্ত করবেন তিনি। মনে মনে এই স্থির করে মহাযোগী মহেশ্বর যোগবলে সমস্ত পরিব্যাপ্ত বিষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন এবং গণ্ডুষে গলাধঃকরণ করে কণ্ঠে স্থাপন করলেন। তাঁর কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হয়ে গেল—বিষপান করে শিব হলেন নীলকণ্ঠ।

মহাদেবের এই অত্যদ্ভুত যোগবিভূতি দেখে আশ্চর্য হল ত্রৈলোক্যের দেবাসুর-কিন্নর-নর সকলে। তারা কৃতাঞ্জলি হয়ে হরের স্তবগান গাইল—তুমি সর্বেশ্বর, তুমি মহেশ্বর, তুমি দেবাদিদেব মহাদেব—তোমাকে প্রণাম করি।

এরপর শিব দেবগণকে বললেন মন্দর পর্বতকে যথাস্থানে স্থাপন করতে—কিন্তু দেবতারা পর্বতকে তুলতে অক্ষম হলে মন্দরকে তুললেন শেষনাগ বাসুকি এবং তাকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

এই হল ক্ষীরোদ সিন্ধু মন্থন বৃত্তান্ত। অবশ্য এর পরের ঘটনা সুধার জন্য দেবাসুরের যুদ্ধ—বিষ্ণুর মোহিনীবেশে আগমন, শিবের সঙ্গে তাঁর মিলন। মোহিনীবেশে বিষ্ণুর দৈত্যগণকে ছলনা এবং দেবতাদের অমৃত দান। এগুলি অনেকেরই জানা ঘটনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় বিশদভাবে উল্লেখ করা হল না।

অর্ধনারীশ্বর শিব

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির একস্থানে শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপের উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি মন্ত্রে এর ছায়াপাত ঘটেছে দেখা যায়। মন্ত্রের একস্থানে বলা হয়েছে "উমার সাথে যিনি বর্তমান···সেই রুদ্রকে (শিবকে) নমস্কার।"

কিন্তু অর্ধনারীশ্বর শিবের কথা শিবপুরাণেই বিশদভাবে রূপায়িত হয়েছে। শিবপুরাণোক্ত কাহিনীটি বড় মনোরম ও তাৎপর্য পূর্ণ।

চতুরানন ব্রহ্মা সৃজন-দেবতা, কিন্তু সৃষ্টি-রহস্যের ঠিকানা বুঝি প্রচ্ছন্ন রয়েছে শিব-শক্তির মিলিত রূপ অর্ধনারীশ্বর মূর্তি কল্পনার মধ্যে। জগতে মৈথুন-সৃজনের মধ্য দিয়ে বংশ সঞ্চারণের সঙ্গে প্রাণশক্তির পরিক্রমা চলছে অনাদিকাল ধরে। জগৎ সৃষ্টি ও তার রক্ষার জন্যই বুঝি ঈশ্বরের এই লীলা—তাঁর বহু হওয়া।

ঈশ্বর যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে পরমব্রহ্ম বলি আবার যখন তিনি লীলা-চঞ্চল তখন তিনিই মহাশক্তি স্বরূপা আদ্যাশক্তি মহামায়া—পরমা প্রকৃতি। পরমাশক্তি বা পরমা প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই শক্তিরূপ—একই অঙ্গে দুই রূপ-বিকাশ—একটি আধার অন্যটি আধেয়। এরই যোগে চলেছে সৃষ্টি লীলা যাকে মহাশক্তির অভিব্যক্তি ছাড়া আর কি বলা যায়। পরমব্রহ্ম বা পরমপুরুষ নিস্পৃহ নিরাসক্ত—নিষ্ক্রিয় বা জড় বলে প্রতিভাত। যখন তাঁর শক্তি তাঁর মধ্যে সমাহিত আবার তিনিই চৈতন্যময়,—লীলা-চঞ্চল যখন তাঁর শক্তি অভিব্যক্ত।

জাগতিক স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক ও মৈথুন সৃষ্টিচক্র রহস্যময়। চেতনার স্থূল স্তর থেকে সূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছে মানুষ শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপাভিব্যক্তির মধ্যে এ রহস্যের ঠিকানা কি খুঁজে পেয়েছে?

শিবপুরাণের কাহিনীর মধ্যে শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপ সম্পর্কে আশ্চর্য কথা বিধৃত রয়েছে। ঘটনাটি এইরূপ: সৃজন কর্তা ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করলেন কিন্তু তাঁর সৃষ্ট প্রাণীকুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে না দেখে তিনি চিন্তিত হলেন। জগৎ সৃষ্টির পর জগতের প্রতিভূ ও যা কিছু তিনি সৃষ্টি

করেছেন সবই হয় তাঁর মানস সৃষ্টি, নয়ত তপস্যাকৃত সৃষ্টি নয়ত বা অন্য কোন উপায়ে সৃষ্টি। কিন্তু একটি চলমান সৃষ্টিচক্র রচনা করতে না পারলে সৃষ্টির ক্রমবৃদ্ধি হচ্ছে না আর ঈশ্বরের লীলা-লহরীও স্ফূর্তি পাচ্ছে না। চিন্তিত বিধাতা যখন ভাবনার ভারে ন্যুব্জ তখন অন্তরীক্ষ থেকে ধ্বনিত হল এক অনাদি বাণী, বুঝি ব্রহ্মারই আন্তর ভাবনার উত্তর। আকাশে-বাতাসে অনুরনিত হয়ে ফিরল সেই মহাবাণী, "মৈথুন শক্তির অভিব্যক্তিতেই হবে সৃষ্টির বৃদ্ধি ও সৃষ্টির রক্ষণ। সৃষ্টির দ্যোতক বিপরীত শক্তির মিলনেই যার ফলসিদ্ধি।"

ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টি বৃদ্ধির সূত্র খুঁজে পেলেন। কিন্তু ঐ মহাবাণীর রূপ দেবেন তিনি কিভাবে? তিনি কিছুই স্থির করে উঠতে পারেন না। দেবাদিদেব মহাদেব স্ত্রী-রূপ অনুমোদন না করলে তো মৈথুন-সৃষ্টির পরিকল্পনা হতে পারে না। তিনি স্বয়ম্ভু—তাঁর প্রভাব বিনা ব্রহ্মা এই রূপ সৃষ্টি করতে পারেন না। এইসব চিন্তা করে বিধাতা মহাদেবের আরাধনায় রত হলেন। পার্বতীরূপে মহাশক্তি মহেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হৃদয়ে এই চিন্তা নিয়ে ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন।

ব্রহ্মার দুশ্চর তপস্যায় অনাদিদেব শিবের ধ্যান ভাঙ্গল—তিনি প্রসন্ন নয়ন উন্মিলিত করলেন। তারপর ত্রিলোকনাথ শিব প্রসন্ন হাস্যে অনন্ত জ্যোতিঃ সমুদ্রের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে বিধাতা ব্রহ্মার সমক্ষে তাঁর কামপ্রদায়িনী মূর্তিতে প্রবেশ করে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত হলেন। শিবের এই অপূর্ব দ্বৈতরূপ দর্শন করে অভিভূত ব্রহ্মা যুক্তকরে ভক্তি-বিনম্র কণ্ঠে শিব-বন্দনা করলেন।

"হে দেবাদিদেব ত্রিলোকনাথ মহেশ! এই সমুদয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে ওতঃপ্রোত, আপনি এই বিশ্বের কারক আবার এর কারণও আপনি। আপনার অভিলাষেই আমি সৃষ্টি কার্যে ব্যাপৃত। বিশ্বেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হয়ে সৃষ্টির বৃদ্ধির জন্য আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

বরহস্ত উত্তোলন করে মহেশ্বর মেঘমন্দ্র স্বরে ব্রহ্মাকে বললেন, "চতুরানন! আপনার মনের ভাবনা আমার গোচর হয়েছে। আমি পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্বও এই মূর্তিতে প্রকাশ করলাম। আপনি প্রজাবৃদ্ধির জন্য যে পরিকল্পনার কথা চিন্তা করছেন তা আমারই অভিলায জানবেন। আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হোক, আমি এই বর প্রদান করছি।"—

শিবের মুখনিঃসৃত এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্ময় মূর্তির অর্ধ-ভাগে শিব-শক্তি প্রকটিত হলেন শিবারূপে—শিব থেকে শিবা পৃথক-

রূপে প্রতিভাত হলেন একই বরাঙ্গে।

পরম বিস্ময়ে মহেশ্বরের শক্তিকে মহামাতৃসত্তায় রূপায়িত হতে দেখে ব্রহ্মা পুলকিত প্রাণে ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে দেবীর বন্দনা করলেন এবং বললেন, "হে জগজ্জননি পরমাশক্তি ভগবতি! দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে আমার সৃজন-দায়িত্ব। মহেশ্বর সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা, আমি প্রজাসৃষ্টির ব্যাপারে নিয়োজিত; কিন্তু মা, পুনঃপুনঃ প্রাণী সৃষ্টি করেও সৃষ্টি বৃদ্ধির ব্যাপারে আমি অপারগ হয়েছি। এখন জীবের মধ্যে মৈথুন-ক্রিয়া দ্বারা জীব সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টির বৃদ্ধি ও রক্ষার অভিলাষী হয়েছি। পুং ও স্ত্রী শক্তির মিলনেই এ সম্ভব। ধরাধামে অদ্যাবধি নারীকুলের প্রকট হয়নি আর আমার এই সৃজন-শক্তি আপনার কৃপা বিনা আয়ত্তসাধ্য নয়। হে জগদম্বে! আপনি আদ্যাশক্তি মহামায়া—সকল শক্তির আধার। অতএব মহেশ্বরি, আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, কৃপা করে আমাকে নারী সৃষ্টির ক্ষমতা প্রদান করুন। আপনাকে বারংবার প্রণতি জানাই।"—

দেবীকে এই ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে চতুরানন ব্রহ্মা নীরব হলেন। ক্ষণবিরতির পর দেবীর ফুল্ল মুখপানে চেয়ে মিনতি-কণ্ঠে আবার বললেন, "অম্বিকে! এক উত্তম শক্তি দিয়ে সমস্ত চরাচরের বৃদ্ধির জন্য আপনি আমার পুত্র দক্ষের কন্যারূপে আবির্ভূতা হোন, আমি আপনার পদাম্বুজে এই প্রার্থনা করি।"—ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনে ভগবতী স্মিতহাস্যে বললেন—"আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে।"—

এই কথা বলে ভগবতী তাঁর শক্তি দ্বারা ললাটের মধ্য বিন্দু হতে তাঁর নিজ রূপ-সদৃশ অন্য এক নারী মূর্তির সৃষ্টি করলেন—দিব্যজ্যোতি-ময়ী কমনীয় নারী মূর্তি।

লীলাময় শিব ঐ দিব্য মূর্তি অবলোকন করে ভগবতীর উদ্দেশ্যে বললেন, "মহেশ্বরি, প্রতীতি হচ্ছে যে, ব্রহ্মার আরাধনায় তুমি পরম সন্তোষ লাভ করেছ। এখন তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।"

দেবী মহাদেবের কথানুসারে তাঁর দেহ নির্গত অংশ মূর্তি দক্ষের কন্যারূপে আবির্ভূতা হবে এ অঙ্গীকার করলেন। তারপর পুনরায় অন্য অর্ধভাগে অর্থাৎ শিবতনুতে প্রবেশ করে সমাহিত হলেন। ব্রহ্মা এই-ভাবে মৈথুন-সৃষ্টির প্রেরণা পেলেন শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপের মধ্য দিয়ে।

পরমপুরুষ মহেশ্বরের শক্তিরূপ পরাশক্তি বা পরমা প্রকৃতি—যিনি পরমপুরুষে ওতঃপ্রোত—যিনি সৃষ্টিলীলার দ্যোতক—যিনি শিবের সঙ্গে

অভিন্ন। শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপের ব্যঞ্জনা মনে হয় এটাই। জাগতিক প্রাণীকুলের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি, সৃষ্টির প্রেরণায় পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পরের আকর্ষণ—প্রাণের পূর্ণতার জন্য পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষা।—সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শক্তির বিকাশ। পুরুষ যেন একা পূর্ণ নয়, স্ত্রী যেন একা সম্পূর্ণতার ছবি। এটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের ক্ষেত্রে। সৃষ্টি রক্ষা ও ঈশ্বরের লীলা-বিলাসের জন্যই বুঝি প্রাণীকুলে স্ত্রী-পুরুষের এই শ্রেণী বিভাগ—একে অন্যের পরিপূরক। মনে হয় ঈশ্বরের লীলা বিলাসে কেবল প্রাণীর পুংসত্তা পূর্ণ নয়, শুধুমাত্র স্ত্রী-সত্তাও পূর্ণ নয়—এক যেন অন্যের অর্ধভাগ। মানুষের আধ্যাত্মিকবোধে এই ধারণা বড় প্রাঞ্জল। তাই পুরুষের শক্তি নারী আর নারীর আধার পুরুষ—আমাদের এ ধারণা বড়ই ব্যঞ্জনাময়।

পরমেশ্বর শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপের কল্পনা কি মানুষের সত্যোপলব্ধির এই আলোকেই উদ্ভাসিত হয়েছে?

শিব-পার্বতী সংসার

অনাদিদেব জ্যোতির্ময় শিব নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত পরমব্রহ্মেরই প্রতীক. তাই তাঁর এক নাম স্থাণু। তিনি একম্ অদ্বিতং পরম পুরুষম্—তিনি পরমেশ্বর।

তাঁরই শক্তি হল তাঁর সক্রিয়তা যাঁকে বলা হয় পরাশক্তি বা পরমা-প্রকৃতি। পরমব্রহ্ম যেমন শিবরূপে কল্পিত তাঁরই লীলা-বিলাসের ভূমিকায়, তেমনই ব্রহ্মের শক্তি শিবজায়ারূপে কল্পিতা। শিব পরম-পুরুষ—অনন্ত শক্তির ধারক। তিনি শান্ত ও সমাহিত, তাই গুণাতীত। একক ব্রহ্মের পরিচয় বহন করছেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীরূপিণী শক্তিকে অবলম্বন করেই তাঁর প্রকাশ। আর শক্তি সৃজনশীল, বহুগুণের আধার—গতিশীল অর্থাৎ চঞ্চল। তাই শিব ও শক্তির একান্ত সংমিশ্রণে পরমেশ্বর উপলব্ধ হয়। শিব ও শক্তি অভেদ যা অর্ধ-নারীশ্বররূপে অনুভাবিত।

পুরাণাদি শাস্ত্রানুসারে দেবাদিদেব মহাদেবের শক্তি অর্থাৎ ভার্যা হিসাবে কল্পিতা জগজ্জননী মহাদেবী পার্বতী। ত্রিলোকনাথ মহেশ্বর ও বিশ্বজননী মহেশ্বরীর সংসার কৈলাস পর্বত শিখরে—শিবালয়ে। দেবা-দিদেব মহাদেব, জগন্মাতা দুর্গা, দেব সেনাপতি কার্তিকেয়, সর্বসিদ্ধি-দাতা দেবশ্রেষ্ঠ গণপতি যাঁরা শিবদুর্গার সন্তান বলে কল্পিত—এই দেব পরিবার নিয়ে শিবের সংসার। এছাড়া আছে অনুচর নন্দী, ভৃঙ্গী। ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মীদেবী ও সরস্বতীদেবীকেও শিব-দুর্গার দুহিতা বলে কল্পিত করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে ভারতবর্ষের সর্বক্ষেত্রে একমত প্রচলিত নেই।

শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপ বা শিব-শক্তির কল্পনা যেমন জগতের সৃষ্টি-রহস্যের ইঙ্গিত দেয় তেমনি সমাজবদ্ধ মানবের পারিবারিক সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবেরই যেন এক মিলিত প্রতিচ্ছবি শিবের সংসারে। বস্তুতঃ শিব ছাড়া এই প্রপঞ্চময় জগতের অস্তিত্ব নেই—ঈশ্বরেরই জগৎ, জগতে ঈশ্বরই ওতঃপ্রোত। তাই বিশ্ব-চরাচর সবই যেন শিবের সংসার।

পুরাণের কথা-কাহিনীর মধ্যে শিব-দুর্গার পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। যেখানে শিবের অংশীভূত শক্তিসত্তা দেব-দেবীর রূপ পরিগ্রহ করে বিরাজমান। মানব-পরিবারকে কেবলমাত্র সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধতেই নয়, ঈশ্বরীয় আলোকে তার মূল্যায়ন করতেও বুঝি শিব পরিবারের পরিকল্পনা। যেখানে ঐহিক সুখ ও পারত্রিক শান্তির বার্তাই শুধু প্রতিফলিত নয়, প্রচ্ছন্নভাবে এক ভূমা-চেতনাও রয়েছে। যা সত্য-শিব-সুন্দরের ছবিই বহন করে। তাছাড়া হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের পিতৃমাতৃরূপ কল্পনার এক চরম পরিণতি বলা যায় শিব-শিবানীব এই সংসার কল্পনা।

পুরাণের কাহিনী মত পিতৃগৃহে দেহত্যাগের পর সৃষ্টি বৈষম্য দূর করতে সতী পুনর্জন্ম নিলেন হিমালয় দুহিতা পার্বতীরূপে। সতীহারা শিবকে চরম বৈরাগ্য থেকে মুক্ত করে সৃষ্টি রক্ষা করা ও সৃষ্টি বৈষম্য দূর করার জন্য শিব-পার্বতী মিলনের প্রয়োজন অনুভূত হল। হৈমবতী গৌরী অর্থাৎ পার্বতী শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করে তাঁকে পতিরূপে পেলেন। সে সময় প্রবল পরাক্রান্ত তারকাসুরের অত্যাচারে ত্রিলোক ত্রাহি ত্রাহি করছে, বিশেষ করে দেবকুল প্রচণ্ডভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জ্ঞাত হয়ে দেবগণকে জানালেন যে, একমাত্র শিবাত্মজই তারকাসুরকে বধ করতে সক্ষম। দেবতারা সকলে আরাধনা করলেন মহাদেবের—কামনা করলেন শিবপুত্রের। জন্ম হল কার্তিকেয়র। কার্তিকেয়র জন্মবৃত্তান্ত পুরাণ থেকে যা আহরণ করা যায় তা হল :—

পার্বতী শিবকে পতিরূপে লাভ করার পর পতির সঙ্গে কৈলাস শিখরে শিবালয়ে বাস করছেন। অসীম আনন্দে বিভোর হয়ে মহাদেব পার্বতীসহ জগৎচিন্তায় ধ্যানমগ্ন। ক্রমে কিশোরী উমা যৌবনবতী হলেন। মন্দাকিনী তীরে তিনি যে স্থানে ঋতু স্নান করে উঠলেন সেই পুণ্যস্থান গৌরীতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হল। তারপর গৌরী পুত্র কামনায় ব্যাকুল হলেন। শিব-আসঙ্গ বিহ্বল পার্বতী শিবকে কামাবেগে আকুলচিত্ত করলেন। প্রকৃতি মধু বসন্তে ফুল্ল হল। শিব-দুর্গা বহুকাল রতিরঙ্গে আনন্দ সাগরে মগ্ন রইলেন। প্রেমবিহ্বল মহাদেব কামোত্তেজিত হলে তাঁর রেতঃপাত ঘটল কিন্তু দুর্গা সইতে পারলেন না বীর্য তেজ, তাঁর অঙ্গ হতে গঙ্গা জলে পড়ে গেল শিব রেতঃ। গঙ্গাও সইতে পারলেন না শিব বীর্য তাপ। প্রচণ্ড ত্রাসে তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠল। তিনি শিব বীর্য ভাসিয়ে নিয়ে রাখলেন এক শরবনে। সেখানে শুভদিনে ষড়-আননবিশিষ্ট শিবকুমারের জন্ম হল। বিশ্ব-চরাচরে

ঘোষিত হল সে বার্তা। চন্দ্রের কর্তিকা প্রভৃতি ছয়পত্নী সুলক্ষণ শিশুকে দেখে আদর করে কোলে তুলে নিলেন। শিশুটিকে কোলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্তনে অমৃত-দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল। ছয় চন্দ্র-জায়া শিশুর ছয় মুখে স্তন দিলেন। শিব কুমার বড় হতে লাগল। চন্দ্রপত্নী কর্তিক সর্বাগ্রে শিশুকে ক্রোড়ে নিয়ে স্তন দান করে ছিলেন বলে শিবকুমারের নাম হল কার্তিকেয়। এইভাবে শিব-দুর্গার পুত্র কার্তিকেয়ের জন্ম হল, যাঁকে দেবতারা শিবের অনুমতি নিয়ে দেবসেনাপতি পদে বরণ করলেন। এবং শিবের আনুকূল্যে সর্ব দেবতার অস্ত্র উপহার নিয়ে দেবসেনাপতি মহাসেন কার্তিকেয় মহাবল তারকাসুরকে প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাজিত ও বধ করে দেবতাদের ত্রাসমুক্ত করলেন।

শিব-পার্বতীর কনিষ্ঠ পুত্র গজানন গণেশ যাঁর পূজা সর্বাগ্রে না করলে অন্য দেব-আরাধনার ফল পাওয়া যায় না। শিববরে গণেশ সর্বসিদ্ধি-দাতারূপে স্বীকৃত ও মান্য।

গণেশ দুর্গার অঙ্গজ। পুরাণে কথিত যে, পুত্রাভিলাষিণী জননী পার্বতীর অঙ্গরাগ থেকে গণেশের উৎপত্তি হয়েছে।

দেবসেনাপতি কার্তিকেয় ও দেবশ্রেষ্ঠ গণপতি তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিজ নিজ গরিমা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিব গরিমাই ব্যক্ত করেছেন।

লক্ষ্মীদেবী ও সরস্বতীদেবী এঁদের দুজনকে শিব-পার্বতীর দুহিতা হিসেবে ভারতের কোন কোন স্থানে কল্পনা করা হয়েছে একথা পূর্বেই উল্লেখ করা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে শরৎকালে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং বসন্ত-কালে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা অনুষ্ঠানগুলি বড় মনোরম ও তাৎপর্যপূর্ণ। জগজ্জননী দুর্গা তাঁর পুত্র-কন্যা ও অনুচরবর্গ নিয়ে পিত্রাবাসে আগমন করেন—সঙ্গে আসেন দেবাদিদেব মহাদেবও। তাঁদের সকলকে আবাহনের মাধ্যমে আমরা সংসারের সুখ-শান্তি-ঐশ্বর্য-জ্ঞান ও প্রেমে মণ্ডিত হয়ে আনন্দে হিন্দোলিত হয়ে উঠি, জীবনের সার্থকতায় দেবতাদের প্রিয় করি—দেবতার হই। মনে হয়, এখানেই শিব-পার্বতীর সংসার-কল্পনা সার্থক। শিবত্ব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় এই শিব-সংসারই আমাদের আকাঙ্ক্ষনীয়।

শিব-সংসারে পরমেশ্বর শিবই মূল বীজ। তাঁর শক্তি বা কর্মপ্রেরণা অর্থাৎ সক্রিয়তা হলেন ভার্যা-স্বরূপা পার্বতী বা দুর্গা যিনি দুর্গতি-

নাশিনী বিঘ্ন-বিনাশিনী অন্নপূর্ণা, যিনি আবার শিবের সঙ্গে একাত্ম। সংসারে ভয়হীনতা অর্থাৎ বীর্যময়তা বা বীরত্ব, বিজ্ঞতা, শ্রী, প্রজ্ঞা বা আত্মজ্ঞানই পরমানন্দ বা চৈতন্যকে লভ্য করাতে পারে। বীরত্বের প্রতিভূ কার্তিকেয়, বিজ্ঞতার প্রতিভূ গণেশ, শ্রী বা ঐশ্বর্যের প্রতিভূ লক্ষ্মী ও আত্মজ্ঞানের প্রতিভূ সরস্বতী। এ সবই শিব-দুর্গা প্রসূত।

মনে হয়, শিব-পার্বতীর সংসার কল্পনা এ চিন্তাদর্শেই রূপায়িত।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গাবতার ও তাঁদের মাহাত্ম্য
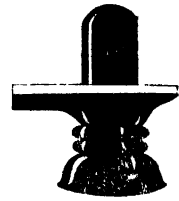
পরমপুরুষ দেবাদিদেব যিনি বিশ্ব-চরাচরে পরিব্যাপ্ত—বিশ্বের অবয়ব স্বরূপ—বিশ্ব যাঁর লীলাভূমি, যিনি আমাদের জনম-জীবন-মরণ বিধাতা, তাঁকে প্রতীকাকারে শিববাদীরা ঘরের দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিম এই সীমা ঘিরে শৈবধর্ম প্রচার করেছেন। হিসেব না জানা বহুযুগের ওপার থেকেই প্রচলিত হয়ে এসেছে শিব-কথা খুব স্বাভাবিকভাবেই ; যার বহুল প্রচার হয়েছিল পৌরাণিক যুগে। কালপরিক্রমায় এর রূপ-রূপান্তরও ঘটেছে অনেক। ভারতবর্ষে সেই অনাদিকাল থেকেই প্রায় সর্বত্র শিব-ক্ষেত্র বা শিবতীর্থ গড়ে উঠেছে শৈবধর্মমতের কেন্দ্রভূমি হিসেবে। এইরকম বহু সুপ্রসিদ্ধ শিবক্ষেত্রের সৃষ্টির ইতিহাস আজ অজ্ঞাত—কোন কোনটির ক্ষেত্রে প্রবাদ আছে যে, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবই মানব-কল্যাণের জন্য ঐ স্থানগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই শিব-ক্ষেত্রগুলির মধ্যে দ্বাদশ শিবক্ষেত্র সমধিক প্রসিদ্ধ। এই স্থানগুলিতে যে লিঙ্গমূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত আছেন তাঁরা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ নামে অভিহিত। শিবের এই দ্বাদশ লিঙ্গাবতার যে বারোটি পীঠস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন সেই পুণ্যতীর্থগুলি ও তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম নীচে দেওয়া হল।

(১) শ্রীসোমনাথ—সৌরাষ্ট্রের (বর্তমান গুজরাট) প্রভাস পট্টনে বা পত্তনে।

(২) শ্রীমল্লিকার্জুন—অন্ধ্রের শৈলম পর্বতে।

(৩) শ্রীমহাকালেশ্বর—উজ্জয়িনীতে।

(৪) শ্রীওঙ্কারেশ্বর—নর্মদা নদীর তীরে। এঁর অপর নাম শ্রীঅমরেশ্বর বা শ্রীঅমলেশ্বর।

(৫) শ্রীকেদারনাথ—হিমালয় পর্বতের কেদার তীর্থে।

(৬) শ্রীভীমশঙ্কর—দুইটি স্থানকে এঁর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলে দাবী করা হয়। প্রথমটি বোম্বাই-পুণা রেল পথের নিরলি স্টেশনের অন্তর্গত, দ্বিতীয়টি আসামের গৌহাটির কাছে ব্রহ্মপুর পাহাড়ে।

(৭) শ্রীবিশ্বনাথ—বারাণসী ধামে (কাশী ক্ষেত্রে)।

(৮) শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর—মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে ২৯ কিলোমিটার দূরে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানের কাছে।

(৯) শ্রীবৈদ্যনাথ—এঁর অধিষ্ঠানক্ষেত্র দুটি—একটি বিহারের দেওঘরে ও অন্যটি হায়দ্রাবাদের কাছে পালীতে।

(১০) শ্রীনাগেশ্বর—এঁরও দুটি স্থান নির্দেশ করা হয়; প্রথমটি গুজরাটের দ্বারকায়, দ্বিতীয়টি হায়দ্রাবাদের আউধ গ্রামে।

(১১) শ্রীরামেশ্বর—তামিলনাড়ু প্রদেশের রামনাদ জেলায় সমুদ্রের ধারে।

(১২) শ্রীঘুষমেশ্বর—ঔরঙ্গাবাদে এলোরা গুহার নিকটে।

দ্বাদশ জোতির্লিঙ্গানি

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম্॥
পরল্যাং বৈদ্যনাথং চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে॥
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশ্বরং ত্র্যম্বকং গোতমীতটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘুসৃণেশং শিবালয়ে॥
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি।

শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গাবতারের এই স্তবটি যিনি পাঠ করবেন তিনি সর্বপাপ মুক্ত হবেন করুণাঘন মহাদেবের কৃপায় এ আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। উপরের ক্রমানুসারে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গসমূহে কথা ও কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে।

শ্রীসোমনাথ

—"তুমি ক্ষয় রোগগ্রস্থ হয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাক। নিঃশেষ হোক তোমার যৌবন-সৌন্দর্য। আমি ইতিপূর্বে বহুবার তোমায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অবহিত করেছি যে, তুমি আমার সপ্তবিংশতি কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছ, সুতরাং তাদের প্রত্যেককেই স্ত্রীর যথাযথ

মর্যাদা দেওয়া তোমার কর্তব্য ; কিন্তু তা তুমি করছ না, এমন কি আমার অনুরোধেও কর্ণপাত না করে তুমি কেবল রোহিণীর প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করে চলেছ—আমার অন্য কন্যাদের অনাদর করে যন্ত্রণা দিচ্ছ। আমার আদেশ অবহেলা কর, আমার অনুরোধ পদদলিত কর, তোমার এতদূর আস্ফালন! তুমি ক্ষীণ তনু হয়ে বীর্যহীন হও।—মহাক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ প্রজাপতি জামাতা সোমদেব অর্থাৎ চন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন।

ঘটনাটা হল প্রজাপতি দক্ষ তাঁর সাতাশটি কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন চন্দ্রের সঙ্গে, কিন্তু বিবাহের পর অন্য পত্নীদের উপেক্ষা করে চন্দ্র শুধুমাত্র দক্ষকন্যা রোহিণীরই মনোরঞ্জন করতে থাকেন। রোহিণীই একমাত্র চন্দ্রের প্রিয়তমা ভার্যা হলেন। দক্ষের অন্য ছাব্বিশ জন পুত্রী অবহেলিতা ও অনাদৃতা হয়ে ক্ষুব্ধ মনে স্বামীর এই আচরণের বিরুদ্ধে পিতার কাছে নালিশ জানালেন।

—"পিতা, আমরা কি অপরাধ করেছি! পতি আমাদের দিকে দৃক্‌পাতও করেন না—সর্বদা রোহিণীর সঙ্গেই রয়েছেন। তাঁর এই উপেক্ষা আমাদের প্রাণে নিরন্তর যেন প্রজ্বলিত শলাকা বিদ্ধ করছে। পতি স্ত্রীলোকের ইহকালের সুখ, পরকালের শান্তি ; পতির উপেক্ষা নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজন কি ?"

দুঃখিনী কন্যাদের জন্য মনে বেদনা বোধ করলেন প্রজাপতি দক্ষ। রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব ও তাঁর অন্য কন্যাদের উপেক্ষা করার জন্য তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। জামাতা চন্দ্রকে ডেকে সকল স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু চন্দ্র শ্বশুরের কথা শুনলেন না, স্ত্রীদের প্রতি পূর্ববৎ আচরণ করে যেতে লাগলেন। জামাতার ঔদ্ধত্যে মহাক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ অভিশাপ দিলেন, "ক্ষীণতনু হোক তোমার বরতনু।"

দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র দিনের পর দিন কৃশকায় হতে লাগলেন—তাঁর স্নিগ্ধ সতেজফুল্ল কান্তি বিষাদগ্রস্ত রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগলো। এদিকে চন্দ্রকর বিনা ধরিত্রীর সুষমাও অন্তর্হিত হলো, সবুজ শ্যামল তরু বল্লরী-পল্লব সব পীতবর্ণ ধারণ করে রসহীন শুষ্ক হয়ে যেতে লাগলো। শাকসব্জি আর জন্মায় না—মধুবার্তাবহের সুমিষ্ঠ কণ্ঠগীতি কর্কশ হয়ে গেল। সৃষ্টি বৈষম্য উপস্থিত দেখে দেবতারা দক্ষের কাছে গিয়ে সব কিছু ব্যক্ত করে সোমদেবকে ক্ষমা করে তাঁকে অভিশাপ মুক্ত করতে অনুরোধ করলেন। অনুরুদ্ধ প্রজাপতি নরম হয়ে দেবতাদের

বললেন, "আমার মুখের কথা তো বিফল হবে না, সোমদেবকে ক্ষয় পেতেই হবে। তবে ধরাধামে পবিত্র সরস্বতী নদী ও সাগরের সঙ্গমে যে প্রভাসপত্তম আছে চন্দ্র যদি সেখানে গিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করে তাঁকে তুষ্ট করতে পারেন তাহলে আশুতোষের কৃপায় সোম ক্ষীণতনু হবেন মাত্র এক পক্ষকাল ধরে প্রতিদিন। সেই ক্ষীণতনু পূর্ণতা পাবে পরবর্তী পক্ষকাল ধরে ধীরে ধীরে দিনের পর দিন। আবহমানকাল ধরে চলবে চন্দ্রদেহের এই ক্ষয় ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি।"

তখন সকল দেবতার অনুরোধে চন্দ্র সরস্বতী-সাগর সঙ্গম তট প্রভাসপত্তমে উপনীত হলেন এবং শিবের তপস্যায় নিরত হলেন। চন্দ্রের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে দেখা দিলেন এবং দক্ষের অভিশাপ মুক্ত করলেন। চন্দ্র ফিরে পেলেন তাঁর আলোক, লাভ করলেন তাঁর দ্যুতি। ধরিত্রীও সুষমামণ্ডিত হলেন। কথিত আছে, চন্দ্র এই মহাতীর্থে মহাদেবের যে জ্যোতির্লিঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করে আরাধনা করেছিলেন তিনি সোমনাথরূপে আবহমানকাল ধরে জগজ্জনের কল্যাণময় ঈশ্বররূপে এখানে বিরাজমান আছেন এবং দেহরোগ ও ভবরোগ হতে মানুষকে ত্রাণ করছেন। সেই মহাপুণ্য লগ্ন থেকে প্রভাস ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতীর্থ—পুণ্যতীর্থ—মহাতীর্থ—মুক্তিতীর্থ।

এই তীর্থ দর্শনে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, পাণ্ডব উত্তর-পুরুষ জন্মেজয় ও পরীক্ষিত এবং পরবর্তী-কালে অবতার পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। এছাড়া যুগ যুগ ধরে আসছেন পুণ্যলোভী মুক্তিকামী অগণিত ভক্ত মানুষ। শিব তাঁর কল্যাণ হস্তের আশীর্বাদে সকলকে কৃপা করছেন।

উপরের পৌরাণিক কাহিনীতে গল্প কথা যাই-ই হোক একটি বিষয় কিন্তু লক্ষণীয় যে, এখানে শিব ও দক্ষের বিরোধ নেই। দক্ষ জামাতা শিবকে দেবাদিদেব মহাদেব বলে স্বীকার করছেন। অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞের সময়ের অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা এটি, এখন প্রবৃত্তিমার্গীরা শিব-প্রভাবে প্রভাবান্বিত। মুখ্যদেবতা হিসেবে শিব মান্য। শিবের কল্যাণ-রূপ মানুষের ভাবনায় তাঁর রুদ্ররূপের পাশে উদ্ভাসিত। সোমনাথের পূজা করলে ক্ষয়রোগ ও কুষ্ঠ ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। এখানে চন্দ্রকুণ্ড নামে এক পবিত্র কুণ্ড আছে—ঐ কুণ্ডের জলে স্নান করলে মানুষ শিব-কৃপায় রোগমুক্ত হয়।

কোন অনাদি অতীতে চন্দ্র শাপমুক্তির জন্য প্রথম সোমনাথ

জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায় পুরাণে। কিন্তু ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার প্রতীক হলেন সোমনাথ। দেহের জরা আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর, তার বিনাশ নেই ; তাইত সোমনাথ কোটি কোটি ভারতবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিয়ে আবার জাগ্রত হয়েছেন। উষার অরুণালোকে তাঁর শুভ্র জটাজাল ভাস্বর হয়েছে। ফেনিল নীলসিন্ধু মন্দিরের পাষাণ চত্বর আবার ধুয়ে দিচ্ছে। মুহুর্মুহু শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে আরতির দীপ-শিখার আলোয় উদ্দীপিত হয়ে ভক্তের দল আহ্বান জানাচ্ছে পরমদেবতা শিবকে—

"হর হর মহাদেও—জয় শঙ্কর।"

ভারতের সুদূর পশ্চিমপ্রান্তে সৌরাষ্ট্রের বর্তমান গুজরাট প্রদেশের দক্ষিণ উপকূলভাগে ভেরাবল থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে সোমনাথ পত্তম যাকে প্রভাসপত্তম বা দেবপত্তম নামেও অভিহিত করা হয়। জলহীন শুষ্ক অনুর্বর দেশের প্রান্ত সীমায় পবিত্র নদী সরস্বতী, হিরণ্য ও কপিলার সঙ্গমস্থলে সাগরতটে রয়েছে মহাতীর্থ প্রভাসপত্তম— একদিকে নীল সমুদ্র, অপর দিকে শ্যামতরু রেখা, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাণাহত হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। এখানে বেলাভূমির মাঝে একদিন স্বর্গের দেবতা মর্ত্যলোকে নেমে আসেন। মহাভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় পাষাণ-প্রতীকে। সমুদ্রের জল নিনাদের সঙ্গে বাজতে থাকে পিনাক-পানির ডমরু মাভৈঃ মাভৈঃ রবে। দূর হয় প্রাণের ভয় অভয়-শিবের বরাভয়ে।

সোমনাথ মন্দিরের প্রাচীন ইতিহাস রহস্যে ঢাকা—স্পষ্ট নয়। খণ্ড খণ্ড ইতিহাস পাওয়া যায় খণ্ড খণ্ড সময়ের। যাদবরা পূর্বতন কুশস্থলিতে দ্বারকা নগরী স্থাপন করে এখানে রাজত্ব করেছিলেন। মহাভারতের আমল থেকেই এই দ্বারকা নগরী মহাপবিত্র—প্রভাসপত্তম। তখন থেকেই তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু সোমনাথের মন্দিরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ প্রভাসের সোমনাথের মন্দির সুপ্রাচীনতম শিব-মন্দির। ঐতিহাসিক অন্য কোন প্রমাণ না থাকায় প্রাপ্ত ইতিহাসের দলিল অনুযায়ী অনুমান করতে হয় যে, শৈব বল্লভী নৃপতিদের রাজত্বকালেই কোন এক সময়ে হয়তো সোমনাথের প্রথম অভ্যুদয় হয়েছিল। ঐ রাজবংশের উপাস্য দেবতা শিবের আরাধনার জন্য নির্জন সৈকতে প্রথম দেউল নির্মিত হয়।

অন্যমত অনুযায়ী সোমনাথের প্রথম মন্দিরটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম

শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। এই সময়েই প্রভাসক্ষেত্র শৈব পাশুপত ধর্মমতের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সোমনাথের মন্দিরও ভারতে পাশুপত মতের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে।

সম্ভবতঃ বল্লভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের পুত্র শ্রীহর্ষের দৌহিত্র ধর সেনের রাজত্বকালে দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হয় প্রথম মন্দিরের অধিকৃত স্থানেই (প্রথম মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল)। একটি উন্মুক্ত সভামণ্ডপ এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য ছিল। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ছিল ব্রাহ্মীলিপি যা আধুনিক যুগে মন্দির খননকালে আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি। ধর সেনের রাজত্বকাল ছিল ৬৪০ থেকে ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

বল্লভী রাজত্বের পতনের পর রাজধানী সোলাঙ্কী রাজাদের করতলগত হয়। সোলাঙ্কী রাজবংশের প্রথম রাজা মূলরাজ সোমনাথের উপাসক ছিলেন। কালের ব্যবধানে নির্জন বেলাভূমি তীর্থযাত্রীর কলতানে মুখরিত হল। মন্দির ঘিরে গড়ে উঠল বিশাল জনপদ। নতুন দুর্গ-নির্মিত হল। নতুন করে সংস্কার হল মন্দিরের। প্রাচীন ভিত্তি-ভূমির উপর দেউল ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে পশ্চিম ভারতের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের এক দর্শনীয় বস্তুতে রূপান্তরিত হল। সোমনাথের তৃতীয় মন্দিরটি সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে অথবা নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। সোমনাথের তৃতীয় মন্দির অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে. দেবতা সোমনাথও সমগ্র ভারতবর্ষের তখন (৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রেষ্ঠতম দেব-বিগ্রহ। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুর্জর প্রতিহার রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় মহামহিমময় ও মহাসমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল সোমনাথের খ্যাতি—তাঁর প্রসিদ্ধি। মন্দিরের স্বর্ণদুয়ারে ভক্তের দল সুদূর এশিয়ার একপ্রান্ত থেকে এসে দুনিয়ার সেরা রত্ন-মাণিক্যে পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করতো। দেবতার কোষাগার পূর্ণ হত বিচিত্র রত্ন-সম্ভারে। বিদেশী বণিকের দল বন্দরে নেমে সোমনাথের কাছে তাদের যাত্রার শুভ কামনা করতো এবং বাণিজ্য বেসাতির সাথে দেবতার বৈভব নিয়ে যেত।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফেরিস্তার বর্ণনা থেকে ঐ সময়ের মন্দিরের একটি ছবি পাওয়া যায়।—

"Superb building is built of hewn stone. Its lofty roof was supported by fifty six pillars curiously curved and set with

precious stones.

In the centre of the hall was SOMNATH, a stone idol. Besides the great idol above mentioned there were in the temple some thousands of small images wrought in gold and silver of various shapes and dimension.

It is related that there was no light in the temple except one pendent lamp which being reflected from the jewels, spread a bright gleam over the whole edifice.

20,000 villages were assigned for its support and there were so many jewels belonging to it as no king had ever one-tenth part of it in his treasury. Two thousands Bramhins served the idol and a golden chain 200 muns (400 pounds) supported a bell plate which being struck at stated times called people to worship. 300 shavers, 500 dancing girls, 300 musicians were on the Idol's establishment and received support from the endowments and gifts of pilgrims".

[The History of the Rise of Mohamedan Power in India by Furishtah—Translated by Birgs]

পংক্তিটির মর্মানুবাদ নীচে দেওয়া হল :—

"কাটা পাথরের নির্মিত অতি মনোহর অট্টালিকা—বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত অদ্ভুত বক্রাকৃতি ৫৬টি স্তম্ভের ওপর সুউচ্চ এর ছাদ। মন্দির মধ্যে শিলা মূর্তি সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ। এই বৃহৎ শিবলিঙ্গ ছাড়াও মন্দিরে আরও কয়েক হাজার স্বর্ণ-রৌপ্যময় নানা আকারের ও মাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব-দেবীর মূর্তি রয়েছে। শোনা যায়, মন্দিরে কেবল একটিমাত্র ঝুলন্ত লণ্ঠন ছিল, তার সংলগ্ন মণি-মাণিক্যগুলিতে প্রতি-ফলিত আলোর উজ্জ্বল আভায় সমগ্র প্রাসাদ আলোকিত হয়ে উঠত। ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০,০০০টি গ্রাম মন্দিরের অধিকারে ছিল। এছাড়া মন্দিরে এত মণিরত্ন ছিল যে, তার দশ ভাগের একাংশও কোন ধনবান নৃপতির কোষাগারে ছিল না। দুই হাজার ব্রাহ্মণ ছিলেন বিগ্রহের পূজারী। পূজারতির সময় মানুষজনকে আহ্বান করার জন্য সোনার শিকলে ঝোলানো একটি দুশো মণ ওজনের বৃহৎ ঘণ্টা বাজানো হত। মন্দিরের সেবায় ক্ষৌরকার ছিল ৩০০ জন। দেবদাসী ছিল ৫০০ জন এবং গায়ক-বাদক ছিল ৩০০ জন। এরা মন্দিরের তহবিল থেকে ভরণ পোষণ পেত।"—

এই বর্ণনা হয়ত বাহুল্য বর্জিত নয়, তবু এটি পাঠ করলে মন্দিরের বিশালত্ব সহজেই অনুমান করা যায় ও আশ্চর্য হতে হয়।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই সোমনাথের ভাগ্যাকাশে ঘন মেঘের আবির্ভাব ঘটল। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সুলতান মামুদ গজনী থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সোমনাথ অবরোধ করলেন। এটি ছিল তাঁর ষোড়শতম ভারত অভিযান। প্রবলভাবে পৌত্তলিক ধর্ম-বিদ্বেষী ও প্রচণ্ড ধনলিপ্সু সমরকুশলী সুলতান-দস্যু মামুদের সবচেয়ে সুবিদিত লুণ্ঠনকার্য ছিল সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন। মামুদের সৈন্য বাহিনীর প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা যথাসাধ্য রক্ষামূলক প্রচেষ্টা অবলম্বন করে। তিন দিন ধরে তারা শহরের প্রাচীর থেকে মুসলমানবাহিনীকে প্রতিহত করে। গুজরাটের রাজা এবং নিকটবর্তী দলপতিগণ সোমনাথ রক্ষায় যোগদান করেছিলেন। অবরোধ শেষে যুদ্ধ হল। পাঁচ হাজার রাজপুত বীর যুদ্ধে প্রাণ বলি দিল। রক্তে প্রভাসপত্তমের মাটি লাল হয়ে উঠল। ভারতীয়দের সম্মিলিত অবরোধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল—শোণিত-সিক্ত পিচ্ছিল পথে সুলতান মামুদ নগরে প্রবেশ করলেন। পরদিন প্রভাতে মন্দিরে প্রবেশ করে ধনলোলুপ সুলতান চমকে উঠলেন—শাণিত লোভে তাঁর চোখ দুটো চকচক করে জ্বলে উঠল। এত ধন-রত্ন, এত বিপুল ঐশ্বর্য সোমনাথের! ভাঙো বিধর্মীর-মন্দির—লুঠে নাও যত ধন-দৌলত! সারাদিন ধরে অবিরাম চলল লুণ্ঠন। স্বর্ণ-মণ্ডিত বিগ্রহকে দেখে পৈশাচিক উল্লাসে হাত বাড়িয়ে ছুটে গেলেন পৌত্তলিক ধর্মদ্বেষী বিধর্মী সুলতান—তিনি সোমনাথ বিগ্রহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অশ্রুজলে নয়ন প্লাবিত করে করজোড়ে বিগ্রহ ধ্বংস না করার জন্য সকাতরে মামুদকে বারংবার অনুরোধ করলেন এবং ঐ অনুগ্রহের জন্য তাঁকে প্রচুর ধনরত্ন প্রদানের অঙ্গীকারও করলেন। মামুদ তরবারির খোঁচায় পুরোহিতের কলেবর বিদ্ধ করে অট্টহাস্যে উত্তর দিয়েছিলেন যে, বিগ্রহের বিক্রেতা না হয়ে তিনি পরিচিত হতে চান বিগ্রহের ধ্বংসকারী হিসেবেই। তারপর তিনি স্বহস্তে ঐ পুণ্য বিগ্রহ ধ্বংস করেন। বিধর্মীর হাতে শিবলিঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। চূর্ণ প্রস্তর বাহিত হয়ে চলল গজনীর পথে। বিচূর্ণ হল মন্দির—তার গর্ভগৃহ। (শিবলিঙ্গের বিচূর্ণ প্রস্তর মামুদ গজনীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর বড় মসজিদের চত্বরে নিক্ষেপ করেছিলেন অদ্ভুত পৈশাচিক উল্লাসে।)

মন্দিরের সোনার বড় ঘণ্টাটি লুণ্ঠনের সময় একবার বেজে উঠেছিল— বিধর্মী লুঠেরারা সেই ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল—"আল্লা হো-আকবর।"

অনাদি লিঙ্গ সোমনাথ বিগ্রহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, অতুল ধন ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে গর্বোদ্ধত সুলতান-দস্যু নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। অসহায় ভক্তরা বিগ্রহহীন ভগ্ন-মন্দির চত্বরে হাহাকার করে লুটিয়ে পড়ল, অশ্রু-প্লাবিত চোখে শূন্য দেবালয়ের দিকে চেয়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল—"হে শঙ্কর! প্রভু, আমাদের কি অপরাধ হল। দেবাদিদেব তুমি কি আমাদের বর্জন করলে! বিধর্মী তোমার পুণ্য বিগ্রহ চূর্ণ করল, হায়! শক্তিহীন হয়ে আমাদের তা দেখতে হল! কিন্তু মহাদেব, তুমি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর—প্রভু, তুমি কেন তোমায় রক্ষা করলে না— বিধর্মীকে তার উপযুক্ত সাজা দিলে না!"

তাঁর বিধর্মী সন্তান সুলতান মামুদের ধন-লিপ্সা পরধর্ম-দ্বেষ ও লুণ্ঠন বৃত্তি দেখে শিব হেসেছিলেন, আবার মহাদেব অলক্ষে হাসলেন ভক্তদের নিষ্ফল বিলাপে। এসবই তো তাঁরই ইচ্ছায় সংঘটিত। তাঁরই ইচ্ছায় এই বিনাশ আবার তাঁরই ইচ্ছায় নবসৃষ্টির উন্মেষ। শিবই রক্ষক আবার শিবই সংহারক। শিবই বিশ্বকে নিত্য জাগান আবার তিনিই তাকে নিত্য ঘুম পাড়ান—এই ধ্বংস-সৃষ্টি মহাকাল শিবের লীলা বিলাস মাত্র। তুচ্ছ সুলতান মামুদ বা অসহায় ভক্তবৃন্দ বা বীর হিন্দু রাজন্য-বর্গ এঁরা সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছার ক্রীড়নক—জগৎ লীলায় নিমিত্ত মাত্র। তাই গর্বোদ্ধত মামুদ শিব-ভক্তদের প্রতি অত্যাচারের ফল স্বরূপ গজনী ফেরার পথে যে চরম দুর্দশার মধ্যে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন তাঁর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। আবার সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে ভক্তদের প্রাণে শিব জেগে রইলেন, তাই আবার পুরানো মন্দিরের বুকে সৃষ্টি হল নতুন সোমনাথ মন্দির।

সুলতান মামুদের ধ্বংস-তাণ্ডব যেন নটরাজেরই প্রলয়-নৃত্য। তারই ফলে প্রভাসপত্তমের মধ্যাহ্ন গগনে জ্যোতিষ্মান সূর্য কালো মেঘে ঢাকা পড়েছিল। স্তিমিত প্রদীপ-শিখা কম্পমান হল। অনন্ত চন্দ্রাতপের তলে ভগ্ন দেউল পড়ে রইল মহাকালের প্রতিভূ হয়ে। কিন্তু তাণ্ডব পুরাতনকে ভেঙ্গে চূর্ণ করে নতুন বিশ্ব রচনার সৃষ্টি করে। সংহারের মাঝেই লুকিয়ে থাকে সৃষ্টির নতুন বীজ। নটরাজের প্রলয় নৃত্যের সঙ্গেই প্রাণ-প্রবাহিণী অমৃতধারা নেমে আসে তাঁর জটাজাল

থেকে—তখনই সার্থক হয় সৃষ্টি।

তাই হল সোমনাথে :—নতুন দেউলে আবার উদ্ভাসিত হল হাজার প্রদীপ শিখা। মন্দিরের নহবৎখানায় আবার বেজে উঠল অনাদি সুরে ভোরের ভৈরবী। শিব আবার চীরবেশ ছেড়ে রাজবেশ পরলেন।

এবার মূল মন্দির চত্বরে নতুন মন্দির তৈরী করলেন গুজরাটের চাণক্য রাজা ১ম ভীমদেব। এটি সোমনাথের চতুর্থ মন্দির। ভীমদেবের তৈরী এই দেউল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাঁর মন্ত্রীদের নির্বুদ্ধিতায়। চতুর্থ মন্দিরটি পূর্বের মত স্থাপত্যে ও ঐশ্বর্যে তেমন গরিমা-মণ্ডিত ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সম্ভবতঃ ১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই ভিত্তির উপরেই পুনর্নির্মিত হয় সোমনাথের পঞ্চম মন্দির। মন্দিরটি নির্মাণ করেন চালুক্য-রাজ জয়সিংহের উত্তরাধিকারী রাজা কুমার পাল। ভব বৃহস্পতি নামে একজন প্রসিদ্ধ শৈব-সাধুর বিশেষ আগ্রহে কুমার পাল এই মন্দির সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচে ঢেলে তৈরী করান। এটি দেখতে ছিল কৈলাস শিখরের মতন। তাই এর নতুন নাম হয় 'মেরু প্রাসাদ'। এই মন্দিরও বিখ্যাত হয়। সোমনাথের মন্দিরের যে অংশটুকু ধ্বংসের হাত থেকে কিছু কাল আগেও বেঁচেছিল ঐতিহাসিকদের মতে সেটাই কুমার পালের নির্মিত পঞ্চম মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমদেব এই মন্দিরের সঙ্গে সোমেশ্বর মণ্ডপ নামে এক মণ্ডপ যুক্ত করেছিলেন। পরবর্তী রাজারাও এই মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি করেন নানা স্থাপত্য সংযোজনের দ্বারা। এই পঞ্চম মন্দিরটি বিগত দিনের স্মৃতি বহন করে আরও এক শতাব্দীকাল ধ্বংসের হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছিল। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি আলফ খাঁ মন্দির ধ্বংস করেন। তাঁর হাতে মহাপবিত্র সোমনাথের মন্দির কলুষিত হয়। কিন্তু তিনি বিতাড়িত হলে, চুদাসমার অধিপতি মহিপালদেব পুনরায় মন্দির সংস্কার আরম্ভ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৩০৮ থেকে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মন্দিরটি পরিসমাপ্ত করে নতুন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রাখ খঙ্গর (১৩২৫-১৩৫১)।

এরপর, আবার ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি নতুন করে মন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন জুনাগড়ের রাজা মণ্ডালিক ও তাঁর পুত্র খেঙ্গার। মূল মন্দিরের সন্নিকটে নবনির্মিত মন্দিরে দেবতার আবার পুণ্য প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সূর্য আর ভাস্বর হল না, কালো যবনিকার অন্তরালে দিগন্তের পথে ঢলে পড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়েছে। মুসলিম রাজশক্তি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের দিকে দিকে ছুটে চলেছে। গুজরাটের সিংহাসন তখন মুসলিম রাজ-শক্তির কবলিত। গুজরাটের মুসলিম শাসনকর্তা মুজাফর খান ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার ধ্বংস করলেন সোমনাথের মন্দির। মুজাফর মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করেছিলেন। সবই দেবাদিদের মহাদেবের ইচ্ছায় ঘটেছে। মুজাফরের পৌত্র আহমদ শাহও ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করেন।

তবু ঐ পুণ্যতীর্থের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে সোমনাথের মন্দির, তার পবিত্রতাও অব্যাহত থাকে হিন্দুদের কাছে। তারপর ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের আদেশে মন্দিরের শেষ চিহ্নটুকুও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। ঔরঙ্গজেব ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে পূর্ণ মসজিদ তৈরী করেন।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে গুজরাটে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। শেষে গুজরাট মারাঠারা অধিকার করে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হোলকারের পুণ্যশীলা মহারাণী অহল্যাবাঈ পুনরায় সোম-নাথের একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করেন—মন্দিরটি আদি বিধ্বস্ত মন্দিরের কিছু দূরে তৈরী করা হয়েছিল। এই মন্দির এখনও আছে, তবে প্রাচীন ও ভগ্ন প্রায়। মূল শিবলিঙ্গটি মন্দিরের তলদেশে অবস্থিত, সুরঙ্গ পথে যেতে হয়। এরই উপরে সাধারণের দর্শনার্থে আর একটি মূর্তি স্থাপিত আছে।

অতীতের সমৃদ্ধ প্রভাসপত্তম আজ যেমন নিতান্ত এক গণ্ডগ্রাম তেমনি সোমনাথের বর্তমান মন্দিরটি নিতান্ত সাদামাটা। মূল মন্দিরের পীঠের ওপর ভাস্কর্যবিহীন মর্মর-মন্দির নিকেতনে সোমনাথ বিরাজ করছেন। ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় পুরাতন ভগ্নস্তূপের ওপর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে নতুন মন্দিরটি নির্মিত হয়। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ নতুন মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করেন। সম্মুখে দ্বারপাল হিসাবে নন্দীর মূর্তি। চারিদিকে পাষাণ চত্বর—পুরানো মন্দিরগুলির শেষ স্মৃতিচিহ্ন। মন্দিরের এই অংশে এসে দাঁড়ালে মন এক অপার্থিব আনন্দে ভরে যায়। জগৎ-সংসারের কাণ্ডারী শিব প্রহেলিকাময় ভাবসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। বিরাট প্রকৃতি এই অসীমের পূজার অয়োজন করেছে। সমুদ্র

তাঁর পদযুগল নিত্য ধৌত করে দিচ্ছে। নীলাকাশ চন্দ্রাতপ রচনা করছে। তাঁর পূজার নির্মাল্য অগণিত মানুষের অন্তরের ভক্তি আর ভালবাসা। অনাদিদেব মহেশ্বর—তিনি কি কেবল দেউলে মূর্তির মাঝে বিরাজিত? রূপে-অরূপে, আকারে-নিরাকারে তিনি সত্যম্—নিখিল বিশ্বে প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত, প্রতিটি জীবের মধ্যে তিনি বিরাজ করছেন—আবার তারই মধ্যে ওতঃপ্রোত এ জগৎ-সংসার। শিব স্বয়ম্ভু—তিনি পরমাত্মন্—তিনি বিশ্ব-চৈতন্য। তাঁর সৃষ্টি নেই তাঁর ধ্বংস কোথায়? তিনি অনাদি—তিনি অনন্ত—তিনি অদ্বৈতম্।

শ্রীমল্লিকার্জুন

দেবাদিদেব মহাদেবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের দ্বিতীয় জ্যোতির্লিঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলম্ পর্বতে প্রকটিত আছেন। এই লিঙ্গ মূর্তি মল্লিকার্জুন নামে অভিহিত। অন্ধ্রের পুরাতন রাজধানী কার্নুল থেকে বাসযোগে এখানে যাওয়া যায়। তাছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশের অন্যতম জেলা শহর গুন্টুর মহকুমা শহর নন্দীয়াল এবং রেলওয়ে জংশন গুন্টাকল থেকেও শ্রীশৈলম্ পর্যন্ত বাস চলাচল করে।

পাহাড়ী আঁকা-বাঁকা পথ ধরে শ্রীশৈলমে যেতে হয়। পথের দুধারে নানা প্রকার বৃক্ষলতা-পুষ্প পরিপূর্ণ জঙ্গল। দৃশ্য অতি মনোহারী। পূর্বে শ্রীশৈলমের পথ খুবই দুর্গম ছিল এখন সহজ সুগম হয়েছে। শ্রীশৈলম পর্বতের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় রয়েছে জ্যোতির্লিঙ্গ মল্লিকার্জুনের মন্দির এবং নীচে তার পাশেই কৃষ্ণানদী বয়ে চলেছে দেখা যায়। কৃষ্ণা নদীকে এখানে পাতাল গঙ্গা বলে। মন্দির থেকে নদীর দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার।

প্রবাদ যে, আর্ত মানুষের কল্যাণ কামনায় শিব স্বয়ং জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্তিতে এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন কোন্ অনাদি যুগে যার কোন ইতিহাস নেই। সেই যুগ থেকে আবহমানকাল ধরে মহেশ্বরের কল্যাণ আশীর্বাদ ও কৃপায় মানুষ ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ করে চলেছে মুক্তি লাভের পথে।

বিশেষ করে পুত্রেষ্টি কামনায় স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে এখানে এসে শিবচরণে পূজার্পণ করে এবং শিব তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। এই লিঙ্গ মূর্তি দর্শন ও স্পর্শনে অতীন্দ্রিয় সুখ লাভ করে মানুষ।

শ্রীশৈলমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীমল্লিকার্জুন সম্পর্কে দুটি কিম্বদন্তী

প্রচলিত আছে।

প্রথম কিম্বদন্তী অনুসারে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এখানে তীর্থ-পরিক্রমায় এসে শ্রীশৈলমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন ও অনাদি লিঙ্গকে মল্লিকাপুষ্পে অর্চনা করেন। সে কারণে এই জ্যোতির্লিঙ্গের নাম নাকি মল্লিকার্জুন হয়েছে। কথিত আছে যে, পঞ্চপাণ্ডব এই পুণ্যতীর্থে এসে মন্দির এবং বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। মূল মন্দিরের পাশে ছোট ছোট যে পাঁচটি মন্দির আছে সেগুলি তাঁরাই নাকি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহাভারতের বনপর্বের এই শ্লোকগুলিতে শ্রীশৈলমের উল্লেখ আছে।

"শ্রীপর্বতে মহাদেবো দেব্যাসহ মহাদ্যুতিঃ।
ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ॥
তত্র দেবহ্রদে—স্নাত্বা শুচি প্রযত মানসঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ॥
[মহাভারত, বনপর্ব, ৮৩ (১৯-২০)]

অর্থাৎ শ্রীপর্বতে (শ্রীশৈলে) পরম জ্যোতিষ্মান্ মহাদেব মহানন্দে দেবী পার্বতীর সঙ্গে বিরাজ করছেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও সেখানে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে বাস করেন। সেখানে স্বর্গীয় হ্রদে পবিত্র মনে ও সংযত চিত্তে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং সমগ্র পরিবার মুক্তিলাভ করে।

জ্যোতির্লিঙ্গের নামের পশ্চাতে দ্বিতীয় যে প্রবাদটি প্রচলিত তা হল :—

কৃষ্ণা নদী তীরে চন্দ্রগুপ্তপুরম্ নামে এক রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজার এক কন্যা চন্দ্রাবতী কোন কারণে সংসারে বীতরাগ হয়ে শ্রীশৈলমে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর একটি অতি সুলক্ষণা দুগ্ধবতী গাভী ছিল। কিন্তু সে দুধ দিত না বা দোহন করলে তার বাঁট থেকে দুধ পাওয়া যেত না। রাজকুমারী এর কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃতা হলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, গাভীটি প্রতিদিন এক নির্দিষ্ট সময়ে কোথায় যেন গোপনে ছুটে চলে যায়, কিছু সময় পর ফিরে আসে। রাজকুমারী চন্দ্রাবতী একদিন গাভীটিকে অনুসরণ করে গভীর বনমধ্যে গিয়ে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন। রাজকুমারী অবাক হয়ে দেখলেন যে, অরণ্য মধ্যে এক নয়নাভিরাম শিবলিঙ্গ প্রোথিত রয়েছে মাটিতে আর গাভীটি ঐ শিবলিঙ্গের উপর তার সমস্ত দুধ ঢেলে

দিচ্ছে। শিবলিঙ্গকে প্রণাম নিবেদন করে এবং অপূর্ব ভাবাবেগ প্রাণে নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে এলেন। সেদিন রাত্রে মহাদেব স্বপ্নে রাজকুমারীকে জানালেন যে, জ্যোতির্লিঙ্গাবতাররূপে তিনি ঐ বনমধ্যে অবস্থান করছেন; চন্দ্রাবতী যেন তাঁর নিত্য পূজা করেন। স্বপ্নে মহাদেবের প্রত্যাদেশ পেয়ে রাজকুমারী চন্দ্রাবতী প্রতিদিন মল্লিকা ফুল দিয়ে ঐ শিবলিঙ্গের পূজা আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকেই ঐ শিবলিঙ্গ মল্লিকার্জুন নামে প্রসিদ্ধ হন। মন্দিরের প্রস্তর ফলকে এই কাহিনীর কথা লিপিবদ্ধ আছে।

উপরের মহাভারতের উদ্ধৃতাংশে যে হ্রদের কথা বলা হয়েছে এখন অবশ্য সে হ্রদ দেখা যায় না হয়ত বা পাতাল-গঙ্গাকেই উদ্দেশ্য করে ঐ কথা লেখা হয়েছে। শ্রীশৈলমের অন্য নাম ঋষভগিরি। স্নানের সংকল্প মন্ত্রেও শ্রীশৈলমের উল্লেখ আছে।

কথিত আছে, বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন এখানে কোন এক গুহামধ্যে বহু বৎসর তপস্যা করেছিলেন। নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান-শাখার প্রবর্তক। নাগার্জুনের পর চার-পাঁচ শ' বছর বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল এই স্থান। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের গরিমা ম্লান হয়ে যাবার পর এই স্থান পুনরায় হিন্দুদের দখলে আসে। এরপর বীর শৈব বা লিঙ্গায়েতদের প্রধান ঘাঁটি হয় শ্রীশৈলম্—শৈবধর্ম প্রচারের ঘাঁটি। তখন পাতাল-গঙ্গার তীরে অনেক শিবলিঙ্গ পাওয়া যেত এবং বীর শৈবরা ঐ সব শিবলিঙ্গ নিজেদের কাছে রাখত। এখানে বিভিন্ন ধর্মের স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গকে স্পর্শ করে প্রণাম করতে পারে।

শিব মন্দিরের প্রাকারের মধ্যেই পশ্চিমদিকে ভ্রমরাম্বা বা মাধবী দেবীর মন্দির বিরাজিত। বিখ্যাত অষ্টাদশ শক্তি পীঠের এক পীঠ এটি। কিম্বদন্তী যে, মারাঠা বীর শিবাজী এখানে এসে দেবীর আরাধনা করেন এবং দেবী প্রসন্না হয়ে তাঁকে একটি তরবারি প্রদান করেন। শিবাজী এখানে কিছুকাল আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি মন্দিরের একটি বিরাট গোপুরম্ অর্থাৎ প্রবেশদ্বার নির্মাণ করেছিলেন। দেবীর মূল মূর্তি কদাচিৎ দেখা যায়—সম্ভবতঃ ইনি কালী বা দুর্গা মূর্তি। দেবী শ্রীমল্লিকার্জুন বিগ্রহের শক্তিদেবী হিসেবে এখানে বিরাজিতা ও অতিশয় জাগ্রতা।

এইরূপ জনশ্রুতি যে, শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীর সঙ্গে শ্রীশৈলমে এসেছিলেন ও জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করেছিলেন। সীতা দেবী শিবের একটি সহস্রলিঙ্গ ভ্রমরাম্বা দেবীর মন্দিরের প্রবেশ পথের বামদিকে স্থাপন করেন। শ্রীরামও অপর একটি শিবলিঙ্গ এখানে প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলেন, সেটি এখনও বিরাজিত।

পূর্বদিকের প্রধান প্রবেশদ্বারের উত্তরে আর একটি ছোট শিব-দেউল আছে। শিবলিঙ্গটি দেড় ফুটের মত উঁচু। এই বিগ্রহের নাম বৃদ্ধ মল্লিকার্জুন। অধিকাংশ সময়েই এই লিঙ্গ জলসিক্ত থাকেন।

জ্যোতির্লিঙ্গাবতার মল্লিকার্জুন বিগ্রহটি কষ্টি পাথরের বিগ্রহ এবং গৌরীপট থেকে মাত্র ৪ ইঞ্চি উঁচু। মন্দিরের পরিবেশ সুন্দর ও শান্ত —মন্দিরে প্রবেশ করে দেবচরণে পূজার্ঘ নিবেদন করার পর মহাদেবের স্মরণ-মনন করলে ভক্তের মন স্বর্গীয় আনন্দে ভরে যায়।

প্রভাতে মঙ্গল স্তব পাঠ ও সুমধুর সঙ্গীতে দেবতার 'নিদ্রাভঙ্গ' অনুষ্ঠান হয়। তারপর স্তব পাঠ ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা পুরোহিতরা জ্যোতির্লিঙ্গের স্নানাভিষেক করান। জল, দুধ, দই প্রভৃতি দ্বারা অভিষেক ও কচি বিল্বপত্রের দ্বারা পূজা করা হয় দেবতার।

প্রতি রাত্রে মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীমল্লিকার্জুন লিঙ্গের ধাতু নির্মিত উৎসব মূর্তি নিয়ে ভক্তেরা উৎসব-মুখর হয়ে ওঠেন। বাস্তবিক এটি বড়ই মধুর আনন্দদায়ক উৎসব। দেবতার উৎসব-মূর্তিকে একটি সুদৃশ্য পালকিতে বসান হয় এবং তাঁকে ঘিরে অগণিত ভক্ত নরনারী যাঁরা অধিকাংশই বীর শৈব, শিবের নানারূপ স্তব-স্তুতি করেন। তাঁদের মধ্যে চার পাঁচজনে পালকি বহন করেন। মশালের আলো জ্বলে, সুমিষ্ট বাদ্যে আনন্দরসে চতুর্দিক ভরে থাকে, ধূপ-ধুনার বিমল গন্ধে আমোদিত থাকে মন্দির পরিমণ্ডল। মনোরম পরিবেশ—অপূর্ব দৃশ্য—স্বর্গীয় আনন্দময় ক্ষণ! তারপর পুরোহিত এসে প্রাণঢালা আরতি করেন দেবতার। পূজারতির পর পালকির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে শিব-গীতি গেয়ে উৎসব-বিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করেন ভক্তরা। তারপর পালকি যেখান দিয়ে যাবে তার সামনেই তিরিশ চল্লিশজন ভক্ত পাশাপাশি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েন —উদ্দেশ্য তাঁদের শরীরের উপর দিয়ে যাবেন শ্রীভগবান। এরূপ অনুষ্ঠান দলে দলে কয়েকবার ঘটে। পালকি চলে যায় মাটিতে লম্বমান শায়িত ভক্তদের উপর দিয়ে। এইভাবে এই সুন্দর অনুষ্ঠান অনেকক্ষণ চলে—ভক্তদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে।

জগৎ কল্যাণের জন্য জগৎপতি শিব স্বয়ং এই শ্রীশৈলম্ পর্বতের শ্রীমন্দিরে শ্রীমল্লিকার্জুনরূপে অধিষ্ঠিত আছেন এবং যুগ যুগ ধরে আপামর নর-নারীকে কৃপা করছেন। ভক্তজন এখানে এসে দেবতার উদ্দেশ্যে পূজার্ঘ নিবেদন করলে অপার্থিব আনন্দে তার প্রাণমন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে—এস্থানের এমনই মাহাত্ম্য।

শ্রীমহাকালেশ্বর

তৃতীয় জ্যোতির্লিঙ্গ স্বয়ম্ভু শিব মহাকালেশ্বর ভারতের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যময়ী পবিত্র নগরী উজ্জয়িনীতে বিরাজিত। উজ্জয়িনীর গরিমার কথা জনশ্রুতি আর ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে। কত অলৌকিক ঘটনা, কত না বীরত্ব-ব্যঞ্জক কাহিনী! অতীতে অবন্তী রাজ্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। এখন মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত এই ঐতিহ্যময়ী নগরী।

অতীতকাল থেকেই উজ্জয়িনী প্রসিদ্ধ নগরী—মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও তাঁর বত্রিশ সিংহাসন, তাল-বেতাল ও কালিদাসের নগরী। ভক্তদের কাছে উজ্জয়িনী তপস্যাক্ষেত্র। অনাদিকাল থেকেই মহাকালেশ্বর এখানে বিরাজিত থেকে এ দেশ পুণ্যময় করেছেন। মঙ্গলবিধায়ক তিনি, অগণিত মানুষের কল্যাণ করে চলেছেন। মহাকালেশ্বরের মন্দিরের পাশেই প্রবাহিত শিপ্রা নদী, নদীর পারে বহুজনপদ শোভা পায়—এ মনোরম দৃশ্য দেখলে বারাণসীর কথাই মনে পড়ে। নদীর কলধ্বনিতে যেন ভেসে আছে পুরানো দিনের হাসি-কান্নার কলগান, তারই কিছু হয়তো ধরা আছে মহাকবির কাব্যমালায়—নাট্যসম্ভারে।

উজ্জয়িনীর সৃষ্টিকালের কথা জানা যায় না, সেটা হয়তো ইতিহাসের সীমারেখার বাইরে। তাহলেও হিন্দুরা বলে থাকেন যে, সৃষ্টির আদি থেকেই উজ্জয়িনী আছে। তন্ত্রে বলা হয়েছে যে, বিষ্ণু সতীদেহ বাহান্নটি খণ্ডে বিভক্ত করলে সেই পুণ্যদেহের এক অংশ—বাহুমূল এই উজ্জয়িনীতে পড়েছিল। উজ্জয়িনী এক পীঠস্থান। আবার জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকালেশ্বরের অবস্থিতির জন্য এ স্থান এক মহাতীর্থ। আর্যরা যখন দাক্ষিণাত্যের দিকে আসেন তখন প্রথম উজ্জয়িনীতেই রাজ্য স্থাপন করেন।

উজ্জয়িনীতে জ্যোতির্লিঙ্গাবতার মহাকালেশ্বরের আবির্ভাব সম্পর্কে এক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। স্বয়ং মহাদেব এখানে আবির্ভূত হয়ে

তাঁর ভক্তের রক্ষার জন্য দুষণ নামে এক দৈত্যকে সংহার করেছিলেন বলে জনপ্রবাদ। উজ্জয়িনীতে বহু যুগ আগে পরম বেদজ্ঞ এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। সেখানে ছিল পরাক্রান্ত দৈত্য দুষণ, সে ঐ ব্রাহ্মণকে বিদ্বেষ করতো। ব্রাহ্মণের বেদ নামে এক পরম শিবভক্ত সুকুমার কিশোর পুত্র ছিল। শিবই ছিল বেদের ধ্যান-জ্ঞান। সে নিত্য ফুল ও বিল্বপত্র দিয়ে মহাদেবের পূজা করতো, শিবনাম জপ করতো অহরহ। ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিয়ে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে দুষণ তাঁর কিশোর পুত্র বেদকে হত্যা করতে চাইল। সেজন্য সে প্রথমে তাকে বন্দী করে রাখল। কিশোর বেদ তখন অন্নজল ত্যাগ করে একাগ্র চিত্তে শিবের ধ্যান করতে লাগল ;—

"প্রভু বিশ্বেশ্বর! তুমি করুণাময়! আমি তোমারই আর তো কিছু জানি না। প্রভু! তুমিই আমার রক্ষাকর্তা, তুমিই আমার সংহারকর্তা, তুমিই আমার মঙ্গল-অমঙ্গলের বিধাতা। আমি দুষণের হাতে নিপীড়িত হচ্ছি—ভক্তকে রক্ষা করতে হলে তুমি রক্ষা করো প্রভু। তা না হলে বুঝবো দুষণের হাতে আমার বিনাশই তোমার ইচ্ছা। তবে আমার অন্তিম বাসনা, হে প্রভু বিশ্বেশ্বর! তুমি এসে আমায় একবার দেখা দাও, সার্থক হোক আমার জীবন। আমার সকল ভাবনা তোমার চরণ স্মরণ করে শিবময় হোক—এ জীবন শিবময় হোক। নমঃ শিবায়ঃ, নমঃ শিবায়ঃ, নমঃ শিবায়ঃ। ওঁ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"—

পরম প্রভু মহেশ্বর তাঁর ভক্তের এ আকুল আহ্বানে স্থির থাকতে পারেননি। তিনি ভক্তকে রক্ষা করতে মহাকালেশ্বররূপে এখানে আবির্ভূত হন এবং এক অভূতপূর্ব ভয়ঙ্কর আকারে দুষণকে হতচকিত, কম্পিত ও বিদীর্ণ করে বধ করেন। দুষণ-সংহারের পর মহাকালেশ্বর-রূপী শিব বেদকে দর্শন দিয়ে তার মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন। সেই দিন থেকে মহাদেব ঐ জ্যোতির্লিঙ্গরূপে এখানে প্রকটিত হয়ে আছেন। মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে মহাপুণ্য হয়। যে মানুষ ভক্তিভাবে এই শিবলিঙ্গের ধ্যান করেন তাঁর সকল মনোবাসনা পূর্ণ হয়—পরমগতি পায় সে।

উপরের কাহিনীর সত্যতা নিহিত আছে ভক্তজনের বিশ্বাসের মধ্যে। কিন্তু এই কাহিনীকে ঘিরে আর একটি ব্যাপারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—তা হল অতীতে বেদবাদীদের সঙ্গে বেদ-বিরোধীদের বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের কথা। অহিন্দু অর্থাৎ বৌদ্ধ বা জৈন কিংবা বেদবাম হিন্দুরা হল বেদ-

বিরোধী, ভূষণ যার প্রতীক। বেদকে সে ধ্বংস করতে চায়। শৈব-শক্তিই প্রবল হয়ে এই বেদবিরুদ্ধবাদীদের শক্তি খর্ব করে। প্রবৃত্তি-মার্গী ও নিবৃত্তিমার্গী বৈদিক আর্যদের বিরোধ মিটে যাওয়ার পর শিব এখন বেদের অবিসংবাদী মহান দেবতা। এ কাল আর্য-অনার্য মিশ্রিত ভাবধারাকে অনেক দূর বয়ে এনেছে।

মহাকালেশ্বরের প্রথম মন্দির ঠিক কবে কোন যুগে নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না। সে মন্দির এখন নেই, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেছে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। পরে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছে নতুন দেউল। এই মন্দির অতি সুদৃশ্য—মুকুটাকার ক্রমহ্রস্ব হয়ে উঠে গেছে ঊর্ধ্বে—একচূড় বিশিষ্ট মন্দির আগাগোড়া পাথরে তৈরী, ভিতরে বাইরে অপূর্ব ভাস্কর্য। মন্দিরের সম্মুখে সংলগ্ন নাট মন্দির। মহাকালেশ্বর মন্দিরের তলঘর (পাতালপুরী) সাদা পাথরে বাঁধান। তারই এক গর্ভগুহায় জ্যোতির্লিঙ্গ বিরাজমান। মহাকাল, গণপতি. পার্বতী, ষড়ানন প্রভৃতি দেবদেবী দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি এই গুহায় রয়েছেন। মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে সব সময় বয়ে চলেছে নদী। তার কলকল রব যেন মহাকালের পূজার জন্য তাঁর ভক্তদের প্রতি মহাদেবের আহ্বান। এই পাতাল পুরীতে প্রকাণ্ড একটি পিতলের দীপ দিনরাত্রি সমান-ভাবে দীপ্ত থাকে, তার শিখাকে ম্লান হতে দেওয়া হয় না। শাস্ত্রে লেখা আছে যে, মর্ত্যভূমিতে পাঁচটি মহাকাল আছেন। যথা—কেদারেশ্বর, বৃদ্ধ-কালেশ্বর (যিনি লিঙ্গপুরাণ মতে মহাকাল), রুদ্রসাগরে এক, মহারাজ বেড়ায় এক ও ওঙ্কারেশ্বর। মন্দিরের পূর্বদিকে একটি নহবৎ-খানা আছে, সেখানে সকাল-সন্ধ্যা নহবৎ বাজে। মহাকালেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণে বৃদ্ধকালেশ্বর, পশ্চিমে রুদ্রসাগর ও হরসিদ্ধি, উত্তরে সরকার বাড়া। মহাকালেশ্বর সম্পর্কে বলা হয় যে,—

"আকাশে তাড়কে লিঙ্গ পাতালেটহকেশ্বরম্।
মৃত্যুলোকে মহাকালে লিঙ্গ ত্রয় নমোঽস্তুতে।"

অনেকে অনুমান করেন যে, মহাকালের প্রাচীন মন্দিরটি ভীমরাজ পবারকের পুত্র উদয়াদিত্য নির্মাণ করেন। হিন্দুধর্মবিদ্বেষী মুসলমান সুলতানরা অনেকেই এই মন্দিরের ওপর চড়াও হয়ে একে ধ্বংস করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। দিল্লীর সুলতান আলতামাস ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে উজ্জয়িনী আক্রমণ করে মহাকালেশ্বর মন্দির ধ্বংস করেন। তিনি নাকি জ্যোতির্লিঙ্গকে দিল্লী নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনা কতটা সত্য তা

বলা যায় না বা সুলতান বিগ্রহ দিল্লীতে নিয়ে গেলেও কিভাবে তা ফিরে এসেছিল সে ইতিহাসও জানা নেই। পরে মন্দিরকে ধ্বংস থেকে কতকটা উদ্ধার করেছিলেন সিন্ধিয়ার রাণীজী দীবান ও রামচন্দ্র বাবা শোনবীণ।

মহাকালেশ্বরের অপার করুণায় মন্দিরের পাশে চৌরাশীকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ একটি কুণ্ড আছে। এটি কোটি তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। বর্ষায় এই কুণ্ডের পুণ্যসলিল নানা বর্ণ ধারণ করে বলে শোনা যায়। কোটি তীর্থ দর্শন ও স্পর্শণে সর্বপাপ মোচন হয়। মানুষের বিশ্বাস যে, এই কুণ্ডের স্নিগ্ধ জলে মহাকালেশ্বর নিজেও অবগাহন করে থাকেন।

শ্রীমন্ত মহারাজ সিন্ধে, হোলকার মহারাজ ও পন্বার সরকার এই তিন রাজ্যের তরফ থেকে মহাকালের সেবার বন্দোবস্ত ছিল। এখন দেবত্রের আয় ও ভক্তদের পূজার্ঘ দ্বারাই মহাকালের ত্রিকাল পূজা হয়। প্রাতঃকালে ভস্মপূজা, মধ্যাহ্নে ভোগপূজা ও সন্ধ্যায় পুষ্পপূজা হয়। মহাশিব রাত্রির সময় মহাকালেশ্বরের কাছে বহু ভক্ত নর-নারীর সমাগমে মন্দির-স্থান মনোরম দৃশ্য ধারণ করে এবং এই উপলক্ষে এখানে তিন দিন ধরে বিরাট মেলা হয়। এই তিন দিনই জ্যোতির্লিঙ্গ বিগ্রহকে নতুন নতুন সজ্জায় ভূষিত করে অষ্ট প্রহরই অভিষেকধারায় সিক্ত করা হয়। শিব রাত্রির সময় ছাড়াও শ্রাবণ মাসের চার সোমবার চার প্রকারের সেবা উপলক্ষে সমবেত ভক্ত হৃদয়ে যে আনন্দধারা বয়ে যায় তার মাধুর্য অবর্ণনীয়।

উজ্জয়িনীতে শিপ্রানদীর তীরে আর এক অতি প্রাচীন শিব বিরাজমান। এঁর নাম মঙ্গলেশ্বর। ইনি উজ্জয়িনীর অন্যতম বিখ্যাত শিব। প্রত্যেক মঙ্গলবারের মঙ্গলেশ্বরের কাছে মঙ্গলপ্রার্থী মানুষ পূজা দিয়ে থাকেন। চৌরাশী মহাদেবের অন্যতম এই দেব-বিগ্রহ। মঙ্গলেশ্বর মন্দিরের চতুর্দিকে পাকা চত্বরে পরিবৃত মন্দির বৃহৎ না হলেও খুব প্রাচীন। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস যে, এই সদানন্দ মহাদেবের দর্শনে লোকে মঙ্গল অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনপাত করতে পারে। মঙ্গলেশ্বরের দক্ষিণে উত্তরেশ্বর নামে অন্য এক মহাদেব আছেন। এঁর মন্দিরের নীচে একটি বড় ও সুন্দর ঘাট আছে। সেখানে নদীতে বেশ জল। প্রতি বছর পঞ্চকোশীর দিন ও অষ্টতীর্থের দিনে এখানে বড় মেলা বসে। এছাড়া উজ্জয়িনীতে আছেন অন্য মহাদেব পাতালেশ্বর—প্রস্তর নির্মিত মন্দিরে। এঁর মন্দিরের পাশেই বিখ্যাত সিদ্ধবটের অবস্থিতি।

প্রবাদ ভারতবর্ষে সাড়ে তিনটি সিদ্ধ বট আছেন। প্রয়াগে অক্ষয় বট, নাসিকে পঞ্চবট, উজ্জয়িনীর সিদ্ধবট ও অবশিষ্ট আধখানা গয়াতে। চৌরাশী মহাদেবের এক মহাদেব সিদ্ধেশ্বরের মন্দির রয়েছে উজ্জয়িনীতে প্রসিদ্ধ দেবী কালিকার মন্দির সন্নিকটে। দেবী কালিকাও এখানে খুব প্রসিদ্ধা।

কালসমুদ্রে ব্রহ্মাণ্ড জগৎ ভেসে চলেছে—যে কালের আরম্ভ নেই, বিরতি নেই, লয়ও নেই। নিত্য বহমানকাল। কাল থেকেই সব উদ্ভূত হচ্ছে তাতেই সব লয় পাচ্ছে। কালের কাণ্ডারী তিনি মহাকাল। জীব জগৎ জড় চেতন সবই সেই মহাকাল-চৈতন্য সত্তায় নিমজ্জমান। মহাকালেশ্বর এখানে অবস্থান করে মানুষকে এই সত্যোপলব্ধি দিয়েই বুঝি চেতনা দিয়ে চলেছেন।

শ্রীওঙ্কারনাথ

চতুর্থ জ্যোতির্লিঙ্গাবতার ওঙ্কারেশ্বর বা ওঙ্কারনাথরূপে ভগবান শঙ্করের আবির্ভাব পুণ্যতোয়া নর্মদা নদীর তীরে। ইনি প্রণবরূপে অভিব্যক্ত। অমলেশ্বর বা অমরেশ্বর নামেও এঁর প্রসিদ্ধি—মান্ধাতা নামেও ইনি অভিহিত। নর্মদা ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নদী। পুরাকালে এই নদী রেবা, সোমোদ্ভবা ও মেখলাসুতা নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন মেখল প্রদেশে মহাকাল (মৈকাল) পর্বতের অমরকণ্টক শৃঙ্গস্থিত এক কুণ্ড থেকে এর উৎপত্তি। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী এই নদী শিবের দেহ থেকে নির্গত হয়েছে। গঙ্গানদীর মতই নর্মদার জল অতি পবিত্র।

প্রবাদ যে, অগস্ত্যমুনির শিষ্য শিবভক্ত বিন্ধ্যাচল একদা শিবপদে মনের কামনা রেখেছিলেন যে, মহাদেব যেন তাঁর বক্ষে অবস্থান করেন। এই কামনা নিয়ে বিন্ধ্য প্রত্যহ শিবচরণে পূজার্ঘ নিবেদন করতেন। মহেশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং এখানে নর্মদা তীরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শিব আজও এখানে প্রকটিত হয়ে রয়েছেন। কথিত আছে যে, দেবতাদের প্রার্থনায় শঙ্কর ভগবান এখানে নিজের দুই স্বরূপ প্রকট করেছিলেন। ভক্তরা এই জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্তি ধ্যান করে চতুর্বর্গ ফল লাভ করেন। এই লিঙ্গ মূর্তি সর্বোত্তম বলে কথিত।

মধ্যপ্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর জব্বলপুর থেকে রেলপথে ওঙ্কারেশ্বর যাওয়া যায়। ওঙ্কারেশ্বর রোড থেকে মান্ধাতা গ্রাম পেরিয়ে নর্মদা নদীর তীরে ওঙ্কারেশ্বর মন্দির। পাহাড় ও অরণ্যের পটভূমিকায় এর

চারিদিকের দৃশ্যাবলী নয়নাভিরাম। নদী পার হয়ে মন্দিরে যেতে হয়। পরম পবিত্র এই স্থান। স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শনমাত্রই মন অতীন্দ্রিয়-লোকে চলে যায়, পার্থিব কামনা-বাসনার ওপর পড়ে পুরু আস্তরণ বা অ-পার্থিব কোন আলোকে হয় অজ্ঞানান্ধকারের বিনাশ।

শিবই যেন ভক্তকে তাঁর ভাবনালোকে টেনে নেন। এখানে কোন হট্টগোল নেই, শান্তিময় পরিবেশ। এখানে নীরবতা মুখর হয়ে প্রাণের মাঝে যেন গুঞ্জন তোলে—শিবশম্ভু, শিবশম্ভু। স্নিগ্ধ-শান্ত পরিবেশে ভক্তজন মহাদেবের উদ্দেশ্যে অন্তরের পূজার্ঘ নিবেদন করেন। স্বয়ম্ভু লিঙ্গের সম্মুখে পিলসুজের ওপর দীপ জ্বলে অনুক্ষণ। ঐ নিবাত-নিষ্কম্প দীপ শিখা মন্দিরের নীরবতাকে যেন আরও গম্ভীর, আরও প্রকট করে তোলে। একটা আধ্যাত্মিক ভাব যেন এখানে জমাট বেঁধে আছে বলে অনুভব হয়। প্রাণের আবেগ ঢেলে ওঙ্কারেশ্বরের পূজা করেন তীর্থযাত্রী ভক্তরা—পূজার উপকরণ নর্মদার জল ও বিল্বপত্র।

নর্মদার মাঝখানে প্রায় আড়াই কিলোমিটার লম্বা দ্বীপ—উত্তর-দক্ষিণে খরস্রোতা নদী। পাহাড়ী সৌন্দর্যময় পটভূমিকায় মন্দির দাঁড়িয়ে আছে—বেশ বড় মন্দির। এখানে ওঙ্কারেশ্বরকে মান্ধাতাও বলা হয় কারণ সূর্যবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি মান্ধাতা অতীতকালে এখানে শিবের যজ্ঞ করেছিলেন। প্রবাদ যে, শিব তাঁর যজ্ঞ-নৈবেদ্য গ্রহণ করতে এখানে আসেন ও মান্ধাতার মিনতিতে জ্যোতির্লিঙ্গরূপে এখানে থেকে যান। নৃপতি মান্ধাতা দেবতার মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন। এখানে কিন্তু দুটো মন্দির আছে। মান্ধাতার মন্দির ছিল দ্বীপের দক্ষিণে, কালক্রমে তা গভীর অরণ্যে হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে পুণার পেশোয়া ২য় বাজীরাও এই মন্দির উদ্ধারে এসে বিফল মনোরথ হয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে যাবার আগে পেশোয়া এখানে এক নতুন মন্দির তৈরী করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই লিঙ্গের নাম মলিনেশ্বর।

এই ঘটনার বহুদিন পর পুরানো পবিত্র স্থানটি খুঁজে পাওয়া যায় এবং ওঙ্কারেশ্বর আবার নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন।

শ্রীকেদারনাথ

ভগবান শঙ্করের পঞ্চম জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রীকেদারনাথ। এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গের কথা ইতিপূর্বে অন্য এক অধ্যায়ে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। হিমালয়ের কেদার শৃঙ্গে এঁর অবস্থান। নর-নারায়ণ অবতারে বিষ্ণু

হিমালয়ে এই শিবলিঙ্গের পূজা করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম জ্যোতির্লিঙ্গের পূজক এইরূপ কথা বলা হয়। কেদারনাথ দর্শন ও পূজন করলে মানুষের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তার চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি ঘটে।

শ্রীভীমশঙ্কর

শিবের ষষ্ঠ জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমশঙ্কর। ভারতে দুই তীর্থস্থানে এঁর অধিষ্ঠান হয়। প্রথমটি বোম্বাই-পুণা রেলপথে নিরাল স্টেশনের কাছে এক পাহাড়ে ও দ্বিতীয় বিগ্রহটি আসামে গৌহাটির নিকট ব্রহ্মপুত্র পাহাড়ে অবস্থিত। শিবপুরাণে দ্বিতীয় লিঙ্গকে উপলিঙ্গ বলা হয়েছে।

পুরাকালে মরুপদেশে সুদক্ষিণ নামে এক সদাশয় রাজা রাজত্ব করতেন। ইনি শিবভক্ত ছিলেন এবং শৈবধর্ম প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। একদা ভীমাসুর অশুভ গ্রহের মত রাজা সুদক্ষিণের রাজ্যে উদয় হল এবং প্রজাদের ওপর অত্যাচার করতে লাগলো। ভীমাসুরের প্রতাপের কাছে রাজা সুদক্ষিণ পরাস্ত হলেন। ভয়ঙ্কর অসুর তাঁকে প্রচণ্ড-ভাবে নিগৃহীত করল ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত করল। ভীমাসুর ছিল শিব-বিদ্বেষী। শিবভক্ত রাজা সুদক্ষিণ রাজ্যহারা হয়ে বনে বনে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন এবং অহরহ শিবার্চনা করে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন যে, মহাদেব যেন অচিরাৎ তাঁকে বিপদমুক্ত করেন। শিব ছাড়া তাঁর শুভদায়ক আর কে আছে ?

ভক্তের কাতর আহ্বানে স্থির থাকতে না পেরে পিনাকী স্বয়ং এখানে এসে অবতীর্ণ হলেন এবং ত্রিশূলাঘাতে ভীমাসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করে ভক্ত রাজাকে বিপদমুক্ত করলেন। রাজা সুদক্ষিণ তাঁর আরাধ্য দেবতার কৃপায় হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন। তখন প্রিয় ভক্তের সকাতর প্রার্থনায় শিব জনকল্যাণের জন্য জ্যোতির্লিঙ্গাবতাররূপে এখানে প্রকটিত হয়ে থাকতে স্বীকার করলেন। ঐ জ্যোতির্লিঙ্গের নামকরণ হল ভীমশঙ্কর যা সিঁদুর-চর্চিত হয়ে সেই পুরাকাল থেকে আজও মনোরম শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে একটি মধ্যমাকৃতি একচূড়াবিশিষ্ট মন্দিরে অবস্থান করে মানুষকে বরাভয় ও শান্তি দিয়ে চলেছেন। ভীমশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ সম্পর্কে পুরাণের এই কাহিনী। প্রবাদ যে, রাজা সুদক্ষিণ সর্বপ্রথম মন্দির নির্মাণ করে জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্তি স্থাপন করেন। এই পবিত্র লিঙ্গ অতি প্রাচীন—এই পুণ্যস্থান মহাতীর্থ।

শ্রীবিশ্বনাথ

সেই কোন অনাদি যুগে যখন মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়েছিল তখন অস্তিত্ব ছিল না চরাচরের, সমস্ত জগৎ ছিল নিবিড় আঁধারে মগ্ন। শুধু বিরাজিত ছিলেন পরমব্রহ্ম ঈশ্বর যিনি নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকার, নির্বিকল্প চৈতন্যময় আনন্দস্বরূপ। ঈশ্বর তখন অভিলাষ করলেন, লীলা-বিলাসের—কল্পনা করলেন লীলা দ্বারা নিজের মূর্তি—কল্পনা করলেন মঙ্গলস্বরূপা সর্বজ্ঞানময়ী শুদ্ধস্বরূপ ঈশ্বরীকেও।...নিজ অবয়ব থেকে প্রকাশ করলেন তাঁর শক্তিস্বরূপা অব্যভিচারিণী মূর্তি।

প্রবাদ সেই সময়েই তাঁর ইচ্ছায় নির্মিত হয়েছিল কাশীক্ষেত্র যার বিস্তৃত পরিধি ছিল পঞ্চক্রোশ। তিনি নিজে সেই ক্ষেত্রে বিহার করলেন। যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ এ কথাই বিশ্বাস করে আসছে।

এই অ-মূর্ত, পরব্রহ্ম আদি পুরুষই বিশ্বেশ্বর শিব আর সেই প্রকৃতি প্রধানা, শ্রেষ্ঠামায়া, পরাশক্তিই ভগবতী অন্নপূর্ণা। কাশীক্ষেত্রে শিব একাত্ম হয়ে আছেন।

কথিত যে, এই ক্ষেত্রে শিব-শিবানীর সুখাস্পদ স্বরূপ, মোক্ষরূপ আনন্দের হেতু, তাই পিনাকীই স্বয়ং এর নাম রাখেন আনন্দকানন। পরমপবিত্র এই কাশীপুরী মহাপবিত্র সপ্তপুরীর অন্যতম। এই সাতটি মহাপবিত্র পুরী হল :—

• কাশী, কাঞ্চী, মায়াপুরী, দ্বারকা, অযোধ্যা, মথুরা ও অবন্তী। কাশীর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে উত্তরবাহিনী গঙ্গা—পবিত্রতম এ নদী পুণ্যতীর্থ করেছে কাশী ক্ষেত্রকে। প্রবাদ যে, কাশীধামে দেহত্যাগ করলে মোক্ষ-লাভ হয়, অবিলম্বে উচ্ছেদ হয় সর্ব-কর্ম বন্ধনের, প্রয়োজন হয় না কোন যোগাভ্যাসের, কোন তত্ত্বজ্ঞানের। স্বয়ং দেবাদিদেব তাঁদের শোনান তারকব্রহ্ম নাম—প্রদান করেন মুক্তি। তাই সেই পুণ্যলোভে হিন্দু নর-নারী বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর পূর্বে কাশীবাসী হন।

এইরূপ কথিত যে, পুরাকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ কাশী ক্ষেত্রের দক্ষিণদিকে পাপীদের দুর্মতি দলনী মহাপবিত্র 'অসি' নদীকে স্থাপন করেন। তার উত্তরে স্থাপিত হয় বরুণা নদী—বিঘ্ন বিনাশিনী বরুণা। স্বয়ং মহাদেবের আদেশে গণেশ কাশীধামের পশ্চাৎভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হন। বরুণা ও অসির মধ্যে অবস্থিত কাশী—তাই এর অন্য নাম বারাণসী ধাম।

বলা হয় যে, কাশীতে এলেই শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। কাশীবাসী সমস্ত

জলচর ও স্থলচর প্রাণীই রুদ্ররূপী শিব। এস্থানের এমনই মাহাত্ম্য যে, জীবের মধ্যে শিব প্রকট হয়ে ওঠেন। মৃত্যুর পর শিবের মাঝে বিলীন হয় লোকে কাশীতে মারা গেলে। সর্বশ্রেষ্ঠ দশ রুদ্র এখানে বাস করেন, তাই কাশীর অন্য নাম রুদ্রাবাস। মহাভূতগণ কল্পান্তকালেও এখানে শয়ন করে থাকেন, সেকারণে কাশীকে মহাশ্মশানও বলা হয়।

অনাদি অনন্ত অবিমুক্ত পুরী এই ধাম এবং অনাদিদেব মহেশ্বর তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই কাশীধামের প্রসিদ্ধি—শিব এখানে তাঁর আপন ক্ষেত্র রচনা করে আবির্ভূত হয়ে আছেন জ্যোতির্লিঙ্গাবতারে যাঁর নাম বিশ্বেশ্বর—বিশ্বনাথ।

কিম্বদন্তী, কারো কারো কাছে কল্প কথা মনে হতে পারে, কিন্তু ওপরের বর্ণনা থেকে একথা মনে করা যায় যে, বহু প্রাচীন সময় থেকেই কাশীর অস্তিত্ব ছিল এবং অতীতে সম্ভবতঃ প্রাক-বৈদিক কোন যুগে এর স্থাপনা হয়েছিল। কাশী রাজ্যের রাজধানী ছিল বারাণসী—পৃথিবীর বোধহয় সর্বাধিক প্রাচীন ও এখনও বর্তমান শহর। কাশীর উল্লেখ আছে বেদে। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে কাশীর পুরুরবার কাহিনী। কাশীর উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে ও জ্ঞান সংহিতাতে। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে কাশী সম্পর্কে লেখা আছে,—"অতঃ কাশয়োঽগ্নিনা দত্তম্" (১৩।৫।৪।১৯)। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে,—"যজ্ঞং কাশীনাং ভরতঃ সাত্বতামিব।" রামায়ণের কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে (৪০।২২) পাওয়া যায় যে, কাশী তখন একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল। মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণেও পবিত্রতম তীর্থ বলে কাশীর উল্লেখ আছে।

যখন আর্যগণ উত্তর ভারতের নানা স্থানে ধীরে ধীরে তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করছিলেন, সম্ভবতঃ তখনই তাঁরা কাশী নগরী প্রতিষ্ঠা করে থাকবেন। সে সময় থেকে এ স্থান শৈবধর্মমতের পীঠভূমি ও আর্যদের এক মহাপবিত্র তীর্থ হিসাবে গণ্য ছিল। এখনও অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ হিসাবেই এর প্রসিদ্ধি।

কাশীখণ্ডে উল্লিখিত আছে যে, ভগবান বিষ্ণুই সর্বপ্রথম দেবাদিদেবের এই জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন পেয়েছিলেন এই কাশীতে। তিনি তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে একটি পুষ্করিণী খনন করেন এবং নিজ স্বেদ-বারিতে সেই পুষ্করিণী পরিপূর্ণ করেন। তারপর ঐ পুষ্করিণী তীরে বসে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ সহস্র বছর কঠোর তপস্যা করেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হন, পার্বতীসহ বিষ্ণুকে দর্শন দেন এবং তাঁর অভিলষিত

বর প্রার্থনা করতে বলেন। সেই সময় শিবের মণিভূষিত কর্ণভূষণ সেই চক্র-পুষ্করিণীর নিকট পড়ে। সেইজন্য ঐ স্থানের নাম হয় মহামণি-কর্ণিকা বা মণিকর্ণিকা। মহাপুণ্যস্থানে পরিণত হয় এই স্থান। মহেশ্বর শিবের বরে বিষ্ণু জগতের পালন কার্যে নিযুক্ত হন। সে স্মৃতি মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান আজও বুকে ধরে আছে। বিষ্ণু যে জ্যোতি-র্লিঙ্গের দর্শন পেয়ে আরাধনা করেছিলেন তিনিই বিশ্বেশ্বর (পরে বিশ্বনাথ) জ্যোতির্লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ।

পূর্বে মণিকর্ণিকেশ্বর, দক্ষিণে ব্রহ্মেশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর ও উত্তরে ভারভূতেশ্বর, এই চতুঃসীমান্তর্গত ক্ষেত্রই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র। দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর এখানে অবিমুক্তেশ্বর, তিনি কখনও এই মহাক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না। তিনিই এই মহাক্ষেত্রের একেশ্বর অধিপতি। এই কাশীক্ষত্র তাঁর লীলাক্ষেত্র—এর প্রতিটি ধূলিকণা শিবময়। খুব সম্ভবতঃ বিশ্বনাথেই সুসমন্বয় হয় বৈদিক যুগের মহাদেবের সঙ্গে প্রাক-বৈদিক যুগের কাশী বিশ্বেশ্বরের। কাশীখণ্ডে উল্লিখিত আছে যে, মহাপবিত্র জ্ঞানবাপীর উত্তরদিকে সম্ভবতঃ বিশ্বেশ্বরের প্রথম মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে এখন এক মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে। সেই প্রথম মন্দিরকে কেন্দ্র করে তারই অনুকরণে গড়ে ওঠে কাশীক্ষেত্রের অন্যান্য মন্দিরগুলি এবং মহাপবিত্র জ্ঞানবাপীও খনিত হয়েছিল। এই মন্দিরটি সে সময় মহেশ্বরদেবের মন্দির নামে পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী মহাশ্মশান মণিকর্ণিকার কাছে এটি অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউহেন সাঙ ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

এই কাশীধামে সুপ্রাচীন কাল থেকে বহু মুনি-ঋষি তাপস জীবন কাটিয়েছেন, মহাপুরুষেরা এসেছেন—থেকেছেন, নিষ্ঠাবান শিবভক্তরা বসবাস করেছেন—আজও সেই ধারা সমানে চলছে। এখানে বৌদ্ধ ধর্মও একদা খুব প্রসার লাভ করে—সারনাথ স্তূপ তার নিদর্শন।

ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল কাশী রাজ্য। ব্রহ্মদত্ত বংশের নৃপতিরা এখানে রাজত্ব করতেন, পরে কাশী কোশলরাজের অধিকারে আসে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাশী ভারতে শক্তিশালী চারটি রাজ্যের অন্যতম ছিল। মগধ নৃপতি হর্যঙ্ক বংশের বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু কোশলরাজ প্রসেনজিতের কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুকে কাশী গ্রাম দান করেছিলেন। এরপর হর্যঙ্ক বংশের

পতন হলে কাশী একে একে মগধের শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য ও সুঙ্গ বংশের রাজাদের অধীনস্থ হয়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বারাণসী উজ্জয়িনী কৌশাম্বী নৃপতিদের অধীন হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সম্রাট কণিষ্ক কাশী অধিকার করেন।

প্রাচীনকালে কাশী রাজ্যের রাজধানী এবং কাশীতীর্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। কাশীর সেই প্রাচীন রাজধানী বর্তমানের শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ছিল। আমরা এখন যাকে কাশী বা বারাণসী অথবা বেনারস বলে বুঝে থাকি তখন তা ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কাশীর রাজধানী হিসাবে উল্লেখ দেখা যায়, বারাণসীর নাম। এছাড়া কোথাও কোথাও কাশীর রাজধানীর নাম বানারসও বলা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বরুণা ও অসির মধ্যবর্তী স্থানই বারাণসী এবং আর্যগণ বারাণসী ক্ষেত্রের জন্য এই অতুলনীয় স্থান নির্বাচন করে ধন্য হয়েছেন যেখানে স্বয়ম্ভু শিব স্বয়ং বিরাজ করছেন। কাশীর দিকে গঙ্গায় কখনো চড়া পড়েনি বা পড়বেও না। কাশীক্ষেত্রে ভূমিকম্পের তীব্রতা কখনও অনুভূত হয়নি। এরজন্য কাশীকে তীর্থরাজ বলা হয়।

কথিত যে, কাশীর রাজন্যবর্গের মধ্যে কাশ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁরই নামানুসারে রাজ্যের নাম কাশী হয়। আরও বলা হয় যে, ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বানার' নামে এক মহা প্রতাপান্বিত নৃপতি কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই এ রাজ্যকে 'বানারস' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত কাশী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ এবং বারাণসী তার রাজধানী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও বর্তমান শহর থেকে সারনাথের দিকে পথিমধ্যেই প্রাচীন নগর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ফা-হিয়ানের সময় থেকে হিউয়েন সাঙ-এর সময়ের ভিতর কম বেশী দু'শ বছর ব্যবধান। এই দীর্ঘ সময়ে কোন দৈব-দুর্ঘটনায় বা হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষেই হোক বা মিহিরকুল অত্যন্ত বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁর অত্যাচারেই হোক, পুরাতন নগরের পূর্বাংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই হিউয়েন সাঙ্ নব প্রতিষ্ঠিত নগর দেখে থাকবেন এবং তিনি তারই উত্তর-পূর্বকোণে সারনাথের স্তূপ ও সঙ্ঘারামের বর্ণনা করে গেছেন। আবার Murray's লিখিত বই Hand Book of Bengal-এ উল্লেখ দেখা যায় যে, জয়চাঁদ কাশীর রাজা ছিলেন ও তাঁর দুর্গ রাজঘাটের কাছে ছিল।

এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য থেকে ধারণা হয় যে, রাজঘাট থেকে বরুণার ধারেই কখনো বা কিঞ্চিৎ পূর্বে এবং কখনো বা কিঞ্চিৎ পশ্চিমে রাজ-ঘাটের কাছেই এই শহর অবস্থিত ছিল। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরুণার উত্তর অংশেই কাশী রাজ্যের রাজধানী ছিল। তখন আধুনিক শহর বিশ্বনাথের পঞ্চক্রোশী বারাণসীর কেন্দ্রস্থল নির্জন ও কেবল সাধু-সন্ন্যাসীর তপোবনস্বরূপ ছিল। কাশীর সর্বপ্রধান তীর্থ চিরকাল জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। মণিকর্ণিকার পার্শ্বস্থিত মহাশ্মশান হরিশ্চন্দ্রঘাট পুরানো শহরের বাইরেই ছিল।

হিউয়েন সাঙ্-এর বর্ণনানুযায়ী সেকালে কাশীধাম ৪০০০লি অর্থাৎ ৩৩৩ ক্রোশ এবং কাশীর রাজধানী বারাণসী নগরী ১৮ লি অর্থাৎ প্রায় দেড় ক্রোশ দৈর্ঘ্য ও ৬লি অর্থাৎ প্রায় অর্ধ ক্রোশ প্রস্থে বিস্তৃত ছিল। সেসময় বৌদ্ধ বেশী ছিল না নগরীতে। এখানে তখন সহস্রাধিক দেবমন্দির ও কুড়িটি মাত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। কিন্তু তখন বারাণসী-ধামে একটিও বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম বা বিহার ছিল না। হিন্দুর এই পরম মোক্ষধাম বারাণসীতে পাষাণময় উচ্চ-চূড়শোভিত উপবন ও তড়াগ-বেষ্টিত দশটি দেবমন্দিরের অপূর্ব ভাস্করশিল্পযুক্ত মণ্ডপ ও নাটমন্দির দেখে চীন পরিব্রাজক বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেসময় বারাণসীতে ৬৬ হাত বা প্রায় তিরিশ মিটার উঁচু তাম্রময় মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মোক্ষলক্ষ্মী বিলাস মন্দিরে। কি মহান ছিল সেই শিবমূর্তি, কি গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল সে দেববিগ্রহ—ঠিক যেন জীবন্ত বলে মনে হত। হিউয়েন সাঙ্-এর পর আচার্য শঙ্করও বারাণসীর সমৃদ্ধ অবস্থা দেখেছিলেন। তিনি অসংখ্য দেবালয় পরিবেষ্টিত তখনকার কাশীক্ষেত্রের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুসলমানদের রাজত্বকালে কাশী নগর বরুণা নদীর দক্ষিণতটের নিকটে অবস্থিত ছিল। এখন নগরের সম্মুখভাগ মাত্র গঙ্গার তীরে।

দশম শতাব্দীতে বিশ্বেশ্বরের নাম হল বিশ্বনাথ। তখন কাশীতে গহড়বালরা রাজত্ব করতেন। গহড়বাল বংশের শেষ নৃপতি জয়চন্দ্র ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর হাতে পরাজিত হলে বারাণসী ঘোরীর অধিকারে আসে এবং তাঁর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন সেসময় সুপ্রসিদ্ধ মহামহিমময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটি ধ্বংস করেন। সেসময় কাশীধামের অন্যান্য দেবমন্দিরও ধ্বংস করা হয়েছিল।

তারপর বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দিরের চত্বরের কাছেই পুনর্নির্মিত হয়

অন্য মন্দির। তখন দিল্লীর মসনদে আসীন ছিলেন সুলতান ইলতুত্‌মিস (১২১১-১২৩৬)। এই সময়েই গুজরাটের ধনী শেঠ বস্তুপাল বিশ্বনাথের পূজার জন্য এক লক্ষ মুদ্রা দান করেন।

এরপর মুসলমান বিজেতারা আরও কয়েকবার বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করেন। মন্দির বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সিকন্দর লোদীর রাজত্ব-কালে। প্রতিবারেই ভক্তরা জ্যোতির্লিঙ্গকে গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখতেন, সে কারণে দেববিগ্রহ ধ্বংস বা কলুষিত করতে পারেনি বিধর্মীরা। কখনও, বিশ্বনাথও ত্যাগ করেননি কাশী। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিশ্বনাথের মন্দির আবার তৈরী হয়েছিল জ্ঞানবাপীর কাছে বৌদ্ধ বিহারের অবস্থিতিতে (পরবর্তীকালে সম্রাট ঔরঙ্গজেব ঐখানে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন)। সে-সময় কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত নারায়ণ ভাটের প্রচেষ্টায় মন্দির গড়ে ওঠে, তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আকবরের মন্ত্রী রাজা তোডরমল্ল। এই মন্দিরটি নির্মাণ করতে প্রায় ৪৫ হাজার দিনার ব্যয় হয়েছিল, সম্রাট আকবরের তহবিল থেকে সেই অর্থ দেওয়া হয়। গোপন স্থান থেকে জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বনাথকে নিয়ে এসে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। মূর্তিমান ত্রাস কালাপাহাড়ের আক্রমণেও কাশী ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির কোন কারণে রক্ষা পায়।

১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব নারায়ণ ভাটের কৃত মন্দিরটি ধ্বংস করেন। ঔরঙ্গজেবের আক্রমণের আগেই জ্যোতির্লিঙ্গকে গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে মন্দির বিগ্রহশূন্য করে রাখা হয়েছিল। শূন্যমন্দির ধ্বংস করেছিলেন ঔরঙ্গজেব। ভক্তরা জ্যোতির্লিঙ্গ বিগ্রহকে জ্ঞানবাপীর কূপের জলের নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের আদেশে বিশ্বনাথের মন্দিরের অধিষ্ঠিত স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয় যাতে হিন্দুরা ঐ পবিত্রস্থানে বিশ্বনাথের মন্দির পুনর্নির্মিত করতে না পারে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব কাশীধাম পরিত্যাগ করে চলে যাবার অব্যবহিত পরেই ভক্তেরা বিশ্বনাথ মন্দিরের অধিকৃত স্থানে পুনরায় মন্দির নির্মাণ করেন এবং জ্ঞানবাপীর অভ্যন্তর থেকে বিগ্রহটি বার করে মন্দিরে রাখেন। আবার বিশ্বনাথের পূজারতি আরম্ভ হয়। তখন ঐ মন্দিরে কয়েকটি প্রতিমূর্তিও স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে ১০৮ বছর অতিবাহিত হলে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরের মহারাণী পুণ্যশীলা অহল্যাবাঈ বর্তমান বিশ্বনাথের মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় পনেরো

মিটার। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ মন্দির শিখর স্বর্ণ মণ্ডিত করে দেন।

কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরটি নাগর পদ্ধতি অনুসারী মন্দির। গর্ভ-গৃহের আকৃতি চতুষ্কোণ। মন্দিরের বহিরঙ্গের নিম্নাংশও চতুষ্কোণাকৃতি, সেখান থেকে ক্রম হ্রাস্বমান হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে গেছে তার বক্রাকার শিখর। মন্দির গাত্রের অলঙ্করণ অপূর্ব! শীর্ষদেশে রয়েছে অমলক আর কলস। ওপরে শিব-প্রতীক ত্রিশূল শোভমান। বিশ্বনাথের মন্দিরের অঙ্গনে দেবদেবীর অনেক মূর্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে, মন্দিরের নাটমন্দিরকে মধ্যস্থলে রেখে দুইদিকে দুটি মন্দির নির্মিত হয়েছে।

জ্ঞানবাপী বহু প্রাচীন। প্রবাদ যে, মহাদেবের জলময় মূর্তি এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপী। শিব শব্দের অর্থও জ্ঞান, সলিলরূপে অবস্থিত সেই জ্ঞান এই তীর্থ। তাই এই জ্ঞানবাপীকে বলা হয় জ্ঞানোদ। সেই অনাদিযুগে যখন পৃথিবী ছিল জলমগ্ন—সাগর ছাড়া ছিল না অস্তিত্ব কোন নদ-নদী-ঝর্ণা-তড়াগের। সেই সময় পরমেশ্বর শিব অবি-মুক্তেশ্বরক্ষেত্র বারাণসীতে উপনীত হন। এখানে এসে শিব দেখলেন বিরাজ করছেন ব্রহ্মাদি দেবগণ, সিদ্ধ ঋষিরা তাঁরই লিঙ্গমূর্তি বিশ্বেশ্বরের (বিশ্বনাথের) সেবক হয়ে।

এঁদের সঙ্গে অপ্সরা, কিন্নর, বিদ্যাধর এঁরাও অর্চনা করছেন জ্যোতির্লিঙ্গের, সকলে লাভ করছেন পরমানন্দ। এই আনন্দঘন মুহূর্তে মহাদেবের বসনা জাগল শীতল জলে তাঁরই মহালিঙ্গরূপকে আস্নাত করাতে। নিকটে কোথাও জল না থাকায় রুদ্রমূর্তি ধরে শিব হস্তধৃত ত্রিশূল মৃত্তিকায় প্রোথিত করলেন অনতিদূরে তাঁর দক্ষিণ দিকে—একটি কূপের সৃষ্টি হল ঈশানের ত্রিশূলাঘাতে। সেই কূপ থেকে উত্থিত হল অপর্যাপ্ত বারি। তখন মহাদেব সেই জল দিয়ে সহস্রধারা কলসে মহানন্দে তাঁর সেই জ্যোতির্লিঙ্গরূপকে সহস্রবার স্নান করালেন। আত্ম-প্রসন্ন হলেন পিনাকী বিশ্বাত্মা কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের (বিশ্বনাথের) শীতলতায়। শিবের ইচ্ছায় শিব-প্রতিভূ বিশ্বেশ্বর জ্ঞান সলিলভাবে এখানে রইলেন জগৎ-কল্যাণ মানসে। সেই কূপটি তদবধি পরিচিত হয় জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানোদ নামে। জ্ঞানবাপী দর্শনে জীব সর্বকষ্ট মুক্ত হয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ ফললাভ করে—এ শিবোক্তি।

বিশ্বনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা সন্ধ্যা-আরতি ও সপ্তর্ষি পূজা। রাত্রি

তিনটায় অনুষ্ঠিত হয় প্রাণারতি, বেলা সাড়ে এগারটায় হয় রাজভোগ। রাজভোগ বিলি হয় ভক্তদের জন্য। রাজভোগের পর সন্ধ্যারতি, রাত সাড়ে নটায় শৃঙ্গার আরতি, রাত সাড়ে এগারটায় শয়নারতি। প্রতিটি আরতির আগে দুধ, দই, ঘোল ও মধু দিয়ে জ্যোতির্লিঙ্গকে স্নান করান হয়, তারপর চন্দন ও কর্পূরে অনুলেপন করা হয়। আরতির সঙ্গে বাজে বাদিত্র—গুরুগম্ভীর তার শব্দ। শুরু হয় সপ্তর্ষি পূজা ও তার সঙ্গে বেদ-পাঠ। বেদপাঠ করেন পুরোহিতমণ্ডলী। এক রহস্যময় অলোকসুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিশ্বনাথ শোনেন সেই বেদমন্ত্র ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে। শিবলিঙ্গকে মহামূল্য বসনে ও ভূষণে সজ্জিত করে শৃঙ্গার আরতি করা হয়—মহিমময় বেশে কিন্তু শান্ত পরিবেশে।

শয়নারতিতেও দেবতার বেশ বর্ণনাতীত সুন্দর। এ সময় ডমরু বাজে মৃদু-মন্দ ধ্বনিতে—এক মহাপ্রশান্তি নিয়ে রহস্যময় পরিবেশে পরিণত হয় সারা দেবালয়।

কাশীধামে শিবের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মন্দির ও বিগ্রহের কথা কিছু কিছু ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এখানে অন্যান্য শিবলিঙ্গ যেমন—কেদারনাথ, কালভৈরব ও পশুপতিনাথ রয়েছেন—এঁরা অতিশয় জাগ্রত ও প্রসিদ্ধ। এছাড়া অপরাপর উল্লেখযোগ্য দেব-দেবীর মধ্যে বিন্দুমাধব, সাক্ষী গণপতি, বিশালাক্ষ্মী, দুর্গা, সঙ্কটমোচন ও আদিকেশরের মন্দির রয়েছে।

বিশ্বনাথের শক্তি হিসাবে জগন্মাতা পার্বতী কাশীধামে—অন্নপূর্ণারূপে বিরাজিতা। ইনি সাক্ষাৎ মাতৃস্বরূপা হয়ে জীব-জগৎকে জীবনরসে সঞ্জীবিত করছেন। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার কাছে অসহায় আতুর আকুলতা নিয়ে নিবেদিত হলেই তাঁরা কল্যাণ আশীর্বাদে তাদের সর্বব্যথা দূর করেন। এঁরা সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ। কত মানুষ যে অলৌকিকভাবে এই কাশীধামে এসে পরিত্রাণ লাভ করছে তার হিসেব নেই।

কাশীধামে অন্নপূর্ণার মন্দির মহাপবিত্র ক্ষেত্র। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিধর্মীর দ্বারা এই মন্দির শেষবারের মত বিধ্বস্ত হয়। তারপর ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের অকলুষিত পবিত্র মূর্তিটিসহ নতুন মন্দির দক্ষিণী রাজা নির্মাণ করান। দেবী মূর্তি জীর্ণ হয়ে গেছে বলে স্বর্ণাবরণে আবৃত থাকে। কাশীখণ্ডে অন্নপূর্ণা 'ভবানী' নামে বর্ণিত। দেবী অন্নপূর্ণা কাশীর নিত্য দেবতা। দীপান্বিতার সময় অন্নকূট উৎসব এখানে মহা-সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়।

কাশীর দশাশ্বমেধঘাটের জল মহাপবিত্র। এই পুণ্য সলিলে

অবগাহন করলে মানুষ অচিরাৎ সর্বপাপ মুক্ত হয় বলে কথিত। প্রবাদ যে, এই স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মা মনু বংশীয় নৃপতি দিবোদাসের সাহায্যে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। দিবোদাস ব্রহ্মার বরে পৃথিবীর একেশ্বর অধিপতি হয়েছিলেন। দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ধূমরাশিতে আকাশমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করেছিল। আজও এখানকার আকাশ নীলবর্ণ থাকে। দশাশ্বমেধঘাটে দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মাশ্বর নামে দুটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। কথিত যে, স্বয়ং ব্রহ্মাই যজ্ঞান্তে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতের এক মহা পুণ্য স্থান এই দশাশ্বমেধ ঘাট।

বিশ্বেশ্বর শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বের হিতের জন্য কাশীতে স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গরূপে অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিরাজ করছেন। কাশীক্ষেত্র শিবক্ষেত্র। এখানে ভগবানের অবতাররূপে গৌতম বুদ্ধ এসেছেন, শ্রীচৈতন্য এসেছেন। এখানে এসেছেন মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা। এখানে অবস্থান করেছেন, বিচরণ করে ফিরেছেন 'জীবন্ত শিব, ত্রৈলঙ্গস্বামী'। শিবভূমি কাশীর মাহাত্ম্যের শেষ নেই। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার কৃপায় যেমন শিবানুগামী ভক্তরা এখানে এসে দেবতার চরণে পূজাঞ্জলি নিবেদন করে ধন্য হয়, তেমনই দেখা যায় বিশ্বনাথের টানে ছুটে আসে দস্যু তস্কর বিধর্মী পরধর্মদ্বেষী ঔরঙ্গজেব, কালাপাহাড়েরা। একদল বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ ঢেলে প্রসাদ পায় শিব আশীর্বাদ আর অন্যের বিকৃত আচরণই বুঝি দেবতাকে স্বীকার করার একটি রূপ—কামনার সাফল্যে তারাও শিব আশীর্বাদে বঞ্চিত নয়। পরম পুরুষ মহিমময় বিশ্বনাথের প্রিয় সবাই—তাঁর এই লীলাময় জগৎ। তিনি তাই সবাইকে কোল দেন—তিনি যে বিশ্বের নাথ!

শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর

মহাদেবের অষ্টম জ্যোতির্লিঙ্গের নাম ত্র্যম্বকেশ্বর। মহারাষ্ট্রের নাসিক শহর থেকে উনত্রিশ কিলোমিটার দূরে গোদাবরী নদীর উৎসের কাছে এই জ্যোতির্লিঙ্গ বিরাজিত। এই স্থান হিন্দুদের কাছে মহাতীর্থ। নাসিক অঞ্চল অতি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ এক পবিত্র স্থান। এখানে সতীদেবীর নাসিকা পড়ায় নাকি এর নাম নাসিক হয়েছে, এটি বাহান্ন পীঠের এক পীঠ। আবার অন্য প্রবাদ যে, এখানে লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করেছিলেন বলে এ স্থানের নাম নাসিক হয়েছে। এই মহাপবিত্র জনপদে আবহমানকাল ধরে শিব ত্র্যম্বকেশ্বর

জ্যোতির্লিঙ্গরূপে অবস্থান করছেন। ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরের সন্নিকটে বিন্ধ্যগিরি থেকে পুণ্য তোয়া গোদাবরীর উৎপত্তি।

কথিত যে, শিব উপাসক মহাতপস্বী ঋষি গৌতমের প্রার্থনায় মহাদেব ত্র্যম্বকেশ্বর রূপ ধারণ করে এখানে আবির্ভূত হয়েছেন— "...ত্র্যম্বকং গৌমতী তটে।" এই জ্যোতির্লিঙ্গের ধ্যান ও পূজা করলে শিব তাঁর ভক্তের মনোস্কামনা পূর্ণ করেন বলে মানুষের বিশ্বাস। বহু মানুষ এখানে ত্র্যাম্বকেশ্বরের পূজা করে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হয়েছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ (রাবণেশ্বর)

বৈদ্যনাথধামে অবস্থিত রাবণেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ বা শ্রীবৈদ্যনাথ শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম—ইনি নবম জ্যোতির্লিঙ্গাবতার। এই লিঙ্গ মূর্তি বিহার প্রদেশের দেওঘরে বিরাজ করছেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে পরম রমনীয় পরিবেশে বৈদ্যনাথ মন্দির অবস্থিত। উত্তরে শিবগঙ্গা নামে এক দীর্ঘ সরোবর আছে—লোকে একে কীর্তিনাশা রাবণের প্রস্রাবও বলে থাকে।

মহাদেবের এখানে জ্যোতির্লিঙ্গাবতার রূপে আবির্ভাবের পশ্চাতে প্রচলিত আছে এক কিংবদন্তী। মহাবলী লঙ্কেশ্বর রাবণ ত্রিলোকের অধিশ্বর হবার বাসনায় ব্রহ্মার দুশ্চর তপস্যা করেন। তুষ্ট ব্রহ্মার বরে রাবণ পৃথিবী জয় করলেন—ত্রিলোকের অধিশ্বর হলেন। তখন তাঁর মনে বাসনা জাগলো দেবাদিদেব মহেশ্বরকে নিজ স্কন্ধে বহন করে স্বর্ণ-লঙ্কায় নিয়ে যেতে হবে ও সেখানে তাঁকে পুরীর দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করে রাখতে হবে। শিবভক্ত দশানন শিবকে নিজের সর্বপ্রকার নিরাপত্তার জন্য ধরে রাখতে চান। শিব তাঁর রাজপুরীর রক্ষক হয়ে থাকবেন। এই ইচ্ছা মনে পোষণ করে লঙ্কেশ্বর কৈলাসে গিয়ে উপনীত হলেন। একাগ্র মনে কৃচ্ছসাধন করে দুশ্চর তপস্যা করলেন মহাদেবের। সহস্র বিল্বপত্র দিয়ে আশুতোষের পূজা করলেন তিনি। রাবণের আরাধনায় মহাদেব তুষ্ট হ'য় তাঁর স্কন্ধে আরোহন করে অমরাপুরী লঙ্কায় যেতে রাজি হলেন। কিন্তু এক শর্ত রইল। যাত্রা কালে রাবণ শিবকে স্কন্ধচ্যুত করে পদমাত্র অগ্রসর হতে পারবেন না—সেরকম কিছু ঘটলে বিরিঞ্চি আর লঙ্কায় যাবেন না। শিবের কৃপা লাভ করে লঙ্কেশ্বর মহা আনন্দিত হয়ে মহাদেবকে তাঁর কাঁধে তুলে স্বর্ণলঙ্কার দিকে গমনরত হলেন।

ব্যাপার দেখে দেবকুল দারুণ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। শিবের কৃপায় অজেয় হয়ে দশানন তো যা ইচ্ছা তাই করবেন। দেবতাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে—শান্তি বিঘ্নিত হবে। তাঁরা সবাই পরামর্শ করে শরণাপন্ন হলেন বরুণদেবের এবং রাবণের উদরে প্রবেশ করতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। সেইমত বরুণদেব অলক্ষ্যে রাবণের উদরে প্রবেশ করলেন। তার ফলে মহাদেবকে কাঁধে নিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ প্রচণ্ড মুত্রবেগ অনুভব করলেন দশানন। কিছুতেই তিনি আর সে প্রচণ্ড বেগ চেপে রাখতে পারেন না—অসহনীয় সেই বেগ। এদিক সেদিক চেয়ে রাবণ দেখলেন পাশ দিয়ে যাচ্ছেন এক সৌমকান্তি বিপ্র। তাঁকে রাবণ নিজের অবস্থার কথা জানালেন এবং অনুরোধ করলেন শিবকে কিছু সময়ের জন্য কাঁধে নিয়ে থাকতে, তাহলে তিনি মুত্রত্যাগ করে মহাদেবকে আবার কাঁধে তুলে নেবেন। ব্রাহ্মণ রাজি হলেন। তখন লঙ্কাপতি মহাদেবকে নিজের অবস্থার কথা জানিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে, কিছুক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণের স্কন্ধে তাঁকে (শিবকে) স্থাপন করে প্রাকৃতিক কৃত্য সম্পাদন করবেন। মহাদেব রাজি হলেন এক নির্ধারিত সময়ের শর্তে। কিন্তু বরুণদেবের মায়ায় রাবণের মুত্রবেগ আর কমে না—অবিরাম গতিতে চলে। কত মুহূর্ত অতিবাহিত হয়। ক্রমে এক স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয় মুত্রধারা। এদিকে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তখন মহাদেবকে ধরিত্রীর অঙ্কে স্থাপন করে বিপ্র আপন গন্তব্য পথে ফিরে যান। শিব লিঙ্গমূর্তি পরিগ্রহ করে সেখানেই রয়ে গেলেন, রাবণের কোন অনুরোধ শুনলেন না। তাঁর কাতরতাতেও দ্রবিভূত হলেন না তিনি। শর্ত মত রাবণের লঙ্কাপুরীতে মহাদেব আর যাবেন না। শেষে শিবকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে না পারায় আশাহত হয়ে রাবণ মহাদেবকে তুলে স্কন্ধোপরি স্থাপনের চেষ্টা করলেন প্রাণপণ কিন্তু তাঁকে নড়াতে পারলেন না এক চুলও। তখন মহাক্রোধে দশানন তাঁর আরাধ্য দেবতার শিরে প্রচণ্ড এক মুষ্টাঘাত করে লঙ্কায় ফিরে গেলেন। ফিরে যাবার আগে অবশ্য শিবকে পূজা করতেও ভুললেন না। সেইদিন থেকে ঐ জ্যোতির্লিঙ্গ 'রাবণেশ্বর' নামে এই পবিত্র ক্ষেত্রে অবস্থান করছেন।

রাবণের মূত্র জমে সৃষ্টি হল বিশাল শিবগঙ্গার।

এরপর কতশত বছর না জানি কেটে গেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে এক গভীর অরণ্য পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেন রাবণেশ্বর। তারপর

লোক-কল্যাণের জন্য তিনি প্রকট হতে ইচ্ছা করলেন। ঐ বনের ধারে এক গ্রামে বৈদ্যনাথ নামে এক গো-পালক থাকত, সে প্রতিদিন অরণ্য প্রান্তরে পশু চরাত। বৈদ্যনাথ হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করল যে, তার একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে গভীর বনে চলে যায়। গাভীটি যখন ফিরে আসে তখন দেখা যায় তার বাঁটে এক ফোঁটা দুধও অবশিষ্ট নেই। কোথায় যায় সে গাভী, কে দোহন করে তার দুধ? এই চিন্তা মনে নিয়ে একদিন সেই গো-পালক গাভীটিকে অনুসরণ করে দেখে সেই গরু একটি শিলাখণ্ডের ওপর অজস্র ধারায় তার দুগ্ধ ঢালছে। বৈদ্যনাথ মৌনমুগ্ধ হয়ে অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে এই স্বর্গীয় দৃশ্য। পরে ভাবকম্পিত অন্তরে গৃহে ফিরে আসে। রাত্রে স্বপ্নে তাঁকে দেখা দেন রাবণেশ্বর—জানান তাঁর আবির্ভাবের কথা—পূজা ও প্রচারের জন্য তাকে আদেশ করেন। রাবণেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। এই ভাবে দেবাদিদেব মহাদেব রাবণেশ্বর, জ্যোতির্লিঙ্গরূপে বৈদ্যনাথধামে আবির্ভূত হন। ভক্ত বৈদ্যনাথের নামানুসারে তার নাম হয় বৈদ্যনাথ। নিত্য এখানে আসে শত শত পুণ্যকামী মানুষ—আরাধনা করে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার—দেব-চরণে মনের কামনা-বাসনা রাখে। এখানে মঙ্গলময় শিব কত না মানুষের মনোবাসনা পূর্ণ করে চলেছেন।

বৈদ্যনাথধামের রাবণেশ্বর শিবের মূল মন্দির এক সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত—তাকে বেষ্টন করে আছে বাইশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির। বৃহত্তম মূল মন্দিরটির আয়তনের মধ্যে আছে গর্ভগৃহ, অলিন্দ ও মণ্ডপ, মাথার ওপর সুউচ্চ চূড়া বা শিখর। গর্ভমন্দির সর্বদা আঁধারে মগ্ন থাকে, সেখানে বিরাজিত রাবণেশ্বর লিঙ্গ অর্থাৎ শ্রীবৈদ্যনাথ। মন্দিরটিকে কবে কে নির্মাণ করেছিলেন তা জানা যায় না। মন্দিরটির স্থাপত্য-সৌন্দর্য অপূর্ব ও মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণ অত্যন্ত উচ্চমানের। এক গৌরবময় যুগের ঐতিহ্য বহন করছে মন্দিরের শিল্প-কীর্তি।

তীর্থযাত্রীরা শিবগঙ্গায় স্নান করে শিবমূর্তি দর্শন করেন এবং পূজা দেন। ফুল, বিল্বপত্র এবং দেওঘরের 'পেড়া' দেবতার পূজায় নিবেদন করা হয়। মনে ভক্তি নিয়ে রাবণেশ্বর দেবের চরণে যে কামনা রাখা যায় তাই-ই ভগবান পূর্ণ করেন মানুষের এই বিশ্বাস।

মন্দিরটি ঘোষণা করছে প্রাচীন ভারতের এক অবিনশ্বর কীর্তির বার্তা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই মন্দিরটি যে ঐতিহ্যমণ্ডিত,

রাবণ রাজার কাহিনী যতই কেন না অলীক মনে হোক, এই সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়।

শিবের নবম জ্যোতির্লিঙ্গ দুটি ভারতের দুই বিভিন্ন স্থানে একই শ্রীবৈদ্যনাথ নামে অবস্থান করছেন। এঁর দ্বিতীয় অধিষ্ঠান ক্ষেত্রটি হচ্ছে দক্ষিণ-ভারতে হায়দ্রাবাদের কাছে পার্লীতে।

শ্রীনাগেশ্বর

দেবাদিদেব মহাদেবের দশম জ্যোতির্লিঙ্গ হলেন পরম দ্যুতিময় শ্রীনাগেশ্বর। আমাদের শাস্ত্রে এঁরও দুটি অবস্থানক্ষেত্র নির্দেশিত হয়েছে। প্রথমটি গুজরাট প্রদেশের পুণ্যভূমি মহাতীর্থ দ্বারকার সন্নিকটে অবস্থিত ও অন্যটি হায়দ্রাবাদের কাছে আউধ গ্রামে। দ্বারকায় স্থিত জ্যোতির্লিঙ্গ বিগ্রহটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। মানব কল্যাণর মূর্ত-প্রতীক হয়ে ভক্ত ও সাধুদের রক্ষা এবং দুষ্ট ও ব্যাভিচারীকে দণ্ড দেবার জন্য শিব এখানে শ্রীনাগেশ্বররূপে বিরাজিত।

দ্বারকার কাছে শিবের শ্রীনাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গরূপে প্রকটিত হওয়ার পশ্চাতে এক পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। পুরাকালে এখানে ছিল দারুকা নামে দুর্ভেদ্য ভয়াল ভয়ঙ্কর এক অরণ্য। বিশাল বিশাল জীবজন্তু ও বিষধর সর্প সমাকীর্ণ এ অরণ্য অধিকার করে বাস করতো দারুক নামে দৈত্য। তারই নাম অনুসারে ঐ বনের নাম। দারুক ছিল ভয়ঙ্কর ক্রুর, অত্যাচারী ও শিব-বিদ্বেষী। একদিন ঐ বনে শিবভক্ত সুপ্রিয় বৈশ্য নামে এক ব্যক্তি পথ হারিয়ে দারুকের কবলে পড়েন। দৈত্যের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েও সুপ্রিয় রেহাই পান না। দারুক তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলে সুপ্রিয় তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবকে শরণ করেন। প্রিয় ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানে মহেশের ধ্যান ভাঙ্গে কৈলাসে। তিনি দারুকা বনে আবির্ভূত হয়ে দারুককে সংহার করে ভক্তকে রক্ষা করেন। কথিত যে, শিব নাকি সর্পরূপে তীব্র বিষাঘাতে জর্জরিত করে দৈত্যকে বধ করেছিলেন। তাই নাকি এই জ্যোতির্লিঙ্গের নাম হয়েছে নাগেশ্বর। সর্পযজ্ঞোপবীত বক্ষে ধারণ করে, কণ্ঠে তীব্র হলাহল নিয়ে নীলকণ্ঠ তো নাগেশ্বরই। এখানে পরমেশ্বর শিব নানা প্রকার লীলা করে জগদম্বার সঙ্গে লিঙ্গরূপে বিরাজ করছেন। শ্রীনাগেশ্বর দর্শন ও অর্চন করলে মহাপাতকীরও সর্বপাপ নাশ হয়—তার কলুষ হরণ করেন সর্বকলুষহারী করুণাময় শিব।

শ্রীরামেশ্বর

শিবের একাদশতম জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রীরামেশ্বর তামিলনাডু প্রদেশের রামনাদ জেলায় রামেশ্বরমে সাগরকূলে শ্রীরামেশ্বরের মন্দির। মহাতীর্থ রামেশ্বরম্—সমুদ্র ও অরণ্যে মিলে এর চারিদিক ঘিরে অপরূপ সৌন্দর্য-সুষমা। রামেশ্বরমে যেতে হলে পাম্বান হয়ে যেতে হয়। পাম্বান থেকে এই মহাতীর্থ মাত্র বারো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

ত্রেতাযুগে যখন শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা পালন করবার জন্য দণ্ডকারণ্যে বাস করছিলেন তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে সীতাদেবীকে হরণ করে নিয়ে যান লঙ্কায়। সীতাকে দেখতে না পেয়ে রামচন্দ্র উন্মাদ-প্রায় হয়ে 'হায় সীতা, হায় সীতা' বলে রোদনরত হয়ে তাঁর অন্বেষণ করতে থাকেন। পথের মধ্যে জটায়ুকে ক্ষত-বিক্ষত দেহে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন এবং তাঁর মুখে রাবণ সীতাকে বলপূর্বক হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেছে এই কথা শুনে যুগপৎ দুঃখে কাতর ও ক্রোধে প্রদীপ্ত হন।

তারপর শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের বিপুল বানর বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হন। মাত্তাপমের নিম্নদেশ থেকে সেতু নির্মাণ আরম্ভ করেন। প্রথমেই পাম্বান দ্বীপকে সেতুদ্বারা ভারত-ভূমির সঙ্গে যোগ করেন। তারপর তাঁরা পাম্বান দ্বীপে অবস্থিত গন্ধ-মাদন পর্বতের ওপর আরোহণ করে স্বর্ণলঙ্কা অবলোকন করে পুনরায় ধনুষ্কোটি হতে সেতু নির্মাণ আরম্ভ করেন। পূর্তবিদ্যাবিশারদ বিশ্বকর্মা-পুত্রের বুদ্ধি-চাতুর্যে এবং সুগ্রীবের বানর-চমূর সাহায্যে রামচন্দ্র সেতুর নির্মাণ কার্য শেষ করেন। সেতুটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ষোল ক্রোশ। বড় বড় পাথরের চাঁই ও বালির সংযোগে এটি নির্মিত। প্রথমে এর দৈর্ঘ্য প্রায় চল্লিশ ক্রোশ ছিল।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর নির্মিত সেতুর ওপর দিয়ে গিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করে যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত ও নিহত করে সীতাকে উদ্ধার করেন। পুরাণে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে রাক্ষসীর গর্ভে রাবণের জন্ম হয় বলে রাবণ দ্বিজ ছিলেন। রাবণকে বধ করে রাম ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। ঐ পাপ খণ্ডনের জন্য ও জগতে লোকশিক্ষার জন্য বিষ্ণু অবতার শ্রীরাম-চন্দ্র মুনি-ঋষিদের শরণাপন্ন হলে তাঁরা তাঁর পাপ ক্ষালনের ব্যবস্থা দিয়ে তাঁকে বলেন যে, পাম্বান দ্বীপে গন্ধমাদন পর্বতের ওপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অর্চনা করলেই তিনি ব্রাহ্মণ হত্যাজনিত পাপ থেকে

মুক্তি লাভ করবেন। ঋষিদের কাছ থেকে এই কথা শুনে রামচন্দ্র তখন প্রিয়ভক্ত হনুমানকে হিমালয় থেকে একটি লিঙ্গ মূর্তি নিয়ে আসার জন্য তক্ষুণি প্রেরণ করেন। এদিকে মুনিরা যেমন বিধান দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী ক্রিয়া-কলাপ আরম্ভ হল। কিন্তু গোল বাধল হনুমান লিঙ্গ মূর্তি নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফিরছেন না দেখে। লগ্ন চলে গেলে মহাদেবের এ পূজায় ফল হবে না। সকলেই উদ্বিগ্ন। তখন সীতাদেবী একটি বালুকার লিঙ্গ মূর্তি গড়ে পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠা করলেন —বালুকাময় মূর্তিটি তক্ষুণি জমাট বেঁধে গেল। সেই লিঙ্গ মূর্তি যথা-বিহিত অর্চিত হল 'রামনাথ' নামকরণ করে।

এদিকে শিব পূজা সবে শেষ হয়েছে, রামচন্দ্র শিব-প্রসাদে পাপমুক্ত হয়েছেন, এমন সময় হনুমান হিমালয় প্রবাহিণী অলকানন্দার তীর হতে দুটি স্ফটিক শিবলিঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা না করে রামচন্দ্র ও সীতাদেবী বালুকা নির্মিত অন্য শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পূজা সমাধা করেছেন জেনে হনুমানের প্রচণ্ড অভিমান হল—আর অভিমানজনিত ক্রোধও হল। তিনি আনীত লিঙ্গ মূর্তি দুটি মাটিতে রেখে লাঙ্গুল সহযোগে প্রতিষ্ঠিত বালুকার লিঙ্গ মূর্তিকে উত্তোলন করতে উদ্যত হলেন কিন্তু প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করেও লিঙ্গ মূর্তিকে একচুল টলান গেল না। তখন অসহায় হয়ে মারুতি রামচন্দ্রের চরণে পতিত হয়ে নিজের মনোবেদনা ব্যক্ত করতে লাগলেন। ভক্তবৎসল রামচন্দ্র হনুমানের কাতরতা দেখে তাঁকে কি ব্যাপার ঘটেছিল তা জানালেন এবং ভক্তের প্রতি সহানুভূতি প্রণোদিত হয়ে আনীত লিঙ্গ মূর্তি দুটিকে বালুকা মূর্তির কিছু দূরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বালুকা মূর্তি সীতাদেবী কর্তৃক গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত। ঐ মূর্তি পূজার সময় দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং ঐ মূর্তিতে আবির্ভূত হওয়ায় ঐ মূর্তি রামেশ্বর বা রামনাথ জ্যোতি-র্লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। রামেশ্বরের পূতঃ অঙ্গে এখনও দেখা যায় হনুমানের লাঙ্গুল বেষ্টনের চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এস্থান হিন্দুদের মহাতীর্থ।

রামনাদাধিপ পাম্বান দ্বীপের রাজা। এঁরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সেতুপতিদের বংশধর। রামচন্দ্র ভারত থেকে পাম্বান দ্বীপ পর্যন্ত নির্মিত সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার এই বংশের কোন এক ভক্ত বীরকে অর্পণ করেছিলেন। লঙ্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরে রামচন্দ্র রামনাথ বা রামেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করে দেশে ফিরে আসেন তখন ঐ ভক্তবীরকে সেতুটি দান করে সেতুপতি আখ্যা দেন। সেইদিন থেকে ঐ

বংশ সেতুপতি নামে আখ্যাত হয়ে আসছে। ঐ ভক্তবীর সেতুপতিই সর্বপ্রথম রামনাথ লিঙ্গের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। ঈশ্বরের দয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বারবার যাত্রী সমাগম হতে থাকায় সেতুপতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে।

রামেশ্বর মন্দির উন্নতমানের দ্রাবিড় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

পরবর্তীকালে এই মন্দির সংস্করণ ও নতুন প্রাকার গঠন করতে প্রায় ৩৫০ বছর লেগেছিল। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এর নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রামনাদরাজ মথুরামলিঙ্গের আমলে শেষ হয়। মন্দির প্রবেশের চারটি গোফুরম আছে।

মন্দির অভ্যন্তরে সেতুপতি নৃপতিদের বংশাবলীর ঐতিহাসিক বিবরণ ধাতু ও প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে।

রামেশ্বর মন্দির শিল্প-নৈপুণ্যে ও রচনা চাতুর্যে অতুলনীয়। মন্দির অভ্যন্তরের দরদালানের মত প্রকাণ্ড দরদালান কোথাও নেই। রামেশ্বর মন্দিরের দরদালান সর্বসমেত ৪০০০ ফিট বা ১২০০ মিটার লম্বা। বিচিত্র শিল্প রচনায় চিত্রিত স্তম্ভশ্রেণীর ওপর স্থাপিত রয়েছে বিরাট ছাদ। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনুমান যে, মন্দিরটি পাঁচ হাজার বছর পূর্বের তৈরী।

আবহমানকাল ধরে শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিরোধ চলছে। বিষ্ণুর অন্যতম অবতার শ্রীরামচন্দ্র স্বহস্তে এই জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরুদ্ধভাব অপনয়ন করেন। উভয় সম্প্রদায়ের লোক এখানে দেবাদিদেব মহাদেবকে সমভাবে পূজা করে আসছে।

গর্ভমন্দিরের সম্মুখের বারান্দার পর নাটমন্দির। নাটমন্দির প্রাঙ্গণে প্রোথিত আছে এক সোনার তাল গাছ। তারপর সুবর্ণময় বেষ্টনী দেওয়া একটি বেদী, সেখানে যাজক বেদপাঠ করেন। তারপর রয়েছে মূল মন্দির অর্থাৎ গর্ভমন্দির। মন্দির মধ্যে সুবর্ণ বেদীর উপরে অর্ধহস্ত পরিমিত জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই লিঙ্গমূর্তি বৈশিষ্ট্যময়। মূর্তিটি সর্বদাই একটি সোনার পঞ্চমুখবিশিষ্ট ঢাকনায় ঢাকা থাকে। জ্যোতি-র্লিঙ্গের শিরোপরি ছত্ররূপী পঞ্চফণা বিস্তারিত কালফণী। বিগ্রহের দক্ষিণে রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর মূর্তি স্থাপিত। মন্দিরের গায়ে অপরূপ শিল্প কার্য ও দেবদেবীর মনোরম উৎকীর্ণ মূর্তি মন হরণ করে—শিল্প-কার্য সত্যই অপূর্ব! রামেশ্বরের মূর্তির পাশেই অবস্থিত রামেশ্বরী দেবীর মন্দির। ইনি রামেশ্বরের শক্তিস্বরূপা পার্বতী।

রামেশ্বর মন্দিরে বারো মাসে তের পার্বণ। বৈশাখে বসন্ত উৎসব,

জ্যৈষ্ঠে প্রতিষ্ঠোৎসব, আষাঢ়ে বিন্ধ্যোৎসব, শ্রাবণে কল্যাণোৎসব, ভাদ্রে মাতবোৎসব, আশ্বিনে দশহরোৎসব, কার্তিকে বঙ্কোৎসব, অগ্রহায়ণে দীপোৎসব, পৌষে কুলিরোৎসব, মাঘে মাঘোৎসব, ফাল্গুণে মহাভিষেকোৎসব ও চৈত্রে অধিবাস উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠোৎসব, কল্যাণোৎসব ও মহাভিষেকোৎসবই প্রধান।

এ ছাড়া রামেশ্বর মন্দিরের সাপ্তাহিক উৎসবও উল্লেখযোগ্য। প্রতি শুক্রবার মন্দিরে দেবী রামেশ্বরীর সহযোগে একটি উৎসব হয়ে থাকে। রাত নটায় দেবীকে নয় প্রকার রত্নে সাজিয়ে শোভাযাত্রা করে বাজনা বাজিয়ে বেদপাঠ ও দেবদাসীদের চারু নৃত্যের মধ্যে দিয়ে রামেশ্বরের কাছে আনা হয়। দেবী রামেশ্বরকে বাটা অর্থাৎ সম্মানসূচক পান সুপারী প্রদান করেন। তারপর মালা বদল অনুষ্ঠানাদির পর দেবীকে নিজ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। ভক্তি ভালবাসা ও আনন্দের সংমিশ্রণে উৎসব অপূর্ব ভাবময় হয়ে ওঠে।

রামেশ্বর মন্দিরে দেবতার প্রাত্যহিক পূজার শেষ পর্ব শয়নারতি ও তার পূর্বে শোভাযাত্রা বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। শোভাযাত্রা করে বাজনা বাজিয়ে রামেশ্বরের উৎসব মূর্তিকে পুরোহিতরা রামেশ্বরীর মন্দিরের নিকটে নিয়ে যান। পার্বতীর মন্দিরের নিকটবর্তী একটি কক্ষে শিব-পার্বতীর শয়নের ব্যবস্থা।

রামেশ্বর মন্দিরের মধ্যে ২২টি তীর্থ আছে। এই তীর্থগুলি হল ঃ—

(১) মহালক্ষ্মী তীর্থ (২) সাবিত্রী তীর্থ (৩) গায়েত্রী তীর্থ (৪) সরস্বতী তীর্থ (৫) মাধব তীর্থ (৬) গন্ধমাদন তীর্থ (৭) গবাক্ষ তীর্থ (৮) গয় তীর্থ (৯) নল তীর্থ (১০) নীল তীর্থ (১১) শঙ্খ তীর্থ (১২) শঙ্কর তীর্থ (১৩) ব্রহ্মহত্যা বিমোচন তীর্থ (১৪) সূর্য তীর্থ (১৫) গঙ্গা তীর্থ (১৬) চন্দ্র তীর্থ (১৭) যমুনা তীর্থ (১৮) গয়া তীর্থ (১৯) শিব তীর্থ (২০) সত্যামৃত তীর্থ (২১) সর্ব তীর্থ (২২) কোটি তীর্থ।

এ ছাড়াও মন্দিরের বাইরে আছে ২১টি তীর্থ। মন্দিরের মধ্যে নটরাজের একটি নৃত্যপরায়ণ মূর্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

রামেশ্বর মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেব এসে শিব লিঙ্গের পূজা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসেছিলেন। রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি ছিলেন স্বামীজীর একান্ত অনুগত ভক্ত। জননী সারদাদেবী রামেশ্বর দর্শনে এসে ১০৮টি স্বর্ণ বিল্বপত্রে শ্রীরামেশ্বরের পূজা করেছিলেন।

বিশ্বনাথ যে বিশ্ব ভুবনময় ছড়িয়ে আছেন, তিনি যে সর্বজীবে বিরাজিত রামেশ্বর মন্দিরের জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রীরামেশ্বর বা শ্রীরামনাথকে দর্শন করা মাত্র মনে এই ভাব জেগে ওঠে।

শ্রীঘুষ্‌মেশ্বর

শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের দ্বাদশতম লিঙ্গ মূর্তি হলেন শ্রীঘুষ্‌মেশ্বর বা ঘ্রুষ্‌নেশ্বর যিনি এখন সাধারণের কাছে ঘুষ্‌মেশ্বর নামেই আখ্যাত। এই অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গ দাক্ষিণাত্যে ঔরাঙ্গাবাদ জেলার ইলোরা গ্রামে এক স্থাপত্য সৌন্দর্যে পূর্ণ মনোরম মন্দিরে বিরাজ করছেন। ইনি হিন্দুদের চিরজাগ্রত মঙ্গলবিধায়ক সর্ব মনস্কামনাপূরক দেবতা হিসাবে প্রসিদ্ধ। মন্দিরটি ইলোরার বিখ্যাত গুহামন্দিরগুলি থেকে ১'৫০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে। মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য এই যে, বারটি জ্যোতির্লিঙ্গের এগারোটিই উত্তরমুখী কিন্তু শ্রীঘুষ্‌মেশ্বরের মন্দির পূর্বমুখী। মন্দিরের দরজা হিন্দু-অহিন্দু নির্বিশেষে সকল তীর্থযাত্রী বা দর্শনেচ্ছুদের জন্য খোলা থাকে।

শ্রীঘুষ্‌মেশ্বরের আবির্ভাব সম্পর্কে প্রচলিত আছে এক কিম্বদন্তী। পুরাকালে ভারতবর্ষের দক্ষিণে দেবশৈল নামক স্থানে ঘ্রুশ্‌না বাঈ বা ঘুষ্‌মা বাঈ নামে একজন শিবভক্ত মহিলা ছিলেন। সুদেহ্য নামে এক প্রতাপশালী দৈত্য ঘুষ্‌মাকে বিদ্বেষ করতো এবং নিরপরাধ ঘুষ্‌মার পুত্রদের সুদেহ্য হত্যা করে। তখন ঘুষ্‌মা বাঈ কাতর প্রাণে পুত্রদের জীবন ভিক্ষা করে শিবের কাছে প্রার্থনা করেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে মহাদেব এখানে প্রকট হয়ে ঘুষ্‌মার পুত্রদের পুনর্জীবন দান করেন এবং সুদেহ্য দৈত্যকে সংহার করেন। ভক্তিমতী ঘুষ্‌মা বাঈ-এর পূজা ও প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে আশুতোষ এই স্থানে জ্যোতির্লিঙ্গাবতাররূপে অবস্থান করছেন। এঁর নাম হয় ঘ্রুষ্‌নেশ্বর বা ঘ্রুষ্‌মেশ্বর যা ক্রমে লোকমুখে ঘুষ্‌মেশ্বর হয়েছে।

এ সম্পর্কে অপর এক জনকথা এইরকম। কবে কোন্ যুগে এই জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল কেউ জানতো না। প্রথমে দেব-বিগ্রহের নাম ছিল 'কুমকুমেশ্বর'। ভক্তিমতী ঘ্রুশ্‌না বাঈ প্রত্যহ নিষ্ঠাভরে এই লিঙ্গ মূর্তির পূজা করতেন। তাঁর পূজায় তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে দেখা দিলেন এবং বর নিতে বললেন। ঘ্রুশ্‌না শিবপদ ছাড়া কিছুরই অভিলাষী ছিলেন না, পার্থিব কোন কামনাও তাঁর ছিল না।

তিনি শিবের মাঝে লীন হয়ে শিবত্ব আকাঙ্ক্ষা করলেন। ঘ্রুশ্নার অন্তিম কামনা অনুসারে শিব-ইচ্ছায় জ্যোতির্লিঙ্গের নাম হল ঘ্রুশ্নেশ্বর। ক্রমে ক্রমে ঘ্রুষমেশ্বর—ঘুষ্মেশ্বর।

শ্রীঘুষ্মেশ্বরের মন্দির হিন্দুদের এক মহাপবিত্র তীর্থস্থান। পদ্মপুরাণে এই জ্যোতির্লিঙ্গের সম্পর্কে উল্লেখ আছে। মহারাষ্ট্রের ভোঁস্‌লা পরিবারের ইনি কুলদেবতা (পরবর্তীকালে কিভাবে এই দেববিগ্রহ ভোঁস্‌লা পরিবারে এল তার সঠিক ইতিহাস নেই)। এই পরিবারের সন্তান মহানায়ক ছত্রপতি শিবাজী। কথিত যে, ভগবান ঘুষ্মেশ্বরের আশীর্বাদ ছিলো যে, ভোঁসলা পরিবারে এমন একজন রাজা জন্মাবেন যিনি অব্দ প্রবর্তক হবেন।

সর্বপ্রথম এখানে মন্দির নির্মিত হয়েছিল ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। রাজা কৃষ্ণরাও তাঁর ভাইপো রাষ্ট্রকূট রাজ দিগ্বিজয়ী দান্তিদুর্গের ইচ্ছানুসারে মন্দির নির্মাণ করেন। জ্যোতির্লিঙ্গ ঘুষ্মেশ্বর ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন। পরবর্তীকালে মালহররাও হোলকারের প্রথমা পত্নী গৌতমাবাঈ বা বাঈজাবাঈ মন্দিরটির সবিশেষ সংস্কার করেছিলেন। ইনি পুণ্যশ্লোকা অহল্যাবাঈ হোলকারের শ্বশ্রূমাতা।

শ্রীঘুষ্মেশ্বরের মন্দিরের স্থাপত্য সে যুগের ভারতীয় শিল্প-গরিমাকে প্রকাশ করছে। একচূড় মন্দির—কারুকার্যময় ধাপ নিয়ে স্তরে স্তরে উঠে গেছে মন্দির শীর্ষ—গঠন ভঙ্গিমা অপূর্ব।

মন্দিরের নিম্নার্ধ লাল পাথরের তৈরী এবং শীর্ষদেশ সোনার পাত দিয়ে মোড়া। মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যভাগে পূজা-দেবীর ওপর জ্যোতির্লিঙ্গ ঘ্রুশ্নেশ্বর (ঘুষ্মেশ্বর) প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরগাত্রে বহু দেবদেবীর মূর্তি খচিত রয়েছে। যার মধ্যে গণেশদেবতার মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। সম্মুখের বিস্তৃত কক্ষটি প্রস্তর নির্মিত ও ২৪টি স্তম্ভ সমন্বিত। এটি নাটমন্দির। পাথরের স্তম্ভের উপর খোদিত কারুকার্য নয়নতৃপ্তিকর। এই কক্ষের মধ্যে জ্যোতির্লিঙ্গের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা শ্বেত পাথরের বৃষভ মূর্তিটি দেখবার মত। মন্দির ঘিরে আছে বিস্তীর্ণ প্রাচীর। পূর্বদিকে প্রধান প্রবেশ দ্বার—তার পাশেই নহবৎখানা। মন্দিরের পাশ দিয়ে বইছে পুণ্য নদী ইলা গঙ্গা।

বর্তমান ঘুষ্মেশ্বরের মন্দিরের প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ইলোরার বিখ্যাত গুহা-মন্দির 'কৈলাস'। আজ এই শিবদেউল বিগ্রহ শূন্য জীর্ণদশা প্রাপ্ত হলেও এর বিস্ময়কর স্থাপত্য সৌন্দর্য বিশ্বের বিস্ময়।

এককালে এই মন্দির খুবই গরিমামণ্ডিত ছিল। অনেকের মতে কৈলাস একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যময় শিবদেউল ছিল। মাত্র এক হাজার বছর আগেও কৈলাস শৈলগুহা মন্দির ছিল ভারতবর্ষের এক প্রসিদ্ধ শিব-মন্দির ও মহাতীর্থস্বরূপ। দেশ-দেশান্তর থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রীরা এখানে শিব দর্শনে ও শিব অর্চণে সমবেত হত। যেমন কলকোলাহল পূর্ণ ছিল, তেমনই স্বর্গীয় আনন্দে ভরে থাকতো এই অঞ্চল। আজ তার স্মৃতিটুকুও সজীব হয়ে নেই, শুধু মহাকালের বুকে ভগ্ন মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। তবু জীর্ণ শূন্য হলেও কৈলাস মন্দির তার অপরূপ শিল্প-সৌন্দর্য নিয়ে আজ তার মুখর নীরবতার মধ্যে অতীতের সজীব দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়।

কথিত আছে যে, প্রথমে জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রীঘুষ্মেশ্বর এই মন্দিরেই নাকি অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে, কৈলাস মন্দির ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট-রাজ শিব-ভক্ত দন্তীতুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। কেউ কেউ বলেন দন্তীতুর্গের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্য রাজা কৃষ্ণরাও দন্তীতুর্গের অন্তিম ইচ্ছাপুরণের জন্যে এই মন্দির তৈরী করেন। দেখা যাচ্ছে কৈলাস মন্দির ঘুষ্মেশ্বরের মন্দিরের (এটি নির্মিত হয় ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্বে নির্মিত হয়েছিল; তাই জ্যোতির্লিঙ্গের সেখানে অবস্থানের সম্ভবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো কোন কারণে পরবর্তীকালে জ্যোতির্লিঙ্গকে বর্তমান মন্দিরে নিয়ে আসা হয়েছিল। মহামন্দির কৈলাসের কিছু বর্ণনা তাই এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

বিশাল পর্বতের বক্ষ বিদীর্ণ করে এই বিশাল মন্দির সৃষ্টি হয়েছিল। এই শিব-নিকেতনের বিপুল আয়তন এবং এর অসামান্য স্থাপত্য কৌশল ও ভাঁস্কর্য নৈপুণ্য দেখে অবাক হয়ে না ভেবে পারা যায় না যে, মানুষের পক্ষে এই শিল্প গড়া সম্ভব হল কি করে! হয়তো সবই সম্ভব হয়েছে দেবাদিদেব মহাদেবের ইচ্ছায়। নাকি বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় এ কাজ বিশ্বকর্মার! এ মন্দির তৈরী হতে না জানি কত দিন লেগেছিল! কৈলাসের অসামান্য পরিকল্পনা ও অপূর্ব কারুকার্য বিশ্ব-বিশ্রুত তাজ-মহলকেও নিষ্প্রভ করে দেয়।

কৈলাস মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরে যে সকল অতিকায় ঐরাবত, সিংহ, বৃষভ, গরুড় প্রভৃতি জীবজন্তুর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে সেগুলি আজও দেখলে জীবন্ত মনে হয়। মন্দিরের গায়ে দেখতে পাওয়া যায় তারা

কেউ চরে বেড়াচ্ছে, যুদ্ধ করছে অথবা শত্রুকে পদদলিত করছে।

ভিত্তিভূমির তলপত্তনের ওপর প্রশস্ত দালান, সুদৃশ্য চতুষ্কোণ স্তম্ভরাজি, দ্বারমণ্ডপ, পুণ্যপীঠ আসনবেদী প্রভৃতি সে যুগের ভাস্করদের অসাধারণ কলা-কৌশল ও রূপদক্ষতার পরিচয় দেয়।

মন্দিরগাত্রে মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনী পাষাণ-চিত্রে উৎকীর্ণ করা আছে তা দেখে অনেকে কৈলাসের নাম 'গিরিকাব্য' রেখেছেন। মন্দির পূর্ব-পশ্চিমে ১৬৪ ফিট (৪০ মিটার) লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে ১০৯ ফিট (৩৩ মিটার) লম্বা। মন্দিরের চারদিকেই চারটি ৪৫ ফিট (১৪ মিটার) উঁচু ধ্বজস্তম্ভ আছে। মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে উৎকীর্ণ চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। লঙ্কেশ্বর রাবণ স্বয়ং বাহুবলে কৈলাস পর্বতকে সমূলে উৎপাটন করতে চেষ্টা করছেন। কৈলাসশৃঙ্গে হর-পার্বতী বসে রয়েছেন। পার্বতী সভয়ে যেন পতিকে জড়িয়ে ধরেছেন—একজন পরিচারিকা প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে। চিত্রটি অপূর্ব! মন্দিরের ভিত্তিমূলে বেদীর গায়ে যে সব হাতীর মূর্তি খোদিত করা হয়েছিল সেগুলি অবিকল যেন জীবন্ত হাতী।

মন্দির প্রাঙ্গণটি পরিবেষ্টন করে চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা ঘুরে গেছে, বারান্দাটি কোথাও দ্বিতল কোথাও বা ত্রিতল। এই বারান্দার দেওয়ালের গায়ে সারি সারি নানা দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। অপূর্ব ভাস্কর্য নিদর্শন। বাঘেশ্বরী, কালী, কালভৈরব, নিয়তি, মহাকাল প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তিগুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৈলাস মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বাইরে দশ অবতারের মূর্তিগুলি খোদিত আছে। ভিতর দিকে উভয় পার্শ্বে পর্বতখোদিত কক্ষ বা বাসগৃহ দেখা যায়। দ্বার সম্মুখে প্রকাণ্ড কমলার মূর্তি—পদ্মাসনা লক্ষ্মীর শিরে গজযূথ-শুণ্ডের দ্বারা জলসিঞ্চন করছে।

মন্দির প্রাঙ্গণের ডানে ও বামে দুটি বিপুলকায় ঐরাবত দণ্ডায়মান—তার মধ্যে একটি ভগ্নপ্রায়। প্রাঙ্গণের সম্মুখে সুবৃহৎ নন্দীপীঠ—এটি দ্বিতল এবং মন্দির ও তোরণ শীর্ষের সঙ্গে সেতুদ্বারা সংযুক্ত। এই নন্দীপীঠের উভয় পার্শ্বে পূর্বোক্ত চতুষ্কোণ জয়স্তম্ভ আছে। নন্দীপীঠের মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত করেছে যে সেতু তার নীচে পরস্পর বিপরীত দিকে শিবের দুটি বৃহদাকার মূর্তি আছে—একটি তাঁর কালভৈরব মূর্তি অন্যটি যোগেশ্বর মূর্তি।

দ্বিতলের ওপর মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ পথের দু'পাশে গদা স্কন্ধে

দুই শৈব দ্বারপালের মূর্তি। ভিতরে স্তম্ভ বিশিষ্ট দালান। ছাদকে ধরে আছে স্তম্ভগুলি। বোঝা যায় ছাদের অভ্যন্তর সুন্দর সুন্দর চিত্র দ্বারা শোভিত ছিল। দালানের পূর্ব প্রান্তে গর্ভ মন্দির বা বিগ্রহ গৃহ। বিগ্রহ গৃহের দরজার উপর দাঁড়িয়ে আছেন—দেবী পার্বতী। তাঁর উভয় পাশে ব্রহ্মা. বিষ্ণু, দেবগণ ও গন্ধর্ববৃন্দের মূর্তি। চারিদিকে শিব-শিবানী ও নানা দেবদেবীর ভগ্নপ্রায় মূর্তি রয়েছে।

বিগ্রহ গৃহটি প্রায় ১৫ × ১৫ বর্গ ফুটের অর্থাৎ ৪·৫ × ৪·৫ বর্গ মিটারের একটি সাধারণ চতুষ্কোণ কক্ষ। ছত্রতলে একটি শুধু বড় শতদল ফুল খোদাই করা। এরই মধ্যে বেদীর ওপর হয়তো জ্যোতির্লিঙ্গ ঘৃষ্ণেশ্বর অধিষ্ঠিত ছিলেন। যদিও এর সমর্থনে প্রামাণ্য কিছু নেই কেবল কিম্বদন্তী ও অনুমান ছাড়া। তবু 'কৈলাসে' সম্ভবতঃ লিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কারণ রাঠোর রাজাদের সৌভাগ্যের যুগে মধ্যভারতে লিঙ্গায়েৎ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাবই খুব বেশী ছিল।

ভারতবর্ষে যতগুলি শিবমন্দির গড়ে উঠেছে তার মধ্যে এই 'কৈলাস' শৈলগুহামন্দির বাস্তবিকই একটি বৃহৎ ও মহিমাময় মন্দির ছিল।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরম দেবতা শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের বর্ণনা থেকে ধারণা হয় যে, স্বয়ম্ভুশিব স্বয়ং জ্যোতির্লিঙ্গাবতারে জগদ্ধিতায় ও জগৎ রক্ষায় আবির্ভূত হয়েছেন। মহাদেবের ঘোরা ও অঘোরা রূপ অর্থাৎ তাঁর সংহার রূপ ও মঙ্গলময় রূপ দুইই অভিব্যক্ত হয়েছে জ্যোতির্লিঙ্গের মাহাত্ম্য বিকাশের মধ্যে। ঐ বর্ণনাগুলি থেকে আর এক বিষয়ও লক্ষ্য করা যায়, তা হল অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গগুলিকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশ জুড়ে শৈবধর্মের প্রচার করেছিলেন শিব অনুগামীরা। অনেক রাজন্যবর্গও যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শৈবধর্মের প্রচারের জন্যই জ্যোতির্লিঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল কিনা তাও বিচার্য বিষয়, কিন্তু শিব অনুগামীরা প্রচারব্রত গ্রহণ করে মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য যে কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে সঙ্কল্প সাধন করে ভারতের সর্বত্র শৈব ও ধর্মমত প্রচার করেছেন এবং জগদীশ্বর সত্য সুন্দর শিবকে মানুষের সমাজে, তার গৃহে ও তার প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে কর্মোদ্যমের কথা চিন্তা করলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। হয়তো শিবের ইচ্ছাতেই এসব হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে যে, আর্য-অনার্য

মিশ্রিত ভাবধারা যে সময়ে দানা বেঁধেছে এবং শৈব ধর্মমত বৈদিক ভারতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে, তার অনেক আগে থেকেই দ্রাবিড়-কৃষ্টি যখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তার আধিপত্য হারিয়ে দক্ষিণে আধিপত্য স্থাপন করেছে সে সময়েই সম্ভবতঃ শিববাদ পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যভারত অতিক্রম করে দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাই একথা বলা হয়ত ভুল নয় যে, বেদের অনেক আগে থেকে অনাদিদেব শিব ভারতের জন-মানসে মূর্ত ছিলেন।

শিবপুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও তাঁদের মাহাত্ম্যের কথা বিশেষ-ভাবে বলা হয়েছে। মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য সূত মুনি বর্ণনা করেছেন ও অন্যান্য মুনি-ঋষিরা তা শুনেছেন। এইভাবে প্রচার করা হয়েছে জ্যোতির্লিঙ্গ অবতার-মাহাত্ম্য।

মুনিবর সূতের মুখে শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অমর কথা শ্রবণ করে সমবেত মুনি-ঋষিরা দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন, "সমস্ত প্রকার বিকার রহিত হয়ে স্বকীয় ভুবনমোহিনী মায়া দ্বারা যিনি ত্রিভুবন ধারণ করে আছেন ও পরাশক্তি পার্বতীকে নিজ অঙ্গে ধরে রেখেছেন সেই তেজোময় শঙ্করকে নমস্কার। যাঁর করুণা কটাক্ষে স্বর্গ-বৈভব পেয়ে ধন্য হয় ভক্ত, যোগীরা যাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তি সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করে আছেন সেই পরম মঙ্গলময় শিবকে নমস্কার। যিনি আধি-ভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ নাশ করেন তাঁকে প্রণাম। পরমোজ্জ্বল স্বরূপ যুক্ত, সর্বসুখ দাতা, সর্ব মঙ্গলবিধায়ক শিব আমাদের কল্যাণ করুন।"

শিবচরণে মনোনিবেশ করে ঋষিকুল সূত মুনিকে অনুরোধ করলেন, "জ্যোতির্লিঙ্গগুলির মাহাত্ম্য আমাদের বলুন।" তখন ব্যাস-শিষ্য সূত উৎসুক মুনি-ঋষিদের জ্যোতির্লিঙ্গ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন যা তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে শুনেছিলেন। সমবেত মুনি-ঋষিদের সূত বললেন—"শিবের মানস-পূজা করে নিত্য জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রপাঠ করলে মানুষ আত্মজ্ঞ হয় ও পরম সুখ লাভ করে। শঙ্করের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গাবতাররূপ লোক-কল্যাণের জন্য প্রকটিত হয়েছে। এই মাহাত্ম্যপূর্ণ শিব-রূপকে অর্চনা করে মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে। জ্যোতির্লিঙ্গের আখ্যান শ্রবণ করে মানুষ সর্বপাপ রহিত হয়। উষাকালে যে কেউ এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্মরণ করলে তার অন্তর নির্মল ও পুণ্যালোকময় হয়। যে নরশ্রেষ্ঠ অন্তরে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে

এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের নাম-কীর্তন করেন তিনি নিশ্চয় ঐহিক ও পারত্রিক সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হন। শিব তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করেন। নিষ্কামভাবে যিনি এঁদের আরাধনা করেন তিনি মোক্ষ লাভ করেন।" এই কথাগুলি বলার পর সূত বললেন যে, ভগবান শিব তাঁর বিভূতি নিয়ে জগতে ওতঃপ্রোত রয়েছেন। এই জগৎই শিব-অবয়ব তাই তাঁর লিঙ্গ মূর্তির সম্পূর্ণ সংখ্যা নিরূপ অসম্ভব। এ সবের বর্ণনা করার সাধ্য কারো নেই, কারণ সমস্ত ভূমণ্ডলই অনাদি লিঙ্গের জ্যোতিতে আপ্লুত।

সূত মুনি আরও বললেন যে, 'দ্বাদশ লিঙ্গের অর্চনা করলে বাস্তবিক মানুষ সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা মুক্ত হয়। এই দিব্য লিঙ্গের প্রতি অর্পিত নৈবেদ্য যিনি গ্রহণ করেন তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। নিকৃষ্ট যোনিতে যে জন্মায় তার পরজন্ম উৎকৃষ্ট যোনি লাভ হয় এবং সে শ্রেষ্ঠ স্থলে জন্মলাভ করে ধনী, দেবপরায়ণ ও শ্রেষ্ঠ কর্মী হয়ে অন্তিমে মুক্তি লাভ করে। অতএব জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন ও পূজা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য!'

লক্ষ্য করার বিষয় হল মহাত্মা সূত শিবভক্ত, তিনি শিব মাহাত্ম্য প্রচার করছেন জনকল্যাণের জন্যে।

মহামুনি সূত তারপর বললেন, "হে ঋষিগণ! আমি এ পর্যন্ত আপনাদের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মাহাত্ম্য বললাম, এখন তাঁদের উপলিঙ্গের বৃত্তান্ত বলছি। ভূমি আর সাগরের সঙ্গমে সোমনাথের উপলিঙ্গ হলেন 'অন্তকেশ'—ইনি প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত শিবলিঙ্গ। মল্লিকার্জুন থেকে প্রকটিত হয়েছেন ভৃগুকক্ষে রুদ্রদেব—ইনি পরম সুখদাতা। মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ হতে উদ্ভূত হয়েছেন 'দুগ্ধেশ'—ইনি সর্বপাপ বিমোচক। ওঙ্কারেশ্বরের উপলিঙ্গ হলেন কর্দমেশ্বর, বিন্দু সরোবরে এঁর অবস্থান। উপলিঙ্গ কর্দমেশ্বর ভক্তের সর্ব কামনা পূর্ণ করেন। দিব্যলিঙ্গ কেদারেশ্বর হতে উৎপন্ন 'মুক্তেশ্বর' উপলিঙ্গ যমুনাতীরে বিরাজ করছেন। এঁর দর্শনে ও অর্চনে মহাপাতকও উদ্ধার পায়। ব্রহ্ম নামক পর্বতোপরি অবস্থান করছেন ভীমেশ্বর উপলিঙ্গ যিনি ভীমশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ হতে সমুদ্ভূত। এঁর পূজা করলে মানুষ সর্ব ত্রাস মুক্ত হয় ও আত্মিক বলে বলীয়ান হয়। সরস্বতী নদীর তটে আছেন পাপ-বিনাশক মহান উপলিঙ্গ 'ভূতেশ' যিনি জ্যোতির্লিঙ্গ নাগেশ্বর হতে উদ্ভূত। রামেশ্বর হতে উৎপন্ন উপলিঙ্গের নাম 'গুপ্তেশ্বর' ও ঘুষ্‌মেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের উপলিঙ্গ হলেন 'ব্যাঘ্রেশ্বর'।

উপলিঙ্গগুলির বর্ণনা করে মুনিবর জানালেন যে, জ্যোতির্লিঙ্গের মতই এঁদের মাহাত্ম্য। এঁদের দর্শনেও ঘটে অনেক পুণ্যলাভ।

এরপর ব্যাসশিষ্য অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিব লিঙ্গের বর্ণনা করলেন। ভাগীরথীর পবিত্র কূলে কাশীধামে বিশ্বনাথ ছাড়া দক্ষাশ্মেধ ও তিল-ভাণ্ডেশ্বর শিব বিরাজ করছেন। গঙ্গাসাগরের সামনে সমুদ্র সঙ্গমে 'সঙ্গমেশ' শিব লিঙ্গ রয়েছেন। কৌশিক নদীর তীরে 'ভূতেশ্বর' এবং 'নারীশ্বর' এই দুই শিব বিরাজ করছেন, যাঁরা অতিশয় জাগ্রত বলে প্রসিদ্ধ। এই পবিত্র লিঙ্গ শুভ ফল প্রদান করেন। ফল্গু নদীর তীরে পরম সুখদাতা শিব 'পুরেশ্বর' এবং গণ্ডক নদীতটে বটুকেশ্বর আপন বৈভব নিয়ে বিরাজমান। উত্তরে 'সিদ্ধতাথেশ্বর' ও 'হরেশ্বর' রয়েছেন যাঁদের দর্শন করলেই মানুষ সিদ্ধমনোরথ হয়। শৃঙ্গেশ্বর, বৈদ্যনাথ ও 'জয়েশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ দধিচী মুনির আত্মত্যাগের স্থানে অবস্থান করছেন। এখানে আরও রয়েছেন রামেশ্বর, গোপেশ্বর, রঙ্গেশ্বর, নাগেশ, কামেশ ও বিমলেশ্বর।

এছাড়া আছেন ব্যাসেশ্বর, ভাঙ্গেশ্বর, তুকারেশ্বর, মুরোচন, ভূতেশ্বর ও সঙ্গমেশ্বর নামক শিব লিঙ্গ যাঁদের দর্শন ও পূজন করলে সকল বিঘ্ন হতে মানুষ পরিত্রাণ পায়। তাপ্তি নদীর তীরে শিবের 'সিদ্ধেশ্বর', 'কুমারেশ্বর', ও সেনেশ' নামের দিব্য তিন লিঙ্গ মূর্তি আছেন। 'রামেশ্বর' 'কুম্ভেশ', 'নন্দীশ্বর', 'পূজেশ' ও 'পূর্বক' নামের শিব লিঙ্গও প্রসিদ্ধ। কাশী রাজ্যে ব্রহ্মা যে দিব্য লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যে লিঙ্গ দশাশ্বমেধ তীর্থে ব্রহ্মেশ্বর নামে খ্যাত তাঁকে পূজা করলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়। এখানে 'সোমেশ্বর' অবস্থিত হয়ে ভক্তকে সর্ব বিপদ হতে ত্রাণ করেন। আর এক তেজোময় লিঙ্গ মূর্তি আছেন 'ভাবদ্ধজেশ্বর' তিনি ব্রহ্মতেজ প্রদান করেন। 'শুলটকেশ্বর' মহাদেব পূর্ণ করেন সমস্ত কামনা। 'রাঘবেশ্বর' রয়েছেন ভক্তকে রক্ষা করতে। অযোধ্যাপুরীতে পরম পাবন 'নাগেশ' অধিষ্ঠিত আছেন যিনি সূর্য বংশীয় নৃপতিদের বিশেষরূপে সুখ সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্র পুরীতে ভগবান শিব 'ভুবনেশ' নামক প্রতীক লিঙ্গে অবস্থান করছেন। এই লিঙ্গ মূর্তি খুব প্রসিদ্ধ। আর আছেন 'লোকেশ' জগতের কল্যাণ ও আনন্দ বর্ধনের জন্য। 'শুক্রেশ্বর' লিঙ্গ মূর্তিতেও শিব মঙ্গল আশীর্বাদ দেন ভক্তকে। সিন্ধুনদের তীরে 'কপালেশ্বর' ও বক্রোশ নামক শিব লিঙ্গদ্বয় মানুষের সমস্ত পাপ-তাপ হরণ করেন। সাক্ষাৎ

শিবের প্রতিভূ হিসাবে 'কামেশ্বর', 'ঘৃতপপেশ্বর', 'ভীমেশ্বর' ও 'সূর্যেশ্বর' প্রতিষ্ঠিত আছেন। 'নন্দীশ্বর' সমস্ত সংসারে পূজিত। সাগর তটে রয়েছেন 'বিমলেশ্বর,' 'ভেঙ্কটেশ্বর' ও 'ধনুর্কেশ' শিবলিঙ্গ। 'চন্দ্রেশ্বর' চন্দ্রের মহান কান্তি প্রদান করেন। আর সেখানে আছেন সর্বমনোরথ পূরক শিব 'সিদ্ধেশ্বর' লিঙ্গরূপে। যেখানে ত্রিশূলী অন্ধক দৈত্যকে বধ করেছিলেন সেখানে তাঁর অবস্থান 'অন্ধকেশ' লিঙ্গ মূর্তিতে। ভগবান শিব আপন অংশকে 'শরণেশ্বর' নামক দিব্যলিঙ্গে স্থিত করে সমস্ত প্রাণীর সুখ প্রদান করছেন। আবু পর্বতের ওপর 'কর্দমেশ', 'কোটীশ' ও 'অচলেশ' নামক দিব্য লিঙ্গত্রয় বিদ্যমান। কৌশিকী নদীর তীরে 'নাগেশ্বর' 'অনন্তেশ্বর' রয়েছেন। এছাড়াও রয়েছেন 'বৈদ্যনাথ', 'যোগেশ্বর', 'সপ্তেশ্বর', 'কোটিশ্বর', 'ভদ্রেশ্বর,' 'চণ্ডীশ্বর' এবং 'সঙ্গমেশ্বর' এই বিখ্যাত শিবলিঙ্গগুলি। উত্তরে গোকর্ণক্ষেত্রে 'চন্দ্রভাল' নামক বিখ্যাত শিবলিঙ্গ লঙ্কেশ্বর রাবণ স্থাপন করেছিলেন বলে জনপ্রবাদ। ইনি সর্বসিদ্ধিদাতা। করুণাসাগর ভগবান 'চন্দ্রভাল' বৈদ্যনাথের মত জগতের কল্যাণের জন্য ব্যাপৃত। গোকর্ণক্ষেত্রে স্নান করে 'চন্দ্রভাল' শিবলিঙ্গের পূজা করলে শিবলোক প্রাপ্ত হয় বলে মানুষ বিশ্বাস করে। এঁর মহিমার বর্ণনা মহর্ষি ব্যাসও করতে অক্ষম। মিশ্রঋষি তীর্থে রয়েছেন 'দাধীচ' লিঙ্গ মূর্তি। নৈমিষারণ্যের পবিত্র ভূমিতে 'ঋষিশ্বর' দিব্যলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, ঋষিরা যাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেবপ্রয়াগে সর্বপাপবিনাশক ও সর্বতাপহর 'ললিতেশ্বর' দিব্যলিঙ্গ অবস্থান করছেন। নেপালে রয়েছেন 'পশুপতিনাথ'রূপে মহেশ্বর অনাদিকাল ধরে—মানুষকে দান করছেন চতুর্বর্গফল।

শিবঠাকুর দেশে দেশে
(পূর্ব-পশ্চিম-মধ্য-দক্ষিণ ভারতে শিব)

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ভারতের উত্তর প্রান্ত যাকে উত্তরাখণ্ড বলা হয় সেই হিমালয়ের পাদভূমি শিবের পীঠস্থান।

কৈলাস, কেদারনাথ, মনিমহেশ, অমরনাথ এগুলি দেবতীর্থ—শিবের খাস তালুক। এই মহাতীর্থগুলির মাহাত্ম্যের পরিমাপ নেই। কল্পনা কিম্বদন্তী ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সকল মহা-তীর্থ—আমাদের কল্পনার স্বর্গভূমি। ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্ত জুড়ে শিবের অধিষ্ঠান যদিও বিশ্বনাথ বিশ্বজুড়েই রয়েছেন। সেই কোন অনাদি অতীত কাল থেকে হয়ত বা মানব মন-বিকাশের উষাকাল থেকেই শিব-অবিব্যক্তি মানবমনে প্রতিভাত হয়ে চলেছে। শিব-ভাবনার রূপায়ণের মধ্যে মানুষ তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাচ্ছে। মানুষ এই কৈলাসে বা তার আশপাশের শিবক্ষেত্রগুলিতে পরমেশ্বর শিবকে প্রত্যক্ষ করে প্রাণের মধ্যে তাঁকে পেয়েছে তাঁর ধ্যানে—তার শিবার্চনার গভীর অনুরাগের আলিম্পনে। জ্যোতির্ময় শিবের দিব্য জ্যোতিতে অন্তর-আলোকিত করে যা তার ধ্যানলব্ধ হয়েছে সেই গরিমাময় শিব-ভাবনা প্রচার করেছে বুঝি দেবাদিদেবের ইচ্ছাতেই। মানব মঙ্গলের জন্য ও মানুষের মনকে শিব অভিমুখী করার জন্য স্থাপিত হয়েছে শিব দেউলের পর শিব দেউল। দেবাদিদেব মহাদেব ও শৈব ধর্মমতকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে কত কথা-কাহিনীর। ভারতবর্ষের উত্তর হতে দক্ষিণে, পূর্ব হতে পশ্চিমে শৈব ধর্ম প্রচার দ্বারা জীবনে জীবনে ছড়িয়ে গেছে শিব-চেতনার প্রভাব। এ সবের যাঁরা পুরোধা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সেই আদিযুগে মহামুনি বশিষ্ঠ—মহাতাপস অগস্ত্য প্রমুখেরা। আর পরবর্তী কালের মুখ্য প্রচারক মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য। এছাড়া ছিলেন অনেক কীর্তিমান রাজা ও নিষ্ঠাবান ভক্ত।

উত্তরাখণ্ডের আরও একটি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ হল উত্তর কাশী, পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর কূলে এই মহাপুণ্যস্থান অবস্থিত। দেখা যায় অমৃত স্বরূপিনী গঙ্গানদীর কূলে কূলে অধিকাংশ মহাতীর্থের সৃষ্টি হয়েছে উত্তরভাগে।

হিমালয়ের দেবভূমি হতে পতিতপাবনী জননী গঙ্গা তাঁর অমৃত নির্ঝরিণী নিয়ে মহাদেবের শির-জটাজাল ভেদ করে তাঁর আশীর্বাদ-পূতঃ হয়ে জীবমুক্তির জন্য মর্ত্যভূমিতে নেমে এসেছেন। গঙ্গাকে তপস্যায় তুষ্ট করে রাজি করিয়ে মর্ত্যধামে এনেছিলেন রাজা ভগীরথ। এর পশ্চাতে আছে এক কাহিনী।

পূর্বকালে ইক্ষাকু বংশে সগর নামে এক প্রতাপশালী ও দেবদ্বিজে-ভক্তিপরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলে ইন্দ্র মনে মনে ভাবলেন যে, রাজা সগর যজ্ঞ ভালভাবে সম্পাদন করতে পারলে স্বর্গ অধিকার করে নেবেন। এই আশঙ্কা করে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞাশ্ব হরণ করে পাতাল দেশে মহর্ষি কপিলের আশ্রমে রেখে এলেন, উদ্দেশ্য, যজ্ঞের লগ্ন সময় অতিক্রান্ত করিয়ে সগর রাজার যজ্ঞ পণ্ড করা। মহর্ষি কপিল তাঁর আশ্রমে ধ্যানমগ্ন ছিলেন; কিছুই অবগত হলেন না। সগর রাজার ছিল ৬০ হাজার ও ১ পুত্র। অপুত্রক তিনি শিবের তপস্যা করে এতগুলি পুত্র লাভ করেন মহাদেবের বর-প্রসাদে (তবে শিব বলেন যে, তাঁর ৬০ হাজার পুত্র অল্প বয়সেই কৃতকর্মের ফলভোগস্বরূপ মারা যাবে)। সগর পুত্ররা যজ্ঞাশ্ব অন্বেষণ করতে করতে কোথাও না পেয়ে পাতাল খুঁড়ে কপিল মুনির আশ্রমে অশ্বকে বাঁধা দেখতে পেল। মুনিকে কপটাচারী মনে করে গালি-গালাজ করতে লাগল। তাদের চীৎকারে মুনির ধ্যান ভেঙে গেল তিনি ব্যাপারটি জানতে পারলেন ও ক্রোধে তাঁর চক্ষু হতে অগ্নি বর্ষিত হতে থাকল, সেই অগ্নিতে সগরের ৬০ হাজার পুত্র ভস্মীভূত হল।

শোকসন্তপ্ত রাজা সগর মুনি-ঋষি ও পণ্ডিতদের পরামর্শে পৌত্র অংশুমানকে পাঠালেন কপিল মুনির আশ্রমে। অংশুমান কপিল মুনিকে স্তবে তুষ্ট করে জানতে পারলেন যে, স্বর্গ হতে কলুষনাশিনী গঙ্গাকে মর্ত্যে এনে সেই পুণ্য জল সগর পুত্রদের দগ্ধ দেহাবশেষে স্পর্শ করালে তবেই তাদের মুক্তি লাভ হবে।

সগর রাজা এ কার্য করতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর তাঁর অধস্তন পুরুষ ভগীরথ রাজা হয়ে পূর্ব-পুরুষদের মুক্ত করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে হিমালয় গেলেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় দেবী গঙ্গা সন্তুষ্ট হয়ে মর্ত্যে নামতে স্বীকার করলেন, কিন্তু তিনি জানালেন যে, জলরাশির প্রচণ্ড বেগ নিয়ে তাঁর অবতরণ হয়তো মর্তবাসী সহ্য করতে পারবে না, তাই শিবের স্মরণ নিতে বললেন। রাজা ভগীরথ

তখন কৈলাসে গিয়ে শিব-আরাধনায় নিমগ্ন হলেন। তাঁর কঠোর তপে আশুতোষ তুষ্ট হয়ে সব কথা শুনে পরামর্শ দিলেন, গঙ্গা প্রথমে তাঁর মস্তকের জটাজালে অবতরণ করুন, তারপর ধীর গতিতে মর্ত্যের অভিমুখে গমনরতা হবেন।

শিবের অনুমতি ও অভয় পেয়ে ভগীরথ গঙ্গাকে অনুরোধ করলেন, শিবের জটাজালে নামতে। গঙ্গা তাঁর প্রবল স্রোতধারা নিয়ে মহাদেবের জটাজালে সবেগে নামলেন, তাঁর বেগ প্রশমিত হল। মহাদেবের জটা থেকে যেন বিষ্ণু পদোদ্ভবা গঙ্গার নবজন্ম ঘটল। শিবের মাথায় পড়ে গঙ্গা ত্রি-ধারাবিশিষ্ট হলেন—একটি ধারা ভগীরথ নিয়ে চললেন পথ দেখিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে পাতালে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করতে—এর নাম অলকানন্দা, অন্য ধারা গেল স্বর্গ অভিমুখে মন্দাকিনী হয়ে, আর তৃতীয় ধারা পাতালে যার নাম ভোগবতী।

'উত্তরকাশী মাহাত্ম্যে' বর্ণিত রয়েছে যে, মুসলমানরা যখন পূর্বকাশী অর্থাৎ বারাণসী আক্রমণ করে বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করেছিল তখন শিবভক্ত পূজারীরা জ্যোতির্লিঙ্গের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিশ্বনাথকে তদানীন্তন টিহরী-গাড়োয়াল রাজ্যের অন্তর্গত এই নির্জন পার্বত্য প্রদেশে নিয়ে এসে স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় থেকে এই অঞ্চলের নাম হয়েছে উত্তরকাশী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে এমন পাঁচটি শিবতীর্থকে পঞ্চকাশী বলা হয়। এই পাঁচ তীর্থের একই মাহাত্ম্য বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন। এই পঞ্চকাশী হল :—

(১) গুপ্তকাশী (উত্তরাখণ্ডে কেদারবদরীর পথে) (২) উত্তর-কাশী (উত্তরাখণ্ডে) (৩) পূর্বকাশী (বারাণসী ধামে) (৪) ব্যাসকাশী (পূর্বকাশীর সন্নিকটে গঙ্গার পূর্বকূলে) ও (৫) শিবকাঞ্চী (একে দক্ষিণের কাশী বলা হয়)।

উত্তরকাশীতেও পূর্বকাশীর অনুকরণে বিশ্বনাথ মন্দির, কাল ভৈরব মন্দির, শক্তিমন্দির ও মণিকর্ণিকা শ্মশান ঘাট আছে। বিশ্বনাথ মন্দিরে দিব্যলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন—বিগ্রহটি প্রাচীন। যে ভূমিখণ্ডে মন্দিরগুলি অবস্থিত তার কিছু অংশ ঘিরে বারাণসীর মত গঙ্গা উত্তর-বাহিনী। উত্তরকাশীর শান্ত পার্বত্য পরিবেশ বড় মনোরম ও অধ্যাত্ম-ভাব উজ্জীবক। পূর্বে এ স্থান খুবই দুর্গম ছিল এখন তীর্থযাত্রীদের পক্ষে সুগম হয়েছে। এখানে সাধু-সন্তের বহু আশ্রম আছে। তাঁদের 'ভিক্ষার' সুবিধার জন্য কতিপয় সত্রও আছে। যেমন, কালীকমলি সত্র,

পঞ্জাবী সত্র ইত্যাদি।

পুণ্যবান রাজা ভগীরথ জীবলোকের মুক্তির জন্যে শিবের মানস-কন্যা কলুষনাশিনী গঙ্গাকে নিয়ে এলেন মর্ত্যভূমিতে। বিষ্ণুপদোদ্ভবা, শম্ভুজটাবিহারিণী পতিতপাবনী ভাগীরথী ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে প্রেমামৃত দানে তাঁর চির শান্তিময় কোলে টেনে নেবার জন্য মর্ত্যে প্রেমময়ী স্নেহ-ময়ী জননীরূপে অবতীর্ণা হলেন। গঙ্গা এসে ত্রি-ধারাতে বিভক্ত হলেন হরিদ্বারে। একটি ধারা ব্রহ্মকুণ্ড ও কুশাবর্ত ঘাট দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, দ্বিতীয় ধারাটি 'হর-কি-প্যারী'র পূর্ব তীর ধৌত করে সুবিশাল বক্ষে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তৃতীয় ধারা সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডী পাহাড়ের পাদদেশ ধুয়ে সবেগে বহমান। এই তৃতীয় ধারাটিকে বলে নীলধারা। তিনটি ধারাই আবার অনতিদূরে কনখলে গিয়ে মিলে এক হয়েছে। হরিদ্বারে গঙ্গার এই ত্রি-ধারার তাৎপর্য আছে। পরমেশ্বর তাঁর তিন অভিব্যক্ত রূপে অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে হরিদ্বারে লীলা করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নির্মল পরিবেশ নিয়ে এটি পৃথিবীর এক সুন্দরতম স্থান। এখানে এলে মন বাস্তবিক সর্বকলুষমুক্ত, সর্ব আকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে স্বর্গকামী হয়ে ওঠে।

হরিদ্বার অর্থাৎ হরি বা হরের দ্বার—ভগবানের সমীপবর্তী হওয়ার দরজা—স্বর্গের স্বর্ণদ্বার। এখান থেকেই দেবভূমি হিমালয়ের আরম্ভ বলা চলে—এখানে এসেই বুঝি স্বর্গে যাবার পাথেয় জোগাড় করে মানুষ।

বিভিন্ন পৌরাণিক শাস্ত্রে এই ক্ষেত্রের নানা নাম দেখা যায়। যেমন—হরিদ্বার, হরদ্বার, গঙ্গাদ্বার, স্বর্গদ্বার, মায়াপুরী, মোক্ষদ্বার, কণখল ইত্যাদি। এসব নাম একই পুণ্যক্ষেত্রকে বুঝিয়ে থাকে ;

"কোচিত্তুর্হরিদ্বারং মোক্ষদ্বারং পরে জগুঃ।
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেহপ্যাহু কেচিন্মায়া পুরী পুনঃ॥"

—কাশীখণ্ড।

প্রত্যেক নামের ব্যাখ্যা করেছে পুরাণ। মহামায়া সতী এই ক্ষেত্রে মায়িক দেহত্যাগ করায় এ স্থানের নাম মায়াপুরী হয়েছিল। "মায়া-পুরী মাহাত্ম্যে"এর বিশদ বিবরণ আছে। কেদারনাথে আছেন শিব, বদরীনাথে বিষ্ণু—এই দুই স্থানই ঈশ্বরের অতি প্রিয় স্থান এবং এই দুই স্থানে যেতে হলে হরিদ্বারই একমাত্র দ্বার বা পথ তাই একে হরদ্বার বা হরিদ্বার বলে। কণখল নামেরও সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—

"খলঃ কোনাম্ মুক্তিং ভজতে এত মজ্জনাৎ।
অতঃ কণখলং তীর্থং নাম্না চক্রু মুনীশ্বরা।"

অর্থাৎ এমন খল কে আছে যে, কণখল তীর্থে স্নান করে মুক্তি লাভ করে না? এ জন্য ঋষিগণ এর নাম কণখল রেখেছেন।

বর্তমানে এই নামগুলির কোন কোনটির দ্বারা হরিদ্বার ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগকে বুঝিয়ে থাকে।

এই হরিদ্বারেই একদা মদান্ধ দক্ষরাজ শিববিহীন বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে শিবনিন্দা করেছিলেন। তখন পতিপ্রাণা সতী পতি-নিন্দা সইতে না পেরে এই তপোভূমিতেই মায়িকদেহ ত্যাগ করে জগৎকে স্তম্ভিত করেছিলেন। সেই সতীদেহ বিষ্ণুচক্রাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে নানা স্থানে পড়ে এক একটি মহাপীঠে পরিণত হয়েছে। সেই পূতঃ দেহ-পাতের দ্বারা সৃষ্ট পবিত্র কুণ্ডস্থান আজও কণখলে বিরাজ করছে মহা-তীর্থরূপে। সতীকুণ্ড বিবাহিত মহিলা ভক্তদের কাছে মহাপবিত্র স্থান।

হরিদ্বার রেলস্টেশন থেকে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে দক্ষে-শ্বর মহাদেবের মন্দির। পুরাণে বলা হয়েছে যে, এই স্থানে দক্ষ শিব-হীন যজ্ঞ করেছিলেন শিবকে হেনেস্থা করার জন্য। কণখল অঞ্চলে ছিল দক্ষের রাজভবন। কথিত যে, সতীর তনুত্যাগের সংবাদ পেয়ে শোকাকুল শিব এখানে ছুটে এসেছিলেন। সেই স্মৃতিকে ধরে রেখেছে দক্ষেশ্বরের মন্দির। দক্ষেশ্বর লিঙ্গের বিশেষ পূজা হয় শিবরাত্রিতে ও শ্রাবণ মাসে। পবিত্র গঙ্গাজলের সিঞ্চন করা হয় লিঙ্গ মূর্তিতে।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যেখানে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন ও যেখানে শ্রীবিষ্ণু প্রকটিত হয়ে লীলাভিনয় করেছিলেন, এই ব্রহ্মাকুণ্ড ও বিষ্ণুপদ চিহ্ন আজও অম্লান রয়েছে এবং জীবকে মোক্ষফল প্রদান করে চলেছে। ঋষি-প্রবর দত্তাত্রেয় তপোবলপ্রভাবে যেখানে গঙ্গাধারাকে আবর্তিত করিয়ে তাঁর কুশ প্রত্যাবর্তন করিয়েছিলেন (তপোরত ঋষির কুশ গঙ্গাস্রোতধারায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলে উত্তেজিত ঋষি দত্তাত্রেয় তপোপ্রভাবে এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়েছিলেন বলে প্রবাদ) সেই কুশাবর্ত ঘাট এখনও অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রতি বারো বছর অন্তর শিবচতুর্দশী যোগে গঙ্গাস্নানের পর থেকে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রহ্মাকুণ্ডের সংলগ্ন পাকা বাঁধানো চত্বরে রয়েছে 'হর-কি-প্যারী'

ন্দির। হর-কি-প্যারী অর্থাৎ হরের প্রিয়। কথিত যে, পুরাকালে দেবাদিদেব মহাদেব এখানে যোগে উপবিষ্ট ছিলেন তাই এই স্থান হর অর্থাৎ শিবের প্রিয়। অপর কিম্বদন্তী অনুসারে এখানে নাকি শ্রীহরি লীলাভিনয়কালে আপন চরণচিহ্ন রেখেছিলেন তাই এই স্থানের নাম হরি কী পৈরী। প্রস্তর নির্মিত মন্দিরে শ্রীহরির পদচিহ্ন রক্ষিত আছে।

'হর-কি-প্যারী' থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তরে হৃষিকেশে যাবার পথে পর্বতের পাদমূলে রয়েছে পবিত্র ভীমকুণ্ড বা ভীমগোদা। এই কুণ্ডে স্নানের নানা প্রকার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। কুণ্ডটিতে ভীমেশ্বর মহাদেব নামক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় লোকে কুণ্ডটিকে ভীমগোদা আখ্যা দিয়েছে। প্রবাদ যে, মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনই এই ভীমেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করেছিলেন। মহাপ্রস্থানে যাবার সময় ভীম এখানে নাকি গদা নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই আঘাতেই কুণ্ডটির উৎপত্তি হয়েছিল। তাই এর নাম ভীমগোদা। কুণ্ডটি অতীব প্রিয়দর্শন ও পবিত্র। কুণ্ডের একপাশে শোভমান সুন্দর সুউচ্চ পর্বতমালা, পর্বতের গায়ে বিরাজ করছে সুনির্মিত দেউল ভীমেশ্বরের। কুণ্ডের ব্যাস চল্লিশ হাতের মত, তিনদিকে বাঁধান মনোরম সোপানশ্রেণী। এর বিশেষত্ব যে, সর্বদাই কুণ্ডের নিম্নদেশ হতে জল উত্থিত হচ্ছে এবং সেই উচ্ছ্বসিত জল দিবারাত্রি একখানি পাথরের ওপর দিয়ে ঝর ঝর রবে খাদে পড়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

হরিদ্বার বেষ্টিত হয়ে আছে তিন পর্বতের বেড়ায়—একদিকে শোভা পায় বিল্ব পর্বত, সেখানে পর্বত শিখরে মনসা দেবীর মন্দির। এই দেবী বিগ্রহ কত যে প্রাচীন তার হিসেব নেই। দেবী অতিশয় জাগ্রতা। শিবের মানস-কন্যা হিসাবে মনসা দেবী কল্পিতা—মনসা সর্পদেবী, এঁর সম্পর্কে নানা কাহিনীর উল্লেখ আছে পুরাণে। মনসা দেবীর মন্দিরের পশ্চিম দিকে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির। কথিত যে, এখানে দেবীর সঙ্গে শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ হয়েছিল। নীল পর্বতের শীর্ষদেশে বিরাজিত দেবী চণ্ডী ও অঞ্জনার মন্দির। মনসা, চণ্ডী ও অঞ্জনা—তিন দেবী অলঙ্কৃত করে আছেন তিন কোণ, তাই শ্রীখণ্ডে পরিণত হয়েছে হরিদ্বার। এখানে মায়া দেবীর মন্দিরও বহুকালের পুরাতন। প্রবাদ যে, এই দেবী দর্শন না করলে হরিদ্বার দর্শনের পুণ্যফল অর্জিত হয় না।

এছাড়া আছে মহাপুণ্য স্থান সপ্তঋষির আশ্রম। এখানে গঙ্গা সপ্তধারায় বহমান। এ সম্পর্কে পুরাণের এক কাহিনী প্রচলিত আছে।

কুশাবর্ত ঘাটের দক্ষিণে সর্বনাথ দেবের মন্দির। সর্বনাথ পঞ্চমুখ পশুপতিনাথ বিগ্রহ। কষ্টি পাথরের তৈরী এই শিবমূর্তি নেপালের প্রসিদ্ধ দেবতা পশুপতিনাথের অনুকরণে গঠিত। কালভৈরবও খুব প্রাচীন ও জাগ্রত দেবতা। বিল্বেশ্বর মন্দিরে বিল্ব বৃক্ষতলে প্রাচীন শিবলিঙ্গ বিল্বেশ্বর রয়েছেন আবহমানকাল ধরে। মন্দিরটি রয়েছে গৌরী কুণ্ডের পাশে পর্বতের পাদদেশে হরিদ্বার রেল স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিমে। স্কন্দ পুরাণে লেখা আছে যে, মহাপবিত্র এই শিবলিঙ্গ দর্শন করলে মানুষ শিবলোকে যায়।

মহাতীর্থ হরিদ্বার, ধরণীর সুন্দরতম লীলাভূমি, মর্ত্যের নন্দন কানন, স্বর্গের অমরাবতীর দ্বার, পুণ্যতীর্থ কেদারনাথ-বদরীনাথ-দেবতাত্মা হিমালয়ের পথ ;—মহেশ্বর শিব অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে লীলানন্দে মগ্ন হয়ে আছেন এখানে।

মধ্যভারতে অবস্থিত জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর, মহাকালেশ্বর ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিব-বিগ্রহের বর্ণনাকালে বোঝা গেছে যে, বিস্তীর্ণ মধ্য-প্রদেশ জুড়ে বহু প্রাচীনকাল থেকেই শিব পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর ও বিদ্বেষ-বিভেদ এবং মায়ার সংহারক দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। শিবভক্ত ও শৈবধর্ম প্রচারে ব্রতী ঋষিকল্প মহাপুরুষেরা যেমন মানব-কল্যাণের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী পাহাড়-পর্বতে বন-জঙ্গলে গ্রাম-গ্রামান্তরে নগর-প্রান্তরে শৈব ধর্মমত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন তেমন বহু পরাক্রান্ত প্রতিভাধর ও দেবভক্ত নৃপতি ও শিব-অনুগামী হয়ে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মূর্তি স্থাপন করে শৈবধর্ম প্রচার করেছেন। অথচ তাঁরা হিন্দুর অন্য শ্রেষ্ঠ দেবতাদেরও সমভাবে মান্য করেছেন—তাঁদের মন্দিরও গড়েছেন। পাশাপাশি পূজিত হয়েছেন শিব ও বিষ্ণু। এই-সব যুগে হিন্দু ধর্মের দুই বা ততোধিক মতধারার মধ্যে পরস্পর-বিরোধের পরিচয় পাওয়া যায়নি যা ছিল পূর্ববর্তী কোন কোন সময়ে। তার ফলে গড়ে উঠেছে শিল্প-সৌন্দর্যে ভরা বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দির-সম্ভার।

এ প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত প্রাচীন স্থাপত্য নগরী খাজুরাহোর শিব মন্দিরগুলির বর্ণনা করে পুরানো দিনের ঐতিহ্যের ঘ্রাণ নেবার সঙ্গে এ তথ্যও প্রস্ফুটিত হোক যে, সত্য সুন্দর শিব এই বিরাট ভূখণ্ডে অনাদি-কাল থেকেই চির ভাস্বর হয়ে আছেন।

খাজুরাহো নগরী ছিল চান্দেল্ল রাজাদের রাজধানী—এক প্রাচীন

শিল্প সমৃদ্ধ মন্দির নগরী। এ সময় ভারতবর্ষের এক গৌরবময় কাল। অপূর্ব শিল্প-সুষমায় সমৃদ্ধ হয়ে ৬'৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চলে পঁচাশিটি অতুলনীয় মন্দির নিয়ে গড়ে উঠেছিল মন্দির-নগরী খাজুরাহো। কালস্রোতে আজ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত। বর্তমানে মাত্র কুড়িটি মন্দির আছে খাজুরাহো গ্রামে যেগুলি বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। এই মন্দিরগুলি শিবের, বিষ্ণুর, ব্রহ্মার, কালীর ও অন্যান্য দেবদেবীর; তবে শিব মন্দিরই অধিক—কোথাও অষ্টভুজ ত্রিনয়ন বিশ্বনাথ, কোথাও চতুরানন শিব, কোথাও বা অর্ধ-নারীশ্বর মহাদেব। খাজুরাহো যার প্রাচীন নাম ছিল খাজুরাবতক, শত শত বছর ধরে মহাপরাক্রমশালী নৃপতিরা এখানে রাজত্ব করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, সেই ইতিহাস মহাতীর্থ অমরকণ্টকের বুকে প্রাচীন কেজাকভুক্তির ইতিহাস। পরবর্তীকালে যার নাম হয়েছে বুন্দেলখণ্ড। সেই ইতিহাস চন্দেল্ল বা চন্দ্রাত্রেয় বংশীয় রাজপুত নৃপতিদের ইতিহাস। খাজুরাহোর সমৃদ্ধির যুগ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

চান্দেল্ল বংশীয় রাজারা কেউ ছিলেন বিষ্ণুভক্ত কেউ বা শিবভক্ত। ৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হতে হর্ষদেব চন্দেল্লর রাজত্বকাল থেকেই খাজুরাহোর সমৃদ্ধির সূচনা। তাঁর পুত্র যশোবর্মণও ছিলেন বিখ্যাত রাজা। তাঁর নির্মিত লক্ষ্মণদেবের মন্দির এখানে প্রসিদ্ধ। যশোবর্মণের পুত্র বঙ্গ যিনি পরম ভট্টারক পরমেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন (৯৫০—১০০৮ খ্রীঃ) তাঁকে এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি ধার্মিক ও স্থাপত্যশিল্পের অনুরাগী ছিলেন। খাজুরাহোকে সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করে গড়তে মনোরম দেউল ও হর্ম্যাদি নির্মাণ করান যেগুলি শ্রেষ্ঠ নাগর-স্থাপত্যের নিদর্শন। তাঁরই রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরটি। খাজুরাহোর প্রসিদ্ধ শিব দেউলগুলির মধ্যে লালগুঁয়া মহাদেবের মন্দির, বিশ্বনাথ ও নন্দীর মন্দির, কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির ও মাতঙ্গেশ্বরের মন্দিরের নাম করা যায়।

খাজুরাহোর মন্দির নির্মাণ পদ্ধতিও স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যময়। এ ধরনের মন্দির-ভাস্কর্য ভারতের অন্য কোথাও নেই। এগুলিকে চান্দেল্ল রীতির নাগর মন্দির বা রেখদেউল বলা যায়। ৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার, দৈর্ঘ্য ৩১ মিটার ও প্রস্থ ২০ মিটার—তার মহিমময় শির বা শিখারা। দুইটি সুন্দর স্তম্ভ দিয়ে গর্ভগৃহ ও অন্তরালয় পৃথক করা হয়েছে। মহা-

মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলের বেদীটি চতুষ্কোণ ভিত্তির সঙ্গে সমবিস্তৃত। ভিত্তি-মূল থেকে প্রসারতা ক্রম-হ্রস্ব হয়ে ক্রম-উর্ধ্ব শিখর উঠে গেছে ওপরে। মন্দিরের হর্ম্যতল সমতল নয়, ক্রমউর্ধ্বমান হয়ে মহামণ্ডপের কেন্দ্র বেদীতে উপনীত হয়েছে, সেখান থেকে অন্দ্রালয়ে, অন্দ্রালয় থেকে সোপানশ্রেণী গিয়েছে গর্ভগৃহে যেখানে বিরাজমান শ্বেত পাথরের নয়না-ভিরাম শিবলিঙ্গ কাণ্ডারীয় মহাদেব। মন্দিরের গঠন যেন শৈলমালার রূপ ধারণ করেছে ও তার প্রতিটি অঙ্গ অলঙ্করণ সমৃদ্ধ নানা মূর্তির অপূর্ব গঠন বৈচিত্র্যে শোভিত। মানুষ এই মন্দির সম্মুখে এসে মন্দির ও দেবতাকে দর্শন করে মহিমময় শিবের ধারণা করে।

খাজুরাহোর অন্যতম মন্দির-বৈশিষ্ট্য হল মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের গাত্রে অলঙ্করণ। কোথাও দুই বা তিনটি সমান্তরাল মেখলা সংযুক্ত পাড় তৈরী হয়েছে—এগুলি নিরবচ্ছিন্ন ও প্রাচীর গাত্রের অধিক্ষেপণ আর কুলঙ্গি দিয়ে বিভক্ত। সমস্ত মন্দির-অঙ্গ ভরে নানা অপরূপ মূর্তির মেলা—এগুলি যেন জীবন্ত হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। সর্ব কলুষহারী সর্ব তামসবিমোচনকারী মহাদেবের মন্দিরে সুনির্মল সৌন্দর্যের অপরূপ আলো—ভারতের অন্য কোন শিবমন্দিরে এমন সুন্দর মূর্তির মেলা নেই—শিল্পীর এ শাশ্বত সৃষ্টি।

খাজুরাহোর মন্দির শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মিথুন মূর্তি। ভারতের অন্যান্য স্থানের অনেক মন্দিরেও নর-নারীর মিলন মূর্তি উৎকীর্ণ করা আছে কিন্তু খাজুরাহোর মিথুন মূর্তিগুলি সজীব ও অপূর্ব! প্রতীকাকারে এগুলি এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্যেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে। মন্দিরগাত্রে নর-নারীর মিলনের এই মূর্তিগুলি আদৌ নিছক কাম-উদ্দীপনার ব্যাপার নয়। তবে অশ্লীলতা একেবারে যে অনুপস্থিত তাও বলা যায় না।

মিথুন মূর্তিগুলির মধ্যে এক প্রগাঢ় মিলনানন্দ কোন গভীরতম সত্যকে প্রকাশ করতে চাইছে। মূর্তিগুলি দেখলে মনে হবে প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছে—লুপ্ত হয়েছে অন্তর্নিহিত জ্ঞান। শুধু এক অনাস্বাদিত মিলনের প্রগাঢ় বিমল আনন্দসাগরে তারা নিমগ্ন; তেমনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে—নিজেকে হারিয়ে যখন মানুষ পরমব্রহ্মের সঙ্গে মিলে যায় মিলনের মহাসমুদ্রে তখনই আহৃত হয় পূর্ণানন্দ—ঈশ্বর মিলন।

প্রেমরাগে পরিপূরিত স্ত্রী-পুরুষের রমণলীলাই মানুষের পার্থিব

জীবনের চরম আনন্দানুভূতি। এই আনন্দানুভূতিকে ধারণা করেই বুঝি 'পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন মহানন্দময়' এ বোঝাতে প্রতীকাকারে মিথুন মূর্তির কল্পনা। স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনকেই প্রকৃতি আর পুরুষের মহামিলনের প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। পুরুষ ও প্রকৃতির একাত্ম হওয়াই মহামিলন—এই হল মহাসাধন। এ বোধই ঈশ্বর উপলব্ধি—পরম আনন্দে নিমজ্জন।

এখানে এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, সে যুগে তন্ত্র-সাধনা খুবই প্রসার লাভ করেছিল আর তন্ত্র-সাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল মৈথুন ক্রিয়া। হয়তো তন্ত্র মত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে মিথুন মূর্তি মন্দিরে উৎকীর্ণ করা হয়ে থাকবে। শিব ও শক্তি তন্ত্রের দেবতা

কাণ্ডরীয় শিব-দেউলের পরে একই মঞ্চের উপর অবস্থিত রয়েছে বিশ্বনাথ ও নন্দীর (বৃষভের) মন্দির। বিশ্বনাথের মন্দিরটি পরাক্রান্ত চন্দেল্লরাজ বঙ্গ ১০০২-১০০২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করান। অনেকটা কাণ্ড-রীয় শিব মন্দিরের মতই গঠনে তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির মন্দির। শিব লিঙ্গটি পান্নার তৈরী ছিল, এখন পাথরের লিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। নন্দীর মন্দির বিশ্বনাথের দিকে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে। খাজুরাহোর অপর প্রসিদ্ধ শিব মন্দির হল মাতঙ্গেশ্বরের মন্দির। মন্দিরটির গর্ভগৃহে আড়াই মিটার উঁচু ও সোয়া এক মিটার ব্যাসের প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাছাড়া এখানে পৃথক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন 'তুলাদেব' শিব। তুলাদেবের মন্দির শিল্পীর সুমহান কীর্তি।

উদয়পুরের উদয়েশ্বর বা নীলকান্তেশ্বর বিখ্যাত শিব-বিগ্রহ। গোয়ালিয়রের ভীলসা থেকে প্রায় ৬৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই ঐতিহ্যময় মন্দির। খাজুরাহোর স্থাপত্যরীতিতেই মন্দিরটি তৈরী। মালবের পারমার বংশের রাজা উদয়াদিত্য (১০৫৯-১০৮৭) মন্দিরটি নির্মাণ করান। তাঁরই নামানুসারে বিগ্রহের নাম হয় উদয়েশ্বর। মন্দির লাল বেলে পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছে ও তার অঙ্গ জুড়ে রয়েছে নয়নাভিরাম অলঙ্করণ। মন্দিরের পিরামিড আকৃতির শিখর ধাপে ধাপে উঁচুতে উঠে গেছে। অনাদি ঈশ্বর শিবের মন্দির এই উদয়েশ্বর দেউল—এক অবিনশ্বর কীর্তি।

পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের গুহা মন্দিরগুলি প্রাচীন-কালে বিভিন্ন রাজাদের রাজত্বকালে তৈরী হয়েছিল। কখনও বৌদ্ধ-

যুগে কখনও হিন্দুযুগে কখনও বা কোন এক ধর্মমত অনুগামী রাজার অবসানে অন্য ধর্মমতবিশিষ্ট রাজার উত্থানে এগুলি বিকাশ হয়েছিল।

বোম্বাই বন্দরের নিকটে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রে ঘারাপুরী বা এলিফ্যান্টা দ্বীপের গুহামন্দিরে দেবাদিদেব শিবের যে অপূর্ব মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল সেগুলি মানুষের এক অভূতপূর্ব অবিশ্বাস্য কীর্তিই নয়, গুহামন্দিরের চরমতম বিকাশ বলা যেতে পারে। ঐ যুগে সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে শৈব ধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। লোকালয় হতে দূরে সমুদ্রের ওপর দ্বীপস্থিত গুহা-মন্দিরে সত্য সুন্দর পরমেশ্বর শিব আরাধিত হতেন, হয়তো সেখানে শিব-সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন ঋষিকুল। ভারতবর্ষের কোন ভূমিখণ্ডই মহাদেবের প্রভাব থেকে দূরে থাকেনি—শিবময় ভারত।

ঐ যুগে পশ্চিম-ভারতে ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে শিবের অবিসংবাদী প্রভাব দেখা যায়, তবে হিন্দুর অন্যান্য দেবতারাও সমভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চিত হতেন।

গুহামন্দির এলিফ্যান্টা যাকে ঘারাপুরী বলা হয় সম্ভবতঃ পূর্বনাম অগ্রহারীপুরী থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই গুহামন্দির সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি তবে অনুমান করা হয় যে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৬৩৫ থেকে এর সূচনা হয়ে থাকবে। মন্দিরের শিল্পরীতিতে দাক্ষিণাত্যের ছোঁওয়া লাগেনি বরং গুপ্ত যুগীয় শিল্প-বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে ঘারাপুরী গুহামন্দির।

এই দ্বীপের গুহামন্দিরগুলি দেবাদিদেব শিবকে উৎসর্গিত করায় প্রমাণিত হয় যে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই শিব বিশ্বনাথ হিসাবে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অনুভাবিত—তিনি সৃজন-পালন ও সংহারের দেবতা। লিঙ্গমূর্তিতে সৃজনের ও ভৈরব মূর্তিতে ধ্বংসের দেবতা। তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন মুক্তির উপায়।

ঘারাপুরীর মূল গুহামন্দির প্রায় ৪০ মিটার বর্গক্ষেত্র জুড়ে অবস্থিত। মন্দিরের ছাদ বৃহদাকার স্তম্ভ দিয়ে বিধৃত। মন্দির উত্তরমুখী। পূর্ব ও পশ্চিম অলিন্দ দিয়ে প্রবেশ করলে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। মন্দিরের মূল মূর্তি ত্রিমূর্তি শিব—এঁকে মহেশ মূর্তি বলা হয়। বিগ্রহ দক্ষিণ দেওয়ালে উৎকীর্ণ। সম্মুখে রয়েছে অর্ধমণ্ডপ, যার দুই দিকের দ্বার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ অভিমুখী। 'পশ্চিম অলিন্দ দিয়ে প্রবেশ করলে দেখা যাবে এক নিভৃত কক্ষে রয়েছেন একটি মধ্যমাকৃতির শিবলিঙ্গ।

মূল প্রবেশপথ দিয়ে গুহামন্দিরে প্রবেশ করলে বাম দিকে দেখা যাবে বিরাজ করছেন যোগেশ্বর শিব —মহাদেব যোগে নিমগ্ন। মূর্তিটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। 'যোগেশ্বর' প্রস্ফুটিত কমলাসনে বসে আছেন। নিবাত নিষ্কম্প শান্ত অপূর্ব ধ্যানমগ্ন মূর্তি! এই শিবমূর্তি দর্শনে মন অসীম আনন্দালোকে চলে যায়। ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি অন্য দেবতাদের মূর্তি 'যোগেশ্বর' দেবের আশপাশে উৎকীর্ণ রয়েছে।

ডান দিকে রয়েছেন নটরাজ। মূর্তিটি অষ্টভূজ—নাচের ভঙ্গিমায় নৃত্যের দেবতা শিব। প্রথম দুই দক্ষিণ হাত তুলেছেন ললিত নৃত্যের ভঙ্গীতে। এক হাতে ধরা কুঠার।

মন্দির প্রাচীরের মধ্যভাগে মহেশ মূর্তি—প্রায় সাড়ে পাঁচ মিটার উঁচু। এমন মহিমময় শিব মূর্তি ভারতের কোন গুহা মন্দিরে নেই, ত্রিমূর্তি শিব। তিনি এখানে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের দেবতারূপে ভাবিত।

মহেশ মূর্তি পরমেশ্বর শিবের মূর্তি। মূর্তির মধ্যমুখ গম্ভীর প্রশান্ত—ওষ্ঠে লেগে আছে অপার্থিব হাসি, কণ্ঠে মালিকা, শিরে জটাভার—এক হাতে ধরা রয়েছে পিনাক। বাম দিকের মুখটি শিবের ভৈরব রূপ—কাল ও মৃত্যুর ধ্বংসকারী শিব। মুখমণ্ডল ঘিরে আছে যেন এক ছায়া-ঘন অন্ধকার। ভৈরব মূর্তির কপাল চওড়া ও উত্তুঙ্গ, নাসিকা খড়্গাবৎ, মুখে নিষ্ঠুরতার ছাপ—পাকান গুম্ফ ভীতি উৎপাদক, শিরে জড়ান সর্প ও মড়ার খুলি, হাতে ধরা রয়েছে অন্য এক আশীবিক। মহেশ মূর্তির তৃতীয় মুখ বামদেবের। সুন্দর মূর্তি—এঁর প্রকৃতি-রূপ। মুখে নারী-সুলভ লালিত্য ও কমনীয়তা রয়েছে, হাতে ধরা আছে শ্বেত কমল, ফুল-মালায় ও রত্নরাজিতে শোভিত কেশদাম।

মহেশ মূর্তির বাম দিকে গঙ্গাধর শিবের মূর্তি উৎকীর্ণ। এখানে শিব গঙ্গাকে শিরে ধরে আছেন। তার পার্শ্বস্থিত অন্য মূর্তিটি শিবের অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি। মূর্তির অর্ধ অবয়ব নারীর ও অর্ধ অবয়ব পুরুষের। বৃষভের উপরে হেলান অবস্থায় রয়েছেন অর্ধ-নারীশ্বর শিব—পুরুষ ও প্রকৃতির একাত্মের প্রতীক। অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তির ডান দিকে প্রকৃতি-অবয়ব ও বাম দিকে পুরুষ-অবয়ব। নারী মূর্তির এক হাতে ধরা আছে মুকুর।

এছাড়া ভগীরথের গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার মূর্তিটি অপূর্ব। শিবের মস্তকের জটাজাল ভেদ করে ত্রি-মস্তকবিশিষ্ট (ত্রি-ধারার প্রতীক) গঙ্গাদেবী নির্গতা হচ্ছেন, মহাদেবের পাশে পার্বতী। শিব পার্বতীকে

এক হাতে ধরে আছেন। গুহা মধ্যে প্রাচীরে উৎকীর্ণ ক্রোধাসক্ত মহাদেবের কৃপাণ হাতে অন্ধক অসুর বধের মূর্তিটিও অপূর্ব। শিব অন্ধকাসুর সংহার করছেন তাঁর অন্য হাতে একটি বাটি ধরা, অন্ধকের শোণিত এই বাটিতে পড়ছে কারণ মৃত্তিকায় এক ফোঁটা রক্ত পড়লেই অন্য অন্ধক জন্মাবে ও যুদ্ধ করবে। চণ্ডীদেবীর রক্তবীজ বধের মত ঘটনা।

অন্ধকের পাশে হস্তীরূপ ধরে নীলদস্যু। শিব তাকেও সংহার করছেন। বিভিন্ন দেব-দেবী এই দৃশ্য দেখছেন।

আরও একটি অপূর্ব মূর্তি মন্দিরে রয়েছে। সেটি হল শিব-পার্বতীর বিবাহ-দৃশ্য। বড়ই মনোরম মূর্তি। ঘারাপুরী গুহা-মন্দিরে সর্বশেষ বিশেষ মূর্তিটি হল রাবণের কৈলাস শৃঙ্গ উৎপাটন ও শিবের দ্বারা কৈলাসের নীচে রাবণ-বন্ধন। মদান্ধ লঙ্কেশ্বর কৈলাস-পর্বত উৎপাটন করে শিবকে লঙ্কায় এনে ধরে রাখতে প্রয়াসী হয়ে কৈলাস উৎপাটন করেন। মূর্তিতে পরিস্ফুট করা হয়েছে কৈলাসের সব জন্তু-জানোয়ার পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে, কিছু কিছু মারা যাচ্ছে, ভয়ে এদিক-সেদিক পালাচ্ছে—পার্বতী ভয়ব্যাকুল হয়ে পতিকে জড়িয়ে ধরেছেন। তখন শিব স্থিরভাবে বাম পায়ের গোড়ালি দিয়ে মৃদু চাপ দিলেন, ফলে রাবণের মস্তকস্থিত টলটলায়মান কৈলাস পর্বত আবার স্থির হয়ে যথা-স্থানে সন্নিবদ্ধ হল আর লঙ্কেশ্বর দশানন ভূতলে বদ্ধ হলেন কৈলাস পর্বতের চাপায়। শেষে বহু কাতর মিনতির পর আশুতোষ রাবণকে ক্ষমা করলেন। পুরাণের এই ঘটনা সজীব হয়ে যেন মূর্ত হয়েছে গুহা মন্দির অঙ্গে। এরূপ একটি মূর্তি-উৎকীর্ণ আছে এলোরায় কৈলাস মন্দিরেও।

অম্বরনাথ মন্দির

ভারতের পশ্চিমে বোম্বাই-পুণা রেলপথের মধ্যে পড়ে অম্বরনাথ শহর। বোম্বাই-এর ভিটি স্টেশন থেকে প্রায় ৯৬ কিলোমিটার দূরে বিখ্যাত অম্বরনাথজীর মন্দির। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য-রীতিতে এই নাগর-মন্দির গড়ে উঠেছিল বহু দিন আগে। মন্দিরটির কিছু অংশ এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে অম্বরনাথের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। বালসেনের প্রসিদ্ধ মহেশ্বর মন্দির, সিনারের গঙেশ্বর মন্দির ও ঝোগদার মহাদেবের মন্দির একই ধরনের। তবে অম্বরনাথ শিব-দেউল এগুলির মধ্যে

সুন্দরতম ও প্রাচীনতম। মন্দিরটির অঙ্গের ও শিখরের গঠন-বৈচিত্র্য অভিনব এবং অলঙ্করণেও মন্দিরটি সমৃদ্ধশালী। মন্দির-গাত্রে রয়েছে অপরূপ মূর্তি-সম্ভার। পাশে বড় এক দীঘি—মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। অম্বরনাথের মন্দির একটি সুরুচিপূর্ণ নাগর-স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে এক শ্রেষ্ঠ নাগর-মন্দির। ২৭ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২২.৫ মিটার প্রস্থ ক্ষেত্র নিয়ে পশ্চিমাস্য হয়ে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় ৭ মিটার বর্গক্ষেত্রে রয়েছে মণ্ডপ—৪ মিটার বর্গক্ষেত্রে অবস্থিত গর্ভগৃহ। মণ্ডপের হর্ম্যতলের প্রায় ৩ মিটার নীচে গর্ভগৃহ সোপান দিয়ে অলঙ্কৃত মণ্ডপের মেঝের সঙ্গে যুক্ত। মণ্ডপটি চারটি সুদৃশ্য অলঙ্করণে অলঙ্কৃত স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দিরের দুটি প্রধান অংশ প্রথমে কোণাকুণিভাবে যুক্ত হয়েছে আভ্যন্তরিক কোণের সঙ্গে। তারপর রচনা করা হয়েছে ঘন-সন্নিবিষ্ট উল্লম্ব অধিক্ষেপণ ও কুলুঙ্গির শ্রেণী। তারপর মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ গড়ে উঠেছে। বহিরাঙ্গের অলঙ্করণ নিয়ে সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে মন্দির। গর্ভগৃহে আসীন বহু প্রাচীনকাল থেকে অনাদি লিঙ্গ অম্বরনাথ। ইনি অতিশয় জাগ্রত শিব—অগণিত ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করছেন। পাথরের অমসৃণ লিঙ্গ মূর্তি—শিরভাগে ধাতুনির্মিত এক সর্প বেষ্টন করে আছে। করুণাময় অম্বরনাথ সকলকে করুণা করে চলেছেন।

ভারতবর্ষের পূর্ব-উপকূলে প্রাচীনতম ঐতিহ্যময় প্রদেশ উড়িষ্যা। মন্দির ভাস্কর্যে গরিমাময় এ রাজ্য। অতীতকাল থেকেই সমগ্র উড়িষ্যায় শৈব ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে কেবল শিব-দেউলই নয় অন্যান্য দেব-দেবীর অসংখ্য মন্দিরও এখানে গড়ে উঠেছে কালে কালে। সবই নাগর-স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন—ভুবনেশ্বরে যার শুরু কোণারকে যার পরিণতি—যা রূপ পরিগ্রহ করেছে 'রেখ দেউল'।

মন্দির নগর ভুবনেশ্বর হিন্দুর মহাতীর্থ। এখান ত্রিভুবনেশ্বর শিব বিরাজ করছেন লিঙ্গরাজরূপে। লিঙ্গরাজ মন্দির যেমন প্রসিদ্ধ তেমনই সুন্দর। স্কন্দপুরাণ অনুসারে প্রাচীনকালে ভুবনেশ্বরের নাম ছিল একাম্রকানন। কথিত যে, শিব স্বয়ং পার্বতীসহ এসে এখানে অজ্ঞাত-বাস করেছিলেন এক আম্রবৃক্ষ তলে। এ সম্পর্কে এক পৌরাণিক আখ্যান প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এই রকম।

বিবাহের পর মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে শ্বশুরালয় হিমালয়ে এসেছেন।

শিবের বৈরাগীভাব দেখে মেনকা জামাতার নিন্দা করলেন। গৌরী পতিনিন্দা শুনে বড় কুপিতা হলেন—ক্রোধে পতিকে নিয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেন। তারপর পুণ্যতীর্থ প্রয়াগক্ষেত্র অতিক্রম করে তাঁরা কাশীধামে উপনীত হলেন। বিশ্বনাথের আদেশে কাশীতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা স্বর্ণনগর নির্মাণ করলেন। কাশী মহাতীর্থে পরিণত হল। তারপর বারাণসী অর্থাৎ কাশীতে বহু বছর অতিবাহিত করে জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপিত করে কৈলাসপতি শিব পার্বতীসহ কৈলাসে ফিরে গেলেন।

এরপর দ্বাপরযুগে শিবভক্ত পরাক্রমশালী মগধপতি জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীম কর্তৃক অন্যায়ভাবে নিহত হলে শিববরে মহাশক্তিশালী কাশীরাজ মনস্থ করেন যে, তিনি শিবভক্ত জরাসন্ধ হত্যার প্রতিশোধ নেবেন ঐ অন্যায় যুদ্ধের প্রকৃত নায়ক কৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ও তাঁর অঙ্গে আঘাত করে। কাশীরাজ তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বারংবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কৃষ্ণ কাশী অধিপতির প্রতি শিবের অনু-কূল্যের সংবাদ জানতেন। তিনি সুদর্শনচক্রের আঘাতে কাশীরাজের শির স্কন্ধচ্যুত করলেন—চক্রের প্রচণ্ড দীপ্তিতে ভস্মীভূত হল শিবক্ষেত্র বারাণসী।

প্রিয়ভক্ত কাশীরাজের করুণ পরিণতিতে মহাদেব মহাকুপিত হয়ে বৃষভারোহণে পাশুপত অস্ত্র নিয়ে কৈলাস থেকে রণভূমে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু তাঁর হস্তস্থিত পাশুপত অস্ত্র সুদর্শনচক্রের প্রচণ্ড তেজে ভস্মে পরিণত হল। শিব কৃষ্ণের শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে পুরুষোত্তমের স্তব করলেন। শিবস্তুতিতে তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ দেখা দিলেন ও শিবকে তিরস্কার করে বললেন যে, সামান্য নরের পক্ষে থেকে তাঁর সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হওয়া মহাদেবের উচিত হয়নি। শিব নিজ দোষ স্বীকার করে মার্জনা ভিক্ষা করায় বাসুদেব তাঁকে সস্ত্রীক পুরুষোত্তমক্ষেত্রে একাম্রকাননে গিয়ে অবস্থান করতে বললেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্র কৃষ্ণের ক্ষেত্র। সেখানে অবস্থান করলেই শিব ও পার্বতীর মর্ত্যে অবস্থান স্থায়ী হবে এবং বারাণসী নগরীও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। কৃষ্ণের বাক্যে শিব সম্মত হয়ে একাম্রকানন অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে এসে পার্বতীসহ বিরাজ করলেন। এই স্থানে তাঁর পরিচিতি হল ত্রিভুবনেশ্বর নামে। এখানে তিনি লিঙ্গরাজ নামে অবস্থান করলেন—যিনি ত্রিভুবনেশ্বর তিনিই লিঙ্গরাজ। সেই অনাদিকাল থেকে তিনি দিব্যলিঙ্গরূপে ভুবনেশ্বরে অবস্থান করে যুগ যুগ ধরে ভক্তদের কল্যাণ করে চলেছেন। মহাতীর্থ অতীতের একাম্রকানন,

বর্তমানের ভুবনেশ্বর। মহানদী কূলের এই মহাতীর্থের নাম চক্রক্ষেত্র।

পৌরাণিক কাহিনীটি খুব উচ্চমানের নয়। এর মধ্যে কৃষ্ণ ও শিবের বিরোধই পরিস্ফুট হয়েছে অর্থাৎ কৃষ্ণ-মতবাদ সে সময় শিব-মতবাদকে যে প্রভাবিত করছিল এ ঘটনা যেন তারই চিত্র। মগধ ও পূর্ব-ভূখণ্ডে কৃষ্ণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই অন্যায়ভাবে শিবভক্ত জরাসন্ধকে হয়তো হত্যা করা হয়েছিল। ঐ পুরাণ-কথিকায় দেখান হয়েছে শিবের উপর কৃষ্ণের প্রভাব অর্থাৎ শৈব-ধর্মের প্রভাবকে খর্ব করে সে সময় শ্রীকৃষ্ণের জয়রথ যে চলেছিল ঘটনার মধ্যে সেই ইঙ্গিতই যেন রয়েছে। তারপর আবার দুই ধর্মমতের সহ-অবস্থানের কথাও যেন বলেছে পুরাণ-কাহিনী।

কথিত যে, স্বর্গ থেকে পুরুযোত্তম যাবার পথে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবর্ষি নারদকে নিয়ে একাম্রকাননে এসে লিঙ্গরাজ দর্শন করেন ও বিন্দু সরোবরে স্নান করে শিব পূজা করেন। ত্রিভুবনেশ্বর তাঁর পূজায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে পুরুযোত্তমক্ষেত্রে 'নীলমাধব' দর্শন হবে এই বর দেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও একাম্রকাননে এসে ত্রিভুবনেশ্বর দর্শন করে শিবার্চনা করেছিলেন বলে কথিত আছে।

মন্দির-নগর ভুবনেশ্বরের উল্লেখযোগ্য সকল শিব মন্দিরই রেখ-দেউল। এই ধরনের মন্দিরের ছাদ ঈষৎ বক্র, পুরাণে বর্ণিত শুক পাখির নাসিকার মত, শিখরাকৃতিতে উপরে উঠে গেছে। শিখরের শীর্ষে আমলক ও চূড়া। মূল শিখর ছাড়াও আশেপাশে অঙ্গ-শিখরও থাকে এই ধরনের মন্দিরে। গর্ভগৃহের উপর নির্মিত হয় এই রেখদেউল। মন্দির-শীর্ষে থাকে আমলক। আমলকের উপরে শোভা পায় কলস। সবার উপরে শিব-দেউলের ক্ষেত্রে ত্রিশূল।

"বলা হয় যে, অতীতে ভুবনেশ্বরে পাঁচশ সুদৃশ্য মন্দির ছিল—তার অধিকাংশই ছিল শিব-দেউল। বর্তমানে মাত্র তিরিশটি অক্ষত আছে, অন্যগুলি কালের কবলে নিশ্চিহ্নপ্রায়। প্রাচীনতম মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত হয়েছিল, সবশেষের মন্দির ত্রয়োদশ শতকে গঠিত হয়।

আদিযুগে অর্থাৎ ৫০০—৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পরশুরামেশ্বর, উত্তরেশ্বর, শত্রুগণেশ্বর, ঈশ্বরেশ্বর ও লক্ষ্মণেশ শিব মন্দির গড়ে উঠেছিল ভুবনেশ্বরে। মধ্যযুগে অর্থাৎ ৯০০ থেকে ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে নির্মিত হয়েছিল মুক্তেশ্বর, লিঙ্গরাজ, ব্রহ্মেশ্বর, বামেশ্বর, কেদারেশ্বর ও অলাবুকেশ্বর প্রভৃতি

শিব মন্দির এবং পরবর্তীযুগে ভুবনেশ্বরে যে ক'টি প্রসিদ্ধ শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয় তাদের মধ্যে যমেশ্বর, মেঘেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, সোমেশ্বর এই লিঙ্গ মূর্তিগুলিই উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হয় কপিলেশ্বর মন্দির। গজপতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কপিলেশ্বরদেব এই মন্দির নির্মাণ করান।

আদিযুগের মন্দিরগুলির নির্মাতা কলিঙ্গের আদিস্রষ্টা কর বংশীয় নৃপতিরা। মধ্যযুগের অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন কেশরী বা সোম বংশীয় রাজারা। পরের যুগের মন্দিরগুলি চোড়গঙ্গ বংশের ভূপতিরা স্থাপন করেন।

বিশ্ববিখ্যাত লিঙ্গরাজের দেউল—সৌন্দর্যে, ভাস্কর্যে ও গুরুত্বে। মন্দিরের শীর্ষ প্রায় ৫০ মিটার উঁচু। ১৫৬ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১৪০ মিটার প্রস্থ ক্ষেত্রের মধ্যভাগে মন্দিরটি অবস্থিত। আশপাশে অনেকগুলি মন্দির। লিঙ্গরাজের মন্দির ঘিরে আছে প্রায় আড়াই মিটার উঁচু প্রাচীরের বেষ্টনী।

প্রাচীরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ভেট-মণ্ডপ। এখানে লিঙ্গরাজ রথযাত্রা থেকে ফিরে পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হন। উত্তরে, দক্ষিণে ও পূর্বে—মন্দিরের তিন প্রবেশদ্বার। ঐতিহাসিকদের মতে, কেশরী বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা উদ্যোত কেশরী নবম শতাব্দীতে এই মন্দির ও সংলগ্ন জগমোহন নির্মাণ করেন। সূর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কপিলেশ্বরদেব লিঙ্গরাজের প্রতিদিনের সেবার জন্য বহু সম্পত্তি দান করেছিলেন।

লিঙ্গরাজ মন্দিরে যেতে পথে পড়ে বিন্দু সরোবর। সমস্ত তীর্থের বিন্দু বিন্দু জলে নাকি বিন্দু সরোবর পূর্ণ হয়েছে—সরোবরটি তৈরী করেছেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। মহাপবিত্র এর জল। সরোবরটি ভুবনেশ্বরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। অসংখ্য দেব-মন্দির তার চতুর্দিক বেষ্টন করে আছে। এই বিন্দু সরোবরের পূর্ব দিকের একটি ঘাটের নাম মণিকর্ণিকা। এক সময় উৎকল রাজগণ ভুবনেশ্বরধামকে দ্বিতীয় বারাণসীধামে পরিণত করতে চেষ্টা করেছিলেন। মণিকর্ণিকা নাম তারই সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন পুরাণে বিন্দু সরোবরের জলের অসীম গুণ ও এখানে অবগাহন করলে আসন্ন মুক্তির কথা বলা হয়েছে। সরোবরের সামনে বাসুদেব মন্দির। তীর্থের নিয়মানুসারে অনন্ত ও বাসুদেবের পূজা না করে লিঙ্গরাজ দর্শন নিষেধ। কিম্বদন্তী মতে, লিঙ্গরাজ মন্দির

প্রতিষ্ঠার পূর্বে অনন্ত ও বাসুদেব এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং বাসুদেবই শিবকে এখানে তাঁর গুপ্ত আবাস স্থাপন করতে বলেন।

বাসুদেব মন্দির থেকে লিঙ্গরাজ মন্দিরে যেতে গেলে প্রথমেই দেখা যাবে পাদহরা পুষ্করিণী। ভগবতীর পায়ের চাপে এই পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়েছিল, তাই পাদহরা নাম।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের অভ্যন্তরদেশ গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা থাকে। জগন্নাথ মন্দিরের মতই এ মন্দিরেও রন্ধন মহল, ভোগমণ্ডপ, জগমোহন প্রভৃতি রয়েছে। মূল মন্দিরের শিখরে শৈব ধর্মের চিহ্ন ত্রিশূল প্রোথিত —ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের প্রতীক। মন্দিরগাত্রে অপূর্ব কারুকার্য। কারুকার্যের ভিতরে সেকালের জীবজন্তু, ব্যবহারিক দ্রব্যাদি, গাছপালা, সামাজিক জীবন প্রণালী, পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতির বিশিষ্ট পরিচয় আছে। গর্ভগৃহে লিঙ্গ মূর্তি প্রাঙ্গণ ভূমির চেয়ে অনেক নীচে একটি বিবরের মধ্যে অবস্থান করছেন। গর্ভের আকৃতি প্রদীপের মত, তার অঙ্গ স্বর্ণপত্রমণ্ডিত। দিবারাত্র কয়েকটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রেখে গর্তের মধ্যস্থলকে একটু আলোকিত করে রাখা হয়েছে। লিঙ্গ-মূর্তির মধ্যস্থিত একটি শ্বেত রেখা মূর্তিকে দুভাগে বিভক্ত করেছে। এই জন্য লোকে এঁকে হরিহর বলে থাকেন। ইনি কোটি লিঙ্গেশ্বর, কৃত্তিবাস নামেই অভিহিত। এখানকার পূজা, ভোগ প্রভৃতির প্রথা জগন্নাথ মন্দিরেরই অনুরূপ।

লিঙ্গরাজ হরিহররূপে পূজিত হন। এই পূজা চোড়গঙ্গ বংশীয় রাজা অনন্তভীমদেব প্রবর্তন করেন। শুধু হরের পূজা নিষিদ্ধ হয়। লিঙ্গরাজ পবিত্র তীর্থে পরিণত হন শৈবদের ও বৈষ্ণবদের উভয়েরই। এই তীর্থ শৈব ও বৈষ্ণবের মিলনক্ষেত্র।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের আশপাশে যে সকল প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শিব মন্দির রয়েছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত শিব মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমেশ্বর মন্দির

বিন্দু সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম কূলে অবস্থিত ত্রিরথ মন্দির। মন্দিরে প্রাচীন শিবলিঙ্গ বিরাজিত। পাশে পরশুরামেশ্বরের মন্দিরটিও অনুরূপ। ৭ম শতাব্দীতে এই মন্দির নির্মিত হয়। শিখরমন্দিরের নিম্ন-তম ঋজু অংশকে বাঢ় ও উপরের ঈষৎ বক্র অংশকে রথ বলে।

মার্কণ্ডেশ্বর ও উত্তরেশ্বর

এই মন্দিরও ত্রি-রথ দেউল। সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। সরোবরের উত্তরে উত্তরেশ্বর শিব—ইনি পঞ্চরথ দেউলে বিরাজিত।

বৈদ্যনাথ

লিঙ্গরাজ মন্দিরের দক্ষিণে বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ বিরাজ করছেন। প্রাচীন ও জাগ্রত দেবতা—আকৃতিতে বিরাট। বটবৃক্ষের পাশে পাথরের বেদীর উপর উন্মুক্ত আকাশের নীচে এঁর অবস্থান। শিব পুরাণে এই দিব্য লিঙ্গের উল্লেখ আছে।

বৈদ্যনাথ শিবের দক্ষিণে পঞ্চরথ দেউলে রয়েছেন মৈত্রেশ্বর শিব।

কপিলেশ্বর

ভুবনেশ্বরের দক্ষিণ সীমায় কপিলেশ্বরের মন্দির। মন্দিরে বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগ মন্দির সবই রয়েছে। উড়িষ্যার গজপতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কপিলেশ্বরদেব পঞ্চদশ শতকে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের দক্ষিণ পাশে একটি কুণ্ড আছে শিব পুরাণে যার কথা বলা হয়েছে। কুণ্ডটির জল পবিত্র, নির্মল ও স্বাস্থ্যকর। কপিলেশ্বর শিবের বিজয় বিগ্রহ লিঙ্গরাজের চন্দন যাত্রায় সমবেত করা হয়।

মুক্তেশ্বর

মুক্তেশ্বর শিবদেউল উড়িষ্যার সুন্দরতম মন্দিরগুলির অন্যতম। লিঙ্গ-রাজ মন্দিরের উত্তর-পূর্বদিকে সিদ্ধারণ্যের ভিতরে প্রকৃতির সুগম্ভীর পরি-বেশে এক অলৌকিক লীলানিকেতনে মুক্তেশ্বর মহাদেব সমাসীন। অষ্টম বা নবম শতকে কেশরী নৃপতিরা মুক্তেশ্বরের মনোরম মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মুক্তেশ্বরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ রয়েছেন এক পঞ্চরথ মন্দিরে।

ব্রহ্মেশ্বর

লিঙ্গরাজের মন্দির থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে পঞ্চকোষীর ভিতরে অবস্থিত। একাম্রপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, লিঙ্গরাজের মন্দির থেকে কিছু দূরে একটি মন্দির নির্মাণ করার জন্য শঙ্কর

ব্রহ্মাকে আদেশ করলে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ব্রহ্মা মন্দিরটি নির্মাণ করান। মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ মূর্তি পরিচিত হলেন ব্রহ্মেশ্বর নামে।

যমেশ্বর

শ্রীমন্দির থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণে যমেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মহাদেব যমের সংযম নষ্ট করেছিলেন বলে যমেশ্বর নামে খ্যাত। প্রবাদ যে, এই লিঙ্গ মূর্তি উপাসনা করলে যমের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

অলাবুকেশ্বর

ইনি অতিশয় জাগ্রত শিবলিঙ্গ। কপিল সংহিতায় লিখিত আছে যে, এই লিঙ্গ মূর্তি দর্শনে অপুত্রক পুত্রবান ও কুরূপ সুরূপ হয়।

উড়িষ্যার অন্যান্য স্থানেও প্রসিদ্ধ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে—যেগুলি প্রাচীন ও বিখ্যাত এরূপ কতিপয় মন্দিরের উল্লেখ করা যাচ্ছে।

আলানাথ

পুরী থেকে আলানাথের মন্দির ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। আলানাথের মন্দির বহু প্রাচীন, সঠিক কবে এই মন্দির নির্মিত হয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জানা যায় না। মন্দির মধ্যে লিঙ্গ মূর্তি স্থাপিত।

বেলেশ্বর মহাদেব

পুরীর ৩ কিলোমিটার উত্তরে সমুদ্র উপকূলে নির্জন বালুকাময় স্থানে এই মন্দির দাঁড়িয়ে। মন্দিরটি ভূগর্ভে অবস্থিত ও চতুর্দিকে বালুভূমি পরিবেষ্টিত। ছোট মন্দির—পুরানোকালের তৈরী। মন্দির গৃহের ঠিক মধ্য স্থানে লিঙ্গ মূর্তি স্থাপিত।

লোকনাথ

শ্রীক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে সমুদ্র সন্নিকটে লোকনাথ শিব মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি বালুকাময়, নিথর নির্জন ও বৃক্ষলতায় ভরা। বিশেষ বিশেষ দিন বা ক্ষণ ছাড়া লোক সমাগম হয় না, কেবল পাখির কাকলিতে সজাগ থাকে মন্দির অঙ্গন।

মধ্যে মধ্যে হরিণের পাল দেখা যায় অদূরে বনানীর প্রান্তে।

শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে শ্রীলোকনাথ জাগ্রত দেবতা ; সামান্য ত্রুটি হলে বা অশুচি অবস্থায় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলে অনিষ্ট অনিবার্য। সেজন্য ভক্ত যাত্রীরা সহজে এই লিঙ্গ মূর্তি দর্শন ও স্পর্শ করেন না, দূরে দাঁড়িয়েই নমস্কার করেন। মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। সমতলভূমি থেকে প্রায় ৩ মিটার নীচে জমির উপর। মূর্তিটি সর্বদা জলমগ্ন থাকে—শিব অবগাহিত হন একটি নির্ঝরের জলে—বিরামহীন তাঁর অবগাহন। শিবরাত্রির সময় এই জল সেচন করে মন্দির সম্মুখের পুষ্করিণী সংযুক্ত কৃত্রিম উৎসের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং লিঙ্গ মূর্তিকে চন্দন চর্চিত করে বিবিধ পুষ্পাভরণে শোভিত করে পূজা করা হয়। বৎসরান্তে এ সময় লিঙ্গ মূর্তির দর্শন পাওয়া যায়।

প্রবাদ যে, শ্রীরামচন্দ্র লোকনাথদেবকে এখানে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেছিলেন। সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য স্বর্ণলঙ্কায় যাওয়ার পথে রামচন্দ্র নীলাচলের পশ্চিমে শবর দীপকের বনে উপনীত হন। তাঁর মনে শিব পূজা করার বাসনা জাগে কিন্তু প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ না থাকায় শিব অভাবে শবর প্রদত্ত একটি লাউকে শিব লিঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা করে অর্চনা করেন। সেই লাউ পরিণত হল লাউনাথ ও লোকনাথে। লোকনাথক্ষেত্রও রূপ লাভ করে মহাতীর্থে। এখানে শিবরাত্রের দিন বিরাট মেলা বসে। লোকনাথ ত্রিলোকনাথ—ভক্তিভরে তাঁর চরণে কোন কামনা রাখলে তিনি তা পূর্ণ করেন।

উড়িষ্যাতে আরও বিখ্যাত কতিপয় শিবলিঙ্গ রয়েছেন। যেমন—ধলেশ্বরের ধলেশ্বর মহাদেব। এই প্রদেশের মহিমময় শিব দেউলগুলি দর্শন করে মন্দির অভ্যন্তরস্থিত দেবতাদের পূজা করলে স্বতঃই মনে হয় শিব যেন এখানে বিশেষরূপে বিরাজিত।

ভারতবর্ষের উত্তর-প্রান্তের মত দক্ষিণ ভারতেও শৈবধর্মের প্রাবল্য আবহমানকাল ধরে পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এই অঞ্চলে শিব-আধিপত্য এত বিস্তৃত ও প্রাচীন যে, স্পষ্টই ধারণা হয় সুপ্রাচীন যুগ থেকেই এখানে যেন স্বয়ং শিবের অধিষ্ঠান এবং যুগে যুগে এখানে বিশেষভাবে শৈবধর্মের প্রচার হয়েছে। এখানে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-প্রান্তরে বহু শিব মন্দির রয়েছে, আর ঐ সকল শিব-দেউলগুলিকে ঘিরে আছে কত না অলৌকিক কথা-কাহিনী—ইতিহাসের পুরানো কথাও। এখানে শিব-উপাসক বিখ্যাত নৃপতিরা কত সুন্দর ও বিরাট দেউল

নির্মাণ করে গেছেন তাঁদের আরাধ্য দেবতার যেগুলি তাঁদের গরিমা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত জুড়ে ছড়িয়ে আছে। অবশ্য এখানে হিন্দুর অন্যান্য দেবদেবীর মন্দিরও রয়েছে সংখ্যাতীত এবং তাঁরাও সমভাবে পূজিত হচ্ছেন।

দাক্ষিণাত্যে বিশেষ করে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরল প্রভৃতি অঞ্চলে শৈবধর্মের আধিপত্য ও শিব-সম্পর্কিত কথা-কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হলে এ ধারণা না হয়ে পারে না যে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা বা দ্রাবিড় সভ্যতায় হয়তো শিব বা রুদ্র মহান দেবতা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন অথবা মহিমময় শিব ছিলেন কোন অতিমানস সত্তা। দ্রাবিড়রা যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণে চলে এসেছিল তখন স্বভাবতই তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম চলে আসে ও এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। মনে হয়, দ্রাবিড়রাই দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্মের প্রবর্তক। সেজন্য শিব অনার্য দেবতা অনেকের এই যে ধারণা সেকথা দাক্ষিণাত্যে শিবের অবিসংবাদী প্রভাব লক্ষ্য করে একেবারে অস্বীকার করে হয়ত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একথা কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনার্য অর্থে অসভ্য বা অর্ধ-সভ্য কোন জাতি নয়—আর্যেতর সভ্য কোন জাতি যারা ভারতীয় কোন আদিম জাতি অথবা আর্য-অনার্য ভাবধারার মিশ্রণে সৃষ্ট কোন জাতি।

দক্ষিণ-ভারতের মন্দির শিল্প ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মন্দির স্থাপত্য থেকে কিছু ভিন্ন ধাঁচের, তবে দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দিরই রেখ দেউল বা শীর্ষ দেউল। মন্দির শীর্ষে আমলক, কলস ও ধর্ম চিহ্ন যেমন শিব দেউলে ত্রিশূল, মন্দির অঙ্গে ভিতরে বাহিরে ও ছাদে বিচিত্র অলঙ্করণ—পাথরের উপর অপরূপ মূর্তি চিত্রন বা অপরূপ কারু-কার্য এ ধরনের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। আরাধিত দেববিগ্রহগুলি অপূর্ব শিল্প-সুষমামণ্ডিত—দেখলে চোখ জুড়ায়।

স্থাপত্য অনুসারে ভারতীয় মন্দিরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা :—

(১) নাগর পদ্ধতি (২) দ্রাবিড় পদ্ধতি ও (৩) বেসর পদ্ধতি।

নাগর মন্দির হল বিশিষ্ট পদ্ধতির মন্দির, যেগুলি নগরে গড়ে উঠেছে। এই ধরনের মন্দির উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে ছড়িয়ে আছে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। নাগর স্থাপত্যরূপ পরিগ্রহ করেছে রেখ দেউলে।

দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ মন্দিরই দ্রাবিড় বা বেসর পদ্ধতিতে তৈরী। দ্রাবিড় মন্দিরও রেখ দেউল। কিন্তু দ্রাবিড় মন্দিরে গর্ভগৃহ সাধারণতঃ আয়তাকার, তার উপরে পিরামিড-আকৃতির ক্রমহ্রাসায়মান ছাদ বা বিমান। বিমানের উপর অষ্টভুজ অথবা বহুভুজ বহুতলবিশিষ্ট শিখারা বা চূড়া, শীর্ষে কোথাও বিরাটাকার অষ্টকোণ গম্বুজ যাকে বলে স্তূপিকা। প্রবেশদ্বারে গোপুরম দ্রাবিড় মন্দিরের বিশেষত্ব। গোপুরমের ক্রম-হ্রাসায়মান ছাদ হয়—তাছাড়া থাকে স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। পল্লব রাজারা সম্ভবতঃ দ্রাবিড় মন্দিরের আদি স্রষ্টা।

নাগর ও দ্রাবিড় স্থাপত্যের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বেসর স্থাপত্য পদ্ধতি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে। একে চালুক্য পদ্ধতিও বলে। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের মত দেব-বিগ্রহ ও অন্যান্য মূর্তির শিল্পবৈশিষ্ট্যও স্বতন্ত্র।

প্রবাদ আছে যে, দক্ষিণ দেশে যে প্রধান প্রধান শিব মন্দিরগুলি রয়েছে সেগুলির দেবতা হলেন এক একটি মহত্বের প্রতীক। কাঞ্চী-ভরমের একাম্রেশ্বর শিব পৃথ্বী অর্থাৎ ক্ষিতি মহত্বতা। অপ্ হলেন ত্রিচিনা-পল্লীতে অবস্থিত জম্বকেশ্বর শিব। তিরুভান্নামালাইতে 'অরুণাচলম্' শিব হলেন তেজ, কালাহস্তিতে শ্রীকালাহস্তি শিবলিঙ্গ হলেন মরুৎ অর্থাৎ বায়ু আর আকাশ অর্থাৎ ব্যোম হলেন চিদাম্বরমে বিরাজিত শ্রীনটরাজ।

এই পঞ্চ মহত্বতের প্রতীক শিবলিঙ্গগুলি খুব প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত। সমগ্র দাক্ষিণাত্য জুড়ে এঁদের প্রভাব। এঁদের কথা একে একে বলা যাক :—

একাম্রনাথ—শিবের ক্ষিতি মূর্তি

ভারতবর্ষে অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, মায়া বা হরিদ্বার, কাশী, অবন্তী ও কাঞ্চী এই সপ্তমহাতীর্থের মধ্যে কাঞ্চীপুরম্ শুধু অন্যতমই নয় এর এক বিশেষত্ব আছে। এই সাত মহাতীর্থের তিনটি শৈব্য ও তিনটি বৈষ্ণব তীর্থ কিন্তু কেবলমাত্র কাঞ্চীতে দুই সম্প্রদায়েরই সমান প্রাধান্য। এই মহাতীর্থের দুই ভাগ—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীকে দাক্ষিণাত্যের কাশী বলা হয়। এখানে পূর্বে ১০৮টি সুউচ্চ ও মনোরম শিব মন্দির ছিল। কাঞ্চীপুরম্ রেল স্টেশন থেকে ২ কিলোমিটার দূরে শিবকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী।

শিবকাঞ্চীর অধিষ্ঠিত মহাদেব হলেন একাম্রনাথ ও শক্তিদেবী কামাক্ষী। একাম্রনাথ শিবলিঙ্গ দক্ষিণ ভারতের পঞ্চভৌতিক লিঙ্গের অন্যতম ক্ষিতি মূর্তি। লিঙ্গ মৃত্তিকায় তৈরী সে কারণে জলাভিষেক হয় না পাছে মূর্তি গলে যায়।

একাম্রনাথ ও কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে ঝটকাগোপুর অর্থাৎ মন্দিরের প্রবেশপথ হতে আরম্ভ করে মন্দির পর্যন্ত অপূর্ব শিল্প-কার্য ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণ দেশে মন্দিরের চেয়ে গোপুরমগুলি অধিক উচ্চ ও তাদের আপাদমস্তক কারুকার্যময়। একাম্রনাথের মন্দিরের গোপুরম্ গ্রানাইট পাথরের তৈরী। অনেকটা চার কোণা মন্দিরের মত দেখতে। গোপুরটির উচ্চতা প্রায় ৫৬ মিটার—নবতল। এখানে দেবদেবীর অনেক মূর্তি খোদিত আছে। দেখা যায়, সেগুলির শিল্প-নৈপুণ্য অসাধারণ। কতকাল ধরে কত অর্থ ব্যয়ে, ও কত না পরিশ্রমে প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করে এই অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত মূর্তিগুলি তৈরী করা হয়েছে আজ তা অনুমান করা অসম্ভব।

গোপুরমের প্রত্যেক তল তার নিম্নতল অপেক্ষা পরিসরে ছোট। এর শিখরে ওঠার একটি সিঁড়ি আছে। পর্বের দিন শিখরদেশ দীপালোকে আলোকিত করা হয়। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত মন্দিরই দুর্গের মত উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত ও দুর্ভেদ্য। একাম্রনাথের মন্দির প্রায় ৩৭ একর জমির উপর অবস্থিত এবং পাথরের উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। চারদিকে চারটি বড় বড় গোপুরম্ আর চারটি ছোট গোপুরম আছে। প্রত্যেকটি নানা প্রকার কারুকার্য দ্বারা শোভিত। মন্দির প্রাঙ্গণে গোপুরম অতিক্রম করে প্রবেশ করতে হয়। প্রাঙ্গণের সম্মুখে প্রস্তর নির্মিত একটি ধ্বজা স্তম্ভ, তারপরই একটি প্রাচীর কামাক্ষী দেবীর মন্দির বেষ্টন করে আছে।

শিবকাঞ্চীর অন্যতম বৃহদাকার মন্দির কামাক্ষী দেবীব মন্দির। এই দেবী সম্পর্কে প্রচলিত আছে এক পুরাণ-কথা। ইনি প্রকৃতই দেবী পার্বতী। কথিকাটি এই রকম।—

শিব-পার্বতী কৈলাসে অবস্থান করছেন—উভয়ের কাল কেটে যাচ্ছে কখনো গভীর ধ্যানে, কখনো জগতের হিত চিন্তায়, আবার কখনও বা প্রেমালাপে—ক্রীড়া-কৌতুকে। একদিন ক্রীড়াচ্ছলে দেবী পার্বতী অনবধানতাবশতঃ পতির ত্রিনয়ন পশ্চাৎদিক হতে তাঁর কোমল কমল হাত দিয়ে আবৃত করে রাখলেন। অভিলাষ ছিল গৌরীর যে, পতি

নিজ হাতে তাঁর হাতের বাঁধন মুক্ত করে তাঁর মুখপানে হাসি মুখে চেয়ে থাকবেন। শিবের ভুবন-ভোলা প্রেমপূর্ণ হাসিতে পার্বতীর বড় লোভ। কিন্তু হায়! হিতে বিপরীত হয়ে গেল। মহাদেবের ত্রিনয়ন অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র অবরুদ্ধ হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে সপ্তমণ্ডল আঁধারে নিমগ্ন হয়ে সৃষ্টি বৈরূপ্যের সম্ভাবনা দেখা দিল। শীঘ্র পার্বতী তাঁর কর-আবেষ্টনী মুক্ত করায় যা হোক সৃষ্টি রক্ষা পেল। অজানিতে ভুল কাজ করায় বেদনার্ত হয়ে দেবী অধোবদনে নীরব রইলেন। মহাদেব কিন্তু কুপিত হয়ে পার্বতীকে তার কৃতকার্যের ফল ভোগ করতে হবে তা জানিয়ে দিলেন। তিনি বিশ্বজননী, বিঘ্নবিনাশিনী, জগদ্ধাত্রী—তাঁর একাজ নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। সুতরাং পার্বতী অভিশাপগ্রস্তা হলেন এবং পাপ-বিমোচনের জন্য শিব আজ্ঞা অনুযায়ী মর্তলোকে এই কাঞ্চীপুরমের নিকটবর্তী কাবেরী তীরে সার্ধ বৎসর কঠোর তপস্যানিরতা থাকলেন। শিব প্রিয়তমা পত্নীকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। পার্বতীর কঠোর তপ ছয় মাস পর শেষ হলে সন্তুষ্ট শিব এখানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁকে কৈলাসে নিয়ে গেলেন। প্রবাদ যে, পার্বতী যে বেশে তপস্যানিরতা ছিলেন সেই রূপে এখানে পূজিতা হতে লাগলেন। মহাদেব ও তাঁর লিঙ্গ মূর্তি এখানে একাম্রনাথরূপে প্রকটিত করেছিলেন।

এই হল কামাক্ষী দেবীর পৌরাণিক কাহিনী। স্থল পুরাণে এর বর্ণনা বিশদভাবে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন ভগবান শঙ্করাচার্য কাঞ্চী নগরীতে এসেছিলেন তখন দেবীর লোল জিহ্বা নর-শোণিত ভিন্ন পরিতৃপ্ত হত না। আচার্য শঙ্কর দেবীকে উপাসনায় তুষ্ট করে দেবীর ক্রোধাগ্নি ও রক্তের প্রবাহ কতকটা প্রশমিত করেন এবং দেবীকে পীঠ মধ্যে সংযুক্ত করে শান্ত মাতৃমূর্তি করে তোলেন।

কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের নিকটেই একাম্রনাথের মন্দির—সে কোন আদিকালে জানা নেই, সে সময় থেকেই এই দেবতার প্রসিদ্ধি। সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলওয়ার 'জ্ঞানসম্বন্ধ' রচিত ভক্তিমূলক স্তব ও গানে একাম্রনাথ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ আছে।

একাম্রনাথের মূর্তি মৃন্ময় সেজন্য জল, পুষ্প বা ভোগদ্রব্য কিছুই দেবতার কাছে নিবেদিত হয় না। উপাচার হল বেদমন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ যা পাঠপূর্বক বেদীর নীচে অর্পিত হয়। প্রতিদিন মৃন্ময় দেবতার

উদ্দেশ্যে কর্পূরারতি করা হয় যা দক্ষিণ ভারতের বৈশিষ্ট্য। শিব একাম্রনাথ ভক্তের ভক্তি-অর্ঘ্যে পরিতুষ্ট হয়ে তার উপলব্ধিকে চিন্ময়-লোকে নিয়ে যান। প্রতিবছর এক পক্ষকাল ধরে চৈত্র মাসে এখানে এক বিরাট মেলা বসে, সে সময় পঞ্চধাতুর একাম্রনাথের ভোগ মূর্তিকে মণিমুক্তায় সাজিয়ে স্বর্ণময় বৃষে আরোহণ করিয়ে সিংহাসনে সকলের দর্শনের জন্য স্থাপন করা হয়। সে সময় নিয়মিতরূপে নট-নটিনীর নৃত্য ও গান-বাজনা হয়ে থাকে। উৎসবের শেষ দিনে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত ভোগমূর্তিকে (দাক্ষিণাত্যে প্রতিবিগ্রহের একটি ভোগমূর্তি থাকে যা মূলবিগ্রহের প্রতিকৃতি। মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরে উৎসবাদিতে এই ভোগমূর্তিকেই আনা হয়) বাইরে এনে বাহনে স্থাপন করে স্তব ও গান-বাদ্য করতে করতে প্রাঙ্গণ পরিভ্রমণ করান হয়। ঐ দিন কামাক্ষী দেবীর ভোগমূর্তিকেও নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে বাহনে বসিয়ে একাম্রনাথের সঙ্গে মিলিত করান হয় এবং এক রাত্রে একাম্র-নাথের মন্দিরে অবস্থানের পর দেবীকে পরদিবস নিজ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই পর্ব-দিনটি পার্বতীর শাপ-বিমোচন দিন উপলক্ষ্য করে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে।

এখানে শিবলিঙ্গের নাম একাম্রনাথ হওয়ার পশ্চাতে প্রচলিত আছে এক কিম্বদন্তী। কথিত যে, দেবী পার্বতী যখন কাবেরী নদী তীরে শিব আরাধনা করছিলেন মহাদেব তখন কাঞ্চীতে অবতরণ করে এক আম্রবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় আম্রবৃক্ষটিতে মহাদেবের ভোগের জন্য প্রতিদিন একটি করে আম ফলতো। ঐ বৃক্ষের চারটি শাখা কটু, তিক্ত, মিষ্ট ও অম্ল চার প্রকার রসের আর ঐ গাছ চার প্রকার স্বাদ (চতুর্বর্গ ফলের প্রতীক) যুক্ত ফল প্রসব করত। প্রতিদিন একটি করে আম মহাদেবের ভোগের জন্য প্রসবিত হত বলে শিবলিঙ্গের নাম হল একাম্রনাথ।

তামিল গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, কাঞ্চী অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এ স্থান দর্শন করলে কোটি জন্মের পাপ নাশ হয় এবং এখানে মৃত্যু হলে শিবত্ব লাভ হয়।

এখানেই অন্য এক প্রসিদ্ধ মন্দির 'কৈলাসনাথ' রয়েছে। এই মন্দিরে হর-গৌরীর বিগ্রহ স্থাপিত আছে—বলা যায় অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি। এঁর অর্ধাঙ্গ নারী, হস্তে তাঁর বীণা, অন্য অর্ধাঙ্গ পুরুষ—বৃষভবাহনে মহাদেব। নারী মূর্তি পার্বতীর। দাক্ষিণাত্যে এরূপ বিগ্রহ আর

নেই। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পল্লব রাজা রাজসিস্থা কৈলাসনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

জম্বুকেশ্বর— শিবের অপমূর্তি

জম্বুকেশ্বর স্বামীর মন্দির শ্রীরঙ্গম থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পূর্বে তিরুভানাইকাভাল গ্রামে অবস্থিত। অপূর্ব শিল্প-সুষমায় ভরা এই মন্দির। এখানে মহাদেবের পঞ্চভৌতিক মূর্তির অন্যতম অপ্ মূর্তি বিরাজ করছেন জম্বুকেশ্বর নামে।

মন্দির উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। চারদিক থেকে প্রবেশের জন্য চারটি গোপুরম্ আছে। এগুলিতে অপূর্ব কারুকাজ। গোপুরম অতিক্রম করে প্রথম প্রাকার। তার মধ্যে উদ্যান বাটি, পথ, সহস্র স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ ও সূর্যতীর্থম নামে বিশাল এক সরোবর অবস্থিত যার মধ্যে রয়েছে অন্তঃসলিলা উৎস। প্রথম প্রাকারের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাকার—এগুলি সবই প্রথম প্রাকারের মত। তারপর পরে শেষ প্রাকার যার চতুর্দিকে নানাবিধ কারুকার্যে ভরা অলিন্দ— মধ্য ভাগে মূল মন্দির। মন্দিরের ভিতর দিব্য লিঙ্গ জম্বুকেশ্বর জলমধ্যে বিরাজমান। জল আপনা হতেই উত্থিত হয়, সে জন্য তিনি জলরূপী শিব বলে আখ্যাত। হয়তো অম্বুকেশ্বর থেকে দিব্যলিঙ্গের নাম জম্বুকেশ্বর হয়ে থাকবে।

অরুণাচলেশ্বর - শিবের তেজঃ মূর্তি

দাক্ষিণাত্যের একটি পার্বত্য নগরী তিরুভান্নামালাই বা তিরুবান্নমলয়। পাহাড়ের পাদদেশে ছবির মত শহর আর নয়নাভিরাম মন্দির অরুণাচলেশ্বরের। শিবলিঙ্গ শিবের তেজঃ মূর্তি হিসাবে বিরাজিত। দেবতার নাম তিরুবান্নমলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্বর এবং দেবীর নাম অপীত কুচম্বল।

তিনটি গিরি শ্রেণী শহরের তিনদিকে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি নিসর্গ সুন্দরীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শিবলিঙ্গের আকার নিয়ে দূর দূরান্তর থেকে যাত্রীদের ডাকছে। এই পাহাড়ের প্রস্তর খণ্ডগুলি লাল রং-এর তাই এর নাম তিরুবান্নমলয় বা লাল পাহাড়। অরুণা-চলেশ্বরের মন্দিরটি সুদৃশ গ্রানাইট পাথরে তৈরী। উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত অনেকটা দুর্গের মত দেখতে—দেব দুর্গ। কোন সময়ে যে এই মন্দির

নির্মিত হয়েছিল তার সঠিক বিবরণ জানা না গেলেও মন্দিরটি যে অতি প্রাচীন তা দেখলেই ধারণা হয়। দেবালয় সাত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রথমটি উৎসব মণ্ডপ। উৎসবের সময় এখানে ভোগমূর্তিকে এনে স্থাপন করা হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহ অমানিশার জমাট অন্ধকারে ঢাকা। এখানে শিবের তেজঃ মূর্তি অরুণাচলেশ্বর সিংহাসনারূঢ় রয়েছেন। প্রথম প্রকোষ্ঠের একটি প্রবেশদ্বার ভিন্ন বায়ু বা আলোকের অন্য কোন প্রকোষ্ঠে প্রবেশের কোন উপায় নেই। মন্দির যেন এক অন্ধকারময় গুহা বিশেষ—আঁধারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। দেখা যায়, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি প্রায়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। উড়িষ্যারও অনেক প্রসিদ্ধ শিব-দেউল অন্ধকারাচ্ছন্ন। অরুণাচলেশ্বরের মূল মন্দিরে যাত্রীর প্রবেশ নিষেধ। কলা, সুপারি, নারিকেল, কুমকুম ও কর্পূর সহযোগে দেবতার ভোগ দেওয়া হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ নানাবিধ হিন্দুযুগীয় শিল্প-কার্যের দ্বারা শোভিত। মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে একটি সোনার তাল গাছ বা বৃহৎ ধ্বজস্তম্ভ।

কথিত যে, জগজ্জননী দেবী পার্বতী হলেন পতি শিবের বামাঙ্গ। দেবী ঐ হর-পার্বতী মূর্তি লাভের অভিলাষে তিরুবান্নমলয় পর্বতের উপর বহুবর্ষ ধরে তপস্যা করেছিলেন। দেবীর আরাধনায় আশুতোষ সন্তুষ্ট হলে একদিন তিনি পর্বতশিখর থেকে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখারূপে অবতরণ করে এই লিঙ্গ মূর্তির অঙ্গে প্রবিষ্ট হন। সে সময় ক্ষণেকের জন্য জগৎ সংসার গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল। তদবধি 'দীপম' উৎসব নামে কার্তিক মাসে এখানে উৎসব হয়—বিরাট মেলা বসে। অন্য আর একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দীপম্ উৎসবে সমবেত হয়। এই মেলা কার্তিকী পূর্ণিমার ষষ্ঠী থেকে আরম্ভ হয় ও দশদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। উৎসবের প্রথমদিন অরুণাচলেশ্বরের ভোগ মূর্তি সুবর্ণময় রথে স্থাপন করে বাহক স্কন্ধে মহাসমারোহে মণ্ডপমধ্যে আনা হয়। দেবতার সম্মুখে নাচ-গান হয়ে থাকে। শেষদিন অর্থাৎ কার্তিকী পূর্ণিমার চন্দ্র উদয়ের পূর্বে মূল মন্দিরের অভ্যন্তর থেকে একটি বড় তামার গামলার মধ্যে ঘৃত ও কর্পূর প্রজ্জলিত করে ডালা ঢাকা দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগমূর্তির সম্মুখে আনা হয়, তারপর সহসা ডালাখানি খুলে দেওয়া হয়। তক্ষুণি প্রজ্জলিত শিখা ঐ পাত্র থেকে উত্থিত হয়ে দেব-বিগ্রহের সম্মুখে জ্বলতে থাকে। এর আগে পর্বতের উপর একটি গর্তে ঘৃত ও কর্পূর যা যাত্রীরা উৎসবের সময় পূজার্ঘ্য নিবেদন করে সেগুলি

সংগৃহীত করে কয়েকজন লোক অপেক্ষা করতে থাকে। যেমনি প্রাঙ্গণে আলোক প্রজ্বলিত হয় তক্ষুণি তারা ঐ বিবরের কর্পূর প্রজ্বলিত করে। অগ্নিশিখা বহুদূর হতে দেখা যায় এবং প্রায় দু-দিন ধরে প্রজ্বলিত থাকে। এই হল দীপম্ উৎসব—তেজোময় শিবের আরাধনা—মানুষের বিশ্বাস যে, প্রথম দীপমের শিখা দেখলে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। অনেকে ঐ দিন উপবাসী থাকে ও দীপম দেখে জল গ্রহণ করে।

তেজোময় শিব বা অগ্নিশিখারূপী শিব সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। পুরাকালে কোন এক সময়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে ঘোর বাদানুবাদ হয়। বাক্-যুদ্ধের মধ্যে উভয়ে যখন নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করতে বদ্ধপরিকর হলেন এবং ভুলে গেলেন যে, পরমপুরুষ দেবাদিদের মহেশ্বর রয়েছেন, তখনই শিব উভয়ের মধ্যে নিজ বীর্য প্রকাশের জন্য সহসা মেদিনী বিদীর্ণ করে একটি প্রজ্বলিত বৃহৎ অগ্নিশিখারূপে উত্থিত হলেন। শিখা গগন ভেদ করে দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে হতচকিত হয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁদের বাকযুদ্ধ বন্ধ করলেন এবং অগ্নিশিখা কোথা হতে উত্থিত হল ও কোথায় অদৃশ্য হল সে সম্পর্কে অন্বেষণে রত হলেন। ব্রহ্মা হংসরূপ ধরে শিখার উর্ধ্বগতি দেখার জন্য আকাশচারী হলেন আর বিষ্ণু বরাহরূপ ধরে দণ্ড দ্বারা পৃথ্বী ভেদ করে শিখার উৎপত্তি স্থান নির্ণয়ের জন্য পাতালে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কেউই কিছু নির্ণয় করতে পারলেন না। এব দ্বারা প্রমাণিত হল মহেশ্বর শ্রেষ্ঠ। এই শিখারূপী মহাদেব মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রে উত্থিত হয়েছিলেন। তখন থেকে ঐ দিনটিকে শিব রাত্রি বলে। তারপর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কার্তিক মাসে শিব পূজা করার জন্য এখানে অবতীর্ণ হলেন। তাঁদের সন্তোষের জন্য মহেশ্বর উজ্জ্বল তেজো মূর্তিতে পূজা গ্রহণ করেন। সেজন্য আজও এখানে কার্তিক মাসে দীপম্ উৎসব চলে আসছে।

হংসরূপী ব্রহ্মা ও বরাহরূপী বিষ্ণু কর্তৃক অগ্নিশিখারূপী শিবের অন্বেষণের চিত্রটি দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ শিব মন্দিরের বাইরে পূর্ব দেওয়ালে চিত্রিত আছে, হিন্দুর প্রতিমাতত্ত্বানুযায়ী এই দৃশ্যকে 'লিঙ্গোৎসব' বলা হয়।

অরুণাচলেশ্বরের মন্দিরের পাশেই মহর্ষি রমণ সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্রীকালহস্তীশ্বর—শিবের বায়ুমূর্তি

নৈসর্গিক শোভা-সৌন্দর্যে ভরপুর অন্ধ্রের এক প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ কালহস্তী। মাদ্রাজ থেকে রেল বা বাসযোগে কালহস্তীতে যাওয়া যায়। স্থানটি অতিশয় মনোহর। কালহস্তী রেল স্টেশন থেকে মন্দিরের দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। মন্দিরের কাছ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফুল্ল নদী স্বর্ণমুখী। কত যুগ-যুগান্তর ধরে অবিশ্রান্তভাবে কলকল করে পর্বতের পাদদেশ ধৌত করে প্রবহমান। চারিদিকে পার্বত্য তরু-বিথী মন্দিরের সৌন্দর্যকে যেন শতগুণে বর্ধিত করেছে। শিব মন্দির দুই পর্বতের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীকাল-হস্তীশ্বর বিরাজ করছেন। প্রবাদ আছে, শ্রী অর্থাৎ মাকড়সা, কালা অর্থাৎ সর্প এবং হস্তী অর্থাৎ হাতি এই তিনটি প্রাণীই প্রথমতঃ এখানে শিবকে আরাধনা করে তুষ্ট করেছিল। এই শিবলিঙ্গে এদের তিনটিরই চিহ্ন এখনও বর্তমান।

এই পর্বত সম্বন্ধে প্রচলিত আছে এক কিম্বদন্তী। ত্রেতাযুগে বায়ু ও অনন্তদেবের মধ্যে কলহ বেধেছিল কে বেশী শক্তিমান এই নিয়ে। তখন স্থির হয় উভয়ের শক্তির পরীক্ষা হবে। অনন্তদেব সুদৃঢ়ভাবে পর্বতকে বেষ্টন করে রইলেন এবং বলদর্পে বায়ুকে আহ্বান করে ঐ পর্বতস্থিত যে কোন বস্তুকে স্থানচ্যুত করতে বললেন। পবনদেব কুপিত হয়ে ভীষণ বেগে বইতে আরম্ভ করলেন। সেই প্রভঞ্জন-বেগ পর্বতের তিনটি শৃঙ্গ উৎপাটন করে একটি শৃঙ্গ এই কালহস্তীতে, দ্বিতীয়টি ত্রিচিনোপল্লীতে ও তৃতীয় শৃঙ্গটি লঙ্কার ত্রিনকোমালীতে নিক্ষেপ করলেন।

কালহস্তী মন্দিরের গঠন ও কারুকার্য দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই মন্দির বহুকালের পুরানো। মন্দিরের চারদিক প্রাকারবেষ্টিত ও মন্দিরের কয়েকটি গোপুরম আছে। প্রত্যেক গোপুরম নানাবিধ কারুকার্য শোভিত কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দির অভ্যন্তরে কয়েকটি অশ্লীল মূর্তি খোদিত দেখা যায়। সেগুলি দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলিতে বিরল। বহির্দেশে দুই পাশে কাল (নাগ) ও হস্তীর মূর্তি আছে, তাছাড়া আছে একটি উর্ণনাভের মূর্তি ও তার জাল।

কালহস্তী মূর্তি সম্পর্কে এদেশে প্রচলিত আছে এক পৌরাণিক কাহিনী। শিবের দুই অনুচর ছিল কৈলাসে। কোন এক গর্হিত কাজের জন্যে তারা শাপগ্রস্ত হয় এবং কাল ও হস্তী মূর্তি পরিগ্রহ করে

শিবানুকম্পায় শিবভক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে এখানে মহাদেবের সেবায় তৎপর থাকত। নাগ তার শিরোভূষণ মণির আলোয় মহাদেবের আরতি করত ও হস্তী তার শুঁড় দিয়ে জলাভিষেক সম্পন্ন করত। একদিন হস্তী তার শুঁড়সহযোগে মহাদেবের শিরে জলাভিষেক করছে এমন সময় কয়েক বিন্দু জল নাগের শরীরে ছিটিয়ে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে কালনাগ অস্থির হয়ে হস্তীর শুণ্ডে দংশন করল—হাতীও বিষ জ্বালায় জর্জরিত হয়ে শুঁড় দিয়ে প্রহারে প্রহারে কালসর্পের প্রাণ সংহার করে নিজেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। ভক্তবৎসল উমাপতি শিব তাঁর এই দুই ভক্তের পরিণাম দেখে নিজ চরণাশ্রিত করে এদের পাপমুক্ত করলেন।

স্বয়ং মহাদেবই নাকি মন্দিরে এই দুই মূর্তি স্থাপন করে মন্দিরের নাম রেখেছিলেন 'কালাহস্তী'। এছাড়া এখানে একটি উর্ণনাভের মূর্তি আছে—মাকড়সা জাল বুনছে। এই উর্ণনাভ মূর্তিটি মহামায়ার মহাজাল দ্যোতক।

মন্দির গর্ভগৃহে মহালিঙ্গ বিরাজ করছেন। এই অনাদিলিঙ্গের আকৃতি কিন্তু বর্তুলাকার নয়, চতুষ্কোণাকৃতি স্তম্ভসদৃশ। লিঙ্গ মূর্তির পাশে একটি প্রদীপ সর্বদা জ্বলে। দীপের অনুজ্জ্বল ম্লান আলো যেন মন্দির অভ্যন্তরের জমাট অন্ধকারকে আরও আঁধারাবৃত করে রাখে। অনন্ত যুগ ধরে অমানিশার ঘন আঁধার যেন জমাট বেঁধে স্তূপীকৃত হয়ে মৌন হয়ে আছে এখানে—একি অন্ধকারের মধ্যে হতে আলোর সাধনার ইঙ্গিত? যোনিপীঠের নীচে আরও দু'চারটি প্রদীপ থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ বহির্দেশ থেকে মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে একটা ক্ষীণ দীপালোক ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মন্দিরের অন্যান্য বস্তুগুলি নয়নগোচর হয়। মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার এছাড়া আলো বা বায়ু প্রবেশের অন্য পথ নেই।

তন্মাত্র অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এদের নিয়েই জগৎ সংসারের অস্তিত্ব পঞ্চভূত তাই শিব যিনি বিশ্বনাথ তাঁরই সত্তা। পঞ্চভূতেই তাঁর প্রকাশ—তাই বোধহয় তিনি ভূতনাথ।

শিবের পঞ্চভৌতিক মূর্তিগুলির মধ্যে কালহস্তী মন্দিরে তিনি মরুৎ মহত্ত্বের প্রতীকরূপে বিরাজমান। লিঙ্গমূলের কাছে অবস্থিত দীপশিখাকে বায়ুভারে কম্পমান অবস্থায় থাকতে দেখে ভক্তমনে এই ধারণা দৃঢ় হয়। দীপশিখাটি নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে অথচ নীচের প্রদীপ

শিখাগুলি একেবারে নিস্পন্দ হয়ে থাকে। এই দেখে মহাদেবের বায়ু মূর্তিতে অবস্থান প্রত্যক্ষ করে ভক্তরা ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয়। নিয়ত কম্পমান এই প্রদীপশিখার বৈজ্ঞানিক কারণ হয়ত আছে, তা থাক, কিন্তু ভক্ত প্রাণের এই অমল প্রত্যয় হৃদয় মধ্যে শিবকে যে আবাহন করে আনে তার চেয়ে মানুষের কাছে বড় সত্য আর কি আছে!

মন্দিরে আরও এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়। দৃশ্যটি হল একটি উর্ণনাভ লিঙ্গ মূর্তির উপর অনুক্ষণ জাল বুনে চলেছে—বহুযুগ ধরে ঘটে চলেছে এই ব্যাপার। প্রবাদ যে, কোন শিবভক্ত ঋষি উর্ণনাভরূপ নিয়ে শিবারাধনায় নিরত। লোকে বহুকাল ধরে শুনে আসছে যে, একই মাকড়সা নাকি আবহমানকাল ধরে জাল বুনে চলেছে। এই কথা মানুষ বিশ্বাস করে আসছে ভক্তিনম্র চিত্তে।

অনাদি লিঙ্গ শ্রীকালহস্তীশ্বরের পাশে জ্ঞানপ্রসূনম্বা দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। মণ্ডপের দক্ষিণ কোণে স্থাপিত আছে দেবী দুর্গাম্বার মূর্তি—ইনি দেবী পার্বতী।

কালাহস্তী মন্দিরের অন্য এক বিশেষত্ব হল যে, এখানে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের নিয়ে এসে তাদের ডান কানে তারকব্রহ্ম নাম দেওয়া হয় এবং ঐ নাম দেওয়ার পর মুমূর্ষুকে ডানদিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়ে রাখা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার মুমূর্ষুরা তাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দক্ষিণ কর্ণটি উত্তোলন করে পার্শ্ব পরিবর্তন করে ও তাদের প্রাণবায়ু ঐ দিক দিয়ে বহির্গত হয়। এর দ্বারা মৃত্যুর পর তাদের শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

এই আশ্চর্য ঘটনার পশ্চাতে আছে এক কিম্বদন্তী। প্রাচীনকালে মণিশালিয়াগটম নামে একজন শিবভক্ত নারী শিবকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় এখানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। জীবনের সকল পার্থিব কামনা বিসর্জন দিয়ে যৌবনে যোগিনী সেজে তিনি শিবারাধনায় মগ্ন ছিলেন।

—"হে মহেশ! তুমি দেখা দাও আমায়—মনোহরণরূপে আমার নয়ন সম্মুখে এসে বারেক দাঁড়াও—আমায় দয়া করো প্রভু! আমি প্রাণের মাঝে অনুভব করেছি তোমায়। বিশ্বেশ্বর! তুমি বিনা আমার জীবন বৃথা—তুমি বিনা আমার আর কিছু কাম্য নেই—দেখা দাও প্রভু, আমায় কৃপা করো।"—শিবের চরণে মণিশালিয়াগটম প্রাণের আকুতি ঢেলে শিবকে না পাওয়ার বেদনায় অশ্রু বিসর্জন

করতেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেত। আহার-নিদ্রা তিনি সবই ত্যাগ করেছিলেন। শিবের ধ্যানে তন্ময় থেকে দেহ বোধ তাঁর চলে গিয়েছিল। প্রবাদ যে, ভক্তপ্রাণ উমাপতি ভক্তের আকুল প্রার্থনায় স্থির থাকতে পারেননি, মৃত্যুপথযাত্রী ঐ ভক্ত নারীর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁর দক্ষিণ কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়েছিলেন নিজ মুখে। তদবধি মুমূর্ষুদের আত্মার শান্তি ও শিবলোকপ্রাপ্তির জন্য তাদের অন্তিমকালে এখানে নিয়ে এসে কানে তারকব্রহ্ম নাম দেওয়া হয়। ভগবান ভক্তের কাছে বাঁধা।

কালাহস্তী মন্দিরের অনতিদূরে দুর্গাম্বা মন্দিরের দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছে কপালেশ্বর শিবের মন্দির। এখানে ব্যাধমতে শিব পূজা হয়। কপালেশ্বর মন্দিরের অবস্থান বিশেষভাবে প্রমাণিত করে যে, শিব শাস্ত্রীয় দেবতা হলেও কেবল ব্রাহ্মণেরই একমাত্র অধিকার ছিল না তাঁর পূজার্চনা করার, আজও তা নেই। দেবাদিদেব মহেশ্বর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের পূজা গ্রহণ করেন। যে যেমনভাবে তাঁকে ভক্তির অর্ঘ্য ঢেলে পূজা নিবেদন করে, তিনি তাই গ্রহণ করেন। তিনি যে পরমেশ্বর—সকলের ভগবান। সবার মাঝে শিব, তাঁর মাঝে সকলের অধিষ্ঠান—তিনি জগন্নিবাস।

অন্য পক্ষে ব্যাধমতে পূজার্চনার ব্যাপারটিকে যদি একটি বিশেষ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ধারণা করা হয় যে, শিব অনার্য দেবতা ছিলেন তবে সে ক্ষেত্রে এ কথাও বলা যেতে পারে যে, ব্রাহ্মণদের শিব পূজা কি প্রমাণ করে না শিব সকলের আরাধ্য এবং লৌকিক দেবতা থেকে শাস্ত্রীয় হয়েছেন সত্য উপলব্ধির আলোয়।

কপালেশ্বর শিব সম্পর্কে জনশ্রুতি যে, উদিপুর নামক এক গ্রামে টিনান বা তিনাপ্পা নামে এক কিশোর ব্যাধ ছিল। সে মৃগয়া করে জীবন ধারণ করত। একদিন টিনান একটি বন্য বরাহের পশ্চাৎদ্ধাবন করতে করতে গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করে ও বরাহটিকে সুতীক্ষ্নশরে বিদ্ধ করে। কিন্তু গভীর বন মধ্যে আহত বরাহ কোথায় যে লুকিয়ে পড়ে টিনান বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পায় না। শেষে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে কপালেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করে রাত্রি যাপন করে। কিশোর টিনান পরদিন প্রত্যূষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় কপালেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখে ভাববিহ্বল হয়ে পড়ে। হঠাৎ কি যে তার হল কে জানে, সেদিন থেকে আর ঘরে না ফিরে কঠোর ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করে টিনান শিবসাধনায়

মগ্ন হল। কিন্তু সে তার ব্যাধ-বৃত্তি পরিত্যাগ করল না। সে মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো ও সামান্য মৃগয়ালব্ধ মাংস গোপনে তার আরাধ্য দেবতা কপালেশ্বরকে নিবেদন করত। মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা প্রতিদিন বিগ্রহের সম্মুখে শোণিতের দাগ দেখে এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য একদিন প্রচ্ছন্নভাবে মন্দিরে অবস্থান করে যে অপূর্ব ও অলৌকিক দৃশ্য দেখলেন তা শিবের অনন্ত মহিমা ছাড়া আর কি!

পুরোহিতরা বিহ্বল হয়ে দেখলেন যে, এক কিশোর নির্ভয়ে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করল, তার কাঁধে তূণীর-বাণ, হাতে ধনুক ও কিছু মৃগ মাংস। তার চোখ দুটি ভাবাবেশে মহেশ্বর বিগ্রহের দিকে চেয়ে আছে—দৃষ্টি চলে গেছে যেন কোন অনন্তলোকে—কিশোর বাহ্যজ্ঞানহীন। পুরোহিতরা দেখলেন কিশোর টিনান ধনুক, তূণ, মৃগ, মাংস সব পাশে রেখে দেবতাকে প্রণাম করে মূর্তির সম্মুখে উপবেশন করল। দেখতে দেখতে সে গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ল। নিবাত নিষ্কম্প মূর্তি তার—নয়ন দুটি দিয়ে নীরবে গড়িয়ে পড়ছে আঁখিধারা—ভক্তির অশ্রু। সম্মুখে সত্য সুন্দর পরমেশ্বর শিব যেন হাসছেন। মন্দির একটা জ্যোতির্ময় দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে পুরোহিতরা ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন—মুখ দিয়ে তাঁদের কোন বাক্য বহির্গত হল না। পুলকিত অন্তরে সকলে শিবারাধনায় তন্ময় কিশোর টিনানের দিকে চেয়ে রইলেন। নিশ্চল নিস্পন্দ টিনানের আত্মা তখন পরমাত্মার সঙ্গে মহামিলনে ব্যস্ত।

আবার নীচকুলোদ্ভব ঘৃণ্য অস্পৃশ্য নিষাদ পবিত্র এই দেউলে প্রবেশ করে অশাস্ত্রীয়ভাবে দেবার্চনা করছে ও মন্দিরকে অপবিত্র করছে—এতদূর স্পর্ধা! পাপাচারী ব্যাধকে তার অপরাধের সমুচিত দণ্ড দিতে না পারায় পুরোহিতরা নিজেদের হাত কামড়াতে লাগলেন। হায়! পণ্ডিতম্মন্য সংস্কারবাদী এই পুরোহিতরা কি মূঢ়! যার হৃদয়ের শুচিতায় ও ভক্তি-আকুলতায় স্বয়ং মহাদেব এসেছেন হাত বাড়িয়ে নৈবেদ্য গ্রহণ করতে সেখানে বাহ্য পবিত্র-অপবিত্রতার তর্ক তুলে হৃদয় জড়তার পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কি? টিনান যখন বিগ্রহকে পূজার্ঘ্য নিবেদন করে তার ধনুক বাণ তুলে নিয়ে গমনোদ্যত ঠিক তখনই পূজারীরা গোপন স্থান থেকে বের হয়ে তাকে ঘিরে ধরলেন। তাঁরা কিশোর টিনানকে তার স্পর্ধার জন্য প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন ও তাকে প্রহার করতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। যখন নিগৃহীত হয়ে কিশোর টিনান

ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছে তখন এক ভয়ঙ্কর আরাব উঠল মন্দির অভ্যন্তর থেকে। সকলে ভীত ত্রস্ত হয়ে দেখল মন্দিরে মূর্তির মধ্যে মহেশ্বর প্রকট হয়েছেন, তাঁর একটি অক্ষিপুট হতে অক্ষিগোলক বহির্গত হয়ে ভূমিলুণ্ঠিত এবং রুধিরধারা নেমেছে অক্ষিকোটর হতে।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সকলে হতবুদ্ধি হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। শবর তনয় টিনান তখন "হায়! প্রভু শিব শঙ্কর, হায়! প্রভু শিব শঙ্কর" এই বাক্যোচ্চারণ করতে করতে ব্যাকুলপ্রাণে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটি বাণ তূণ থেকে তুলে নিয়ে তার নিজের একটি চোখ উৎপাটিত করে দেবমূর্তির অক্ষি কোটরে বসিয়ে দিল। মহাদেবের নয়ন কমল আবার যেমন ছিল তেমন হয়ে গেল। টিটানের অক্ষিগহ্বর রক্তে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু মুখে লেগে লাছে পরিতৃপ্তির হাসি। ঈশ্বরের লীলা বোঝা যায় না। দেখতে দেখতে দেব বিগ্রহের অন্য নয়নটিও অক্ষিকোটর হতে বহির্গত হয়ে পড়ে গেল এবং রক্তের ধারা বইতে লাগল শিবের নয়ন কোটর থেকে। এবারেও টিনান অবিচলিতভাবে তার অন্য নয়নটি উৎপাটিত করে তার আরাধ্য দেবতার অক্ষিকোটরে তা সংস্থাপিত করতে তৎপর হল। কিন্তু হায়! দু'টি চক্ষু হারিয়ে সে অন্ধ, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার মুখমণ্ডল, তাই শিব-অক্ষি-কোটরে সে তার দ্বিতীয় চোখটি সংলগ্ন করতে পারল না। অপার্থিব তৃপ্তির হাসি অধরে পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার, শিবের উদ্দেশ্যে বলল, "প্রভু বিশ্বেশ্বর, গ্রহণ করো আমার এই নৈবেদ্য। আমি দেখতে পাচ্ছি না তোমায় চোখের আলোয়, তুমি কাছে এসো দয়াময়, কাছে এসে চোখ বাড়িয়ে দাও। আমার নিজের হাতে তোমার অক্ষি কোটরে আমার এই নয়ন সংলগ্ন করে দিতে আমায় সাহায্য কর।"—

ভক্তবৎসল ভগবান নিজেও আর স্থির থাকতে পারলেন না—স্বমূর্তিতে প্রকাশ হয়ে অমৃত করস্পর্শে ভক্ত টিনানকে পুনরায় চক্ষুষ্মান করলেন। ভক্তের গৌরব রক্ষার জন্যেই এ তাঁর লীলা।

চোখের সামনে এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে ও শিবকে দর্শন করে পুরোহিতরা কম্পিত প্রাণে জ্ঞান হারালেন।

এইভাবে শিব জগৎকে জানালেন যে, তাঁর কাছে জাতিগত বৈষম্য কিছু নেই—সকলেই তাঁর সন্তান ও প্রিয়। আবার ভক্ত তাঁর প্রাণ-প্রিয়। চণ্ডাল—ব্রাহ্মণ বলে ঈশ্বরের কাছে কোন ভেদ নেই—অপবিত্র-পবিত্র বিচার হয় অন্তরের শুচিতায়—শবভস্ম বিভূতি এবং চন্দনের ভেদ

নেই শিবের কাছে। তিনি করুণাময় ভক্তপ্রাণ, ভক্তের ভক্তি-পীযূষে তিনি পরিতৃপ্ত—ভক্ত তাঁর প্রিয়তম।

প্রবাদ, স্বয়ং শিব নাকি তাঁর মূর্তির পাশে টিনানের মূর্তি স্থাপন করেন। যুগ-যুগান্তর ধরে কপালেশ্বর মন্দিরে অগণিত ভক্ত নরনারী অনাদি লিঙ্গের সঙ্গে কিশোর নিষাদ ভক্ত টিনানের পূজা করে আসছে। এখানে টিনানের পূজা পদ্ধতি অনুসারে ব্যাধ মতে পূজা হয়। শিব-রাত্রির সময় প্রতি বছর কালহস্তী ও কপালেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে মহোৎসব হয়ে থাকে।

কপালেশ্বর মন্দিরের চতুর্দিক কালো পাথরে বাঁধান—মধ্যস্থলে মূল মন্দির। পুরাণে কথিত যে, দেবী পার্বতী নাকি এক সময় ময়ুর রূপ ধরে এখানে এসে শিবের আরাধনা করেছিলেন। শিবভক্ত সিদ্ধ পুরুষরা এখানে সাধনা করেছেন। এই স্থানটিকে তিরুমাইলি অর্থাৎ সুন্দর স্থান বলে বর্ণনা করা হয়। অনেকে এই মন্দিরকে ঈশ্বর স্বামীর মন্দির বলে থাকে। এই দেব-দেউল খুব প্রসিদ্ধ ও পবিত্র।

শ্রীকালহস্তীশ্বর সম্পর্কে স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে যে, তীর্থ যাত্রা-কালে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এখানে এসেছিলেন ও লিঙ্গ মূর্তিকে পূজা করেছিলেন। এছাড়াও শিবপুরাণে ও লিঙ্গপুরাণে উল্লেখ আছে যে, কোনও কারণে ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তি নষ্ট হওয়ায় তিনি কৈলাস থেকে শিবকে এখানে এনে স্থাপন করে তপস্যা করেছিলেন যাতে তিনি হৃত সৃষ্টি শক্তি ফিরে পান। ছোট্ট পাহাড়ের উপর শিবলিঙ্গ তিনিই স্থাপন করেন বলে জনশ্রুতি। ঐ পাহাড়ের নাম হয় দক্ষিণ কৈলাসগিরি।

শিবের ব্যোম মূর্তি—চিদম্বরম্

তিরুচিরাপল্লী থেকে চিদম্বরম্ প্রায় ১৫২ কিলোমিটার দূর। তামিলনাড়ুর একটি পুরাতন শহর। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগেও এর অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবতঃ পল্লব রাজত্ব-কালে এর স্থাপনা হয়েছিল।

চিদম্বরম মন্দিরে শিব নটরাজরূপে বিরাজ করছেন। পশ্চিম কোণে মহাদেবের পঞ্চ ভৌতিক মূর্তির অন্যতম ব্যোমমূর্তি রয়েছে। এই আকাশরূপী মহাদেবের কোন মূর্তি বা বিগ্রহ নেই. তবু সহস্র সহস্র ভক্ত চিদম্বরমের এই নিগূঢ় তত্ত্ব দেখার জন্য এখানে আসেন। পশ্চাতের

দেওয়াল মানুষের নজরের আড়ালে রাখার জন্য নটরাজ বিগ্রহের ঠিক পশ্চাতে ঝোলান থাকে একখানি কালো পর্দা। পর্দা তুলে ধরলে দেখা যায় যে, প্রস্তরময় একটি চক্র দেওয়ালে প্রোথিত আছে, এর গায়ে শৈব সম্প্রদায়ের সাঙ্কেতিক পঞ্চ চক্র অর্থাৎ পাঁচটি পবিত্র চিহ্ন বা অক্ষর আছে। কিন্তু এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দির মধ্যে ক্ষণকালের জন্য পর্দা তোলায় অতি অল্প লোকই এর তত্ত্ব নিরূপণ করতে সমর্থ হয়। নাট-মন্দির থেকে মূল মন্দিরে উঠবার পাঁচটি সোপান আছে। সোপানের উপর ওঠা নিষেধ। প্রবাদ যে, এই সিঁড়িগুলির গায়ে ঐ পাঁচটি অক্ষর খোদিত থাকায় সিঁড়িগুলি লোকদৃষ্টির অন্তরালে রাখার জন্য রূপার পাত দিয়ে মোড়া।

চিদম্বরম্ সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। নামের অর্থ ধরে তত্ত্ব নির্ণয় করলে জানা যায় যে, এটি সংস্কৃত কথা। চিং অর্থাৎ প্রকাশ ও অম্বর অর্থাৎ আকাশ বা শূন্য—এই দুই শব্দ যোগে চিদম্বরম। শ্রীনটরাজ মূর্তি দেখলে মনে হয় শিব যেন নিজ আনন্দেই ভরপুর হয়ে নৃত্য করছেন আর সেই নৃত্যের ছন্দে সারা বিশ্ব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এই মন্দিরের অন্য এক নাম কণকসভা। এর ছাদ চালা ঘরের মত ঢালু, সীসার উপর সোনার রং-এর গিল্টি করা ২১,৬০০ টালি দিয়ে তৈরী। প্রাকৃতিক শীতাতপে কতশত বছর অতিক্রান্ত হল কিন্তু আজও এই স্বর্ণ-গিল্টির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি, দেখলে মনে হয় সোনার তৈরী। মন্দিরের শীর্ষদেশ কলসাকৃতি নয়টি স্বর্ণ চূড়ায় পরিশোভিত।

কণকসভার মধ্যে যে নটরাজ মূর্তি স্থাপিত আছে সে সম্পর্কে এক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। পুরাকালে স্থানটি যখন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, সেসময় কোন মহাত্মা এই জঙ্গলে দুটি মন্দির তৈরী করে একটিতে শিবলিঙ্গ অন্যটিতে কালীমূর্তি স্থাপন করেন। দেবী নিত্য মহেশ্বরকে তাঁর সঙ্গে নৃত্যে অংশ নিতে আহ্বান করতেন কিন্তু কৃতকার্য হতেন না। যোগেশ্বর শিব এ ধরনের নৃত্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। একদা তাঁর ভক্তদের অনুরোধে তিনি দেবীর সঙ্গে নৃত্য করতে সম্মত হলেন কিন্তু শর্ত হল যে, যিনি নৃত্যে পরাজিত হবেন তাঁকে মন্দির পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে অন্যত্র। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করার জন্য বিষ্ণুকে মধ্যস্থ মানা হল। তখন উভয়ে কালী মন্দিরে নৃত্য আরম্ভ করলেন। অবিরাম নৃত্য চলল—নৃত্যের ছন্দে-ছন্দে জগৎ হল উতরোল। উভয়েই উভয়কে পরাজিত করতে বদ্ধপরিকর। শিব এখানে ১০৮ প্রকার নৃত্য

প্রদর্শন করলেন তবু দেবীকে পরাস্ত করতে পারলেন না। তখন বিষ্ণু মহাদেবকে আড়ালে বললেন, "মহেশ্বর, দেবীকে পরাস্ত করার একটি মাত্র উপায়ই আছে, আপনি এরূপ ভঙ্গীতে নৃত্য করুন যা এই দর্শক-মণ্ডলী ও আমার সম্মুখে দেবী প্রকাশ করতে কুণ্ঠিতা হবেন।" তখন মহাদেব উলঙ্গ অবস্থায় চতুর্ভুর্জ মূর্তি ধারণ করে দক্ষিণ পদ ভূমিতে রেখে বামপদ ঊর্ধ্বে তুলে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করলেন। দেবী শিবের নৃত্যের এই ব্যভিচার দেখে লজ্জায় ম্রিয়মানা হয়ে চিরতরে মন্দির পরিত্যাগ করলেন। শিব যে মূর্তি ধরে নৃত্য করে দেবীকে পরাস্ত করেছিলেন সেই মূর্তি নটরাজ নামে প্রসিদ্ধ এবং এই মূর্তি মন্দিরে স্থাপিত আছে। এই নৃত্যশাস্ত্র পূর্ব-গোপুরমের ভিতর-দেওয়ালে চিত্রিত আছে। এই নৃত্যলীলার অন্যতম দর্শক ছিলেন ঋষি প্রবর পতঞ্জল, যিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের স্রষ্টা। পোষ মাসে এই মন্দিরে 'অরুদ্র দর্শন' নামে বিরাট উৎসব হয়।

শিবের পঞ্চ ভৌতিক দিব্য লিঙ্গগুলি ছাড়াও সমগ্র দক্ষিণ-ভারত জুড়ে আরও প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন যাঁদের মাহাত্ম্য কিছু-মাত্র কম নয়। সেরূপ কতিপয় শিব-বিগ্রহের বর্ণনা করা হচ্ছে।

বেদগিরিশ্বর—মহাবলীপুরম্

এই পার্বত্যময় স্থান একটি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যেমন মনোরম তেমনই প্রসিদ্ধ এর স্থান মাহাত্ম্য। পক্ষীতীর্থম ও মহাবলীপুরম্ যেতে হলে চিঙ্গলপৎ স্টেশনে নামতে হয়। চিঙ্গলপতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১৪ কিলোমিটার দূরে এই পুণ্যময় স্থানটির অবস্থান।

পর্বত শিখরে বেদগিরীশ্বরের মন্দির চতুর্দিকে প্রস্তর প্রাচীর পরি-বেষ্টিত—একটা দুর্গের মত দেখতে। মন্দিরের ভাস্কর্য কাজগুলি মনোহর। একটি প্রস্তর নির্মিত অতিকায় বৃষ মন্দির সোপান মুখে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত। একটি প্রকাণ্ড লৌহদ্বার অতিক্রম করে মন্দির অভ্যন্তরে যেতে হয় সেখানে বেদগিরীশ্বর মূর্তিতে মহাদেব বিরাজ করছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুই পাশে দুটি প্রদীপ জ্বলে—

সেই ম্লান দীপালোক অন্ধকারকে যেন আরও রহস্যময় করে তোলে। এ মন্দিরে কর্পূর আরতি দেবতার এক বিশেষ পূজা—আরতির সময় উজ্জ্বল আলোকে দেব-বিগ্রহকে স্পষ্ট দেখা যায়। বেদগিরীশ্বর বিগ্রহ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত একটি লিঙ্গ মূর্তি, অঙ্গে শোভিত রৌপ্য নির্মিত শিবসম্ভু। লিঙ্গ মূর্তির উপর ধাতুময় ভীমকায় নাগ ফণা ধরে আছে। মন্দির প্রদক্ষিণ করলে একস্থানে সৌম্যকান্তি মূর্তি দেখা যাবে। সৌম্যকান্তি মূর্তি হল হর-পার্বতীর মূর্তির মধ্যে খোদিত গণেশ মূর্তি।

মন্দিরটি বহুকালের পুরানো। এর সম্পর্কে এক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত যে, স্বয়ং শিব কোন এক সময়ে এখানে তপস্যারত ছিলেন এবং পরম ভক্ত নন্দী পাহারা দিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই বিষ্ণুর আজ্ঞায় খগরাজ গরুড় মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। প্রভু-ভক্ত নন্দী দ্বারে বৈনতেয় গরুড়কে বাধা দিলেন, "বিহগরাজ, মার্জনা করবেন, শিব দর্শনে যাবার আজ্ঞা নেই। প্রভু এখন ধ্যানমগ্ন।"

গরুড় নন্দীকে বললেন, "প্রিয় নন্দী, আমি আমার প্রভু বিষ্ণুর বার্তা নিয়ে তাঁর আজ্ঞায় শিব দর্শনে এসেছি। আমায় তাঁর কাছে যেতে দিন।"

গরুড়ের বিনয় বচনেও শিব-আজ্ঞাবহ নন্দী বিগলিত হলেন না, নিরুপায় হয়ে বিষ্ণুবাহন গরুড় তখন ঊর্ধ্বাকাশে উঠে উচ্চঃস্বরে মহাদেবকে ডাকতে লাগলেন। গরুড়ের ডাক শুনে মহাদেব মন্দিরের বাইরে এসে সব কিছু অবগত হলেন এবং অপরিণামদর্শিতার জন্যে নন্দীকে তিরস্কার করলেন। প্রভু কুপিত হয়েছেন মনে করে ব্যথিত নন্দী এখানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন বলে জনপ্রবাদ। তখন থেকে এই স্থানের নাম বেদগিরি বলে আখ্যাত হয়েছে। আরও কথিত আছে যে, বেদ মূর্তিমান হয়ে এখানে উপাসনা করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এখানে শিব আরাধনা করেছিলেন। লোকের ধারণা যে, অদ্যাপি দেবরাজ ইন্দ্র বারো বছর অন্তর লোকচক্ষুর অন্তরালে একদিন এখানে পদার্পণ করে থাকেন শিব পূজা করার জন্য এবং সে সময় ঘন ঘন জমূতমন্দ্রে ও বজ্র নির্ঘোষে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষিত হয়।

মহাবলীপুরমের অপর এক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ জলায়তন। এঁর মন্দির ধ্বংস হয়েছে। কথিত যে, শিবভক্ত বাণাসুর এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বৈদিসবরণ কয়েল

ভেলপুরম থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দক্ষিণে পড়ে বৈদিস-বরণ কয়েল। রেল স্টেশনের নিকটেই মন্দির। পশ্চিম দিকে মন্দির প্রবেশের প্রধান গোপুরম। মূল মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির—বেশ প্রশস্ত। শিবের নাম বৈদ্যেশ্বর। ইনি জাগ্রত দেবতা ও মহা মহা কঠিন ব্যাধি হতে মানুষকে নিরাময় করে থাকেন। মন্দিরের পশ্চিম-দ্বার ও গোপুরমের প্রস্তুত প্রণালী এমন যে, বছরের কোন এক সময় এই গোপুরের গবাক্ষ দিয়ে অস্তমান সূর্যের রক্তিমালোক মন্দির প্রাঙ্গণ পেরিয়ে দিব্যলিঙ্গের উপর পড়ে। সেই সময় দেবদর্শন মহা পুণ্যের। দূর-দূরান্তর হতে নিত্য বহু লোক রোগ মুক্তির জন্য এখানে এসে দেবতার কাছে ধর্ণা দেয়। বৈদ্যেশ্বর তাঁর কল্যাণ আশীর্বাদে মানুষের যন্ত্রণা দূর করেন।

বৈদ্যেশ্বর শিবের মহাত্ম্য বিষয়ে প্রচার আছে যে, কোন এক সময়ে সুর-অসুরে যুদ্ধ হয়েছিল। ব্রহ্মার বলে বলীয়ান হয়ে অসুররা অস্ত্রাঘাতে অমর দেবতাদের ক্ষত-বিক্ষত করে পর্যুদস্ত করতে লাগল। দেবগণ হতবীর্য হয়ে ধরাশায়ী হতে লাগলেন। অনন্যোপায় দেখে দেবতারা রণে ভঙ্গ দেবার উপক্রম করায় মহাদেব তাঁদের এ অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বৈদ্যবেশে রণক্ষেত্রে উপনীত হন ও ঔষধি প্রয়োগে দেবতাদের ক্ষত আরোগ্য করে তাঁদের আবার বলশালী করে তোলেন। যুদ্ধে অসুররা পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দেয়। তদবধি বৈদ্যরূপী মহাদেব এখানে বৈদ্যেশ্বর নামে প্রতিষ্ঠিত আছেন ও রোগীর রোগ যন্ত্রণা আরোগ্য করছেন।

তিরুভেলকাডু বা শিবতারণ

বৈদিসবরণ কয়েল থেকে ৬·৫০ কিলোমিটার দূরে তিরুভেলকাডু। শিবের মন্দির ছোট অথচ সুন্দর। কিন্তু শিবের মূর্তি অতীব ভয়াবহ। মহাদেবের এমন ভয়ানক রুদ্রমূর্তি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। প্রবাদ যে, জালন্দার দানবের পুত্র মনুতাসুর অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। তার ভয়ে মুনি-ঋষিরা প্রচ্ছন্ন থেকে এখানে জপতপ করতেন এবং একাগ্রচিত্তে মহাদেবকে ডাকতেন এই ভয়ঙ্কর দানবের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। ঋষিদের কাতর ডাক মহাদেবের কানে গেলে

তিনি তাঁর বাহন বলীবর্দকে অসুর বধের জন্য পাঠালেন। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হল। বলীবর্দ অসুরকে শিঙে বিদ্ধ করে সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করায় মরুতাসুর পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। তারপর সেও শিবারাধনায় নিমগ্ন হয়ে তপস্যায় আশুতোষকে তুষ্ট করে বরস্বরূপ তাঁর শূলটি লাভ করল। তারপর অসুর মহাদেবের বলে বলীয়ান হয়ে ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করল—লোকেরা ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগলো ও শিবকে ডাকতে লাগল। তখন মহাদেব পুনরায় বলীবর্দকে পাঠালেন অসুরকে ক্ষান্ত করতে কিন্তু মরুতাসুরের হাতে শিবের শূল দেখে সে আর আক্রমণ করল না। অসুর বলীবর্দকে রণে নিশ্চেষ্ট দেখে তার শিঙ ও পুচ্ছ কর্তন করে দিল। বলীবর্দ মহাদেবের কাছে ফিরে এসে সব কথা জানালে প্রিয় বাহনের এরূপ নিগ্রহ দেখে মহাদেবের তৃতীয় নয়ন ক্রোধে অগ্নিশিখার মত ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় প্রাণ কেঁপে উঠল ত্রাসে—মহাদেবের ভয়ে দেবতারা তাঁর স্তুতি বন্দনা করতে লাগলেন। মহামায়া নিজ মায়ার প্রভাবে বলীবর্দকে পূর্ণাবয়ব দান করে ক্রোধোন্মত্ত শিবের কাছে গেলেন, কিন্তু শিব ক্রোধ সম্বরণ করলেন না—ভীষণ মূর্তি ধারণ করে মরুতাসুরকে বধ করলেন। সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি এই মন্দিরে স্থাপিত—শিবের মুখ ভয়ঙ্কর, তাঁর মুখব্যাদানের দু'পাশে হাতির মত বিরাট দুই দন্ত, নয়ন দুটি করাল অগ্নিবর্ষী —শিবের অতীব ভয়ঙ্কর সংহারক মূর্তি। ফাল্গুন মাসের চতুর্দশীতে এখানে মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

চন্দ্রশেখর—মায়াভরম্

এই শিবলিঙ্গ মূর্তি অতি প্রাচীন। মূর্তিটি অপরূপ। জটাজূট বিমণ্ডিত হাড়মালা পরিশোভিত ফণিভূষণ মহাদেবের শান্ত মূর্তি, রজতগিরির মত কান্তি, পার্বতীকে হস্তদ্বারা আবেষ্টন করে বসে আছেন। সহাস্য বদন ললাটে ইন্দু শোভমান—দর্শনমাত্র হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠে। মূর্তির কপালে জ্ঞাননেত্র প্রজ্জ্বলিত। নয়ন দুটি ধ্যানস্থ। চন্দ্রশেখরের অপূর্ব নয়নাভিরাম মূর্তি। শিব এখানে সুন্দরের প্রতিমূর্তি।

বীরত্তেশ্বর—বাজ্‌ভর

মায়াভরমের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৮ কিলোমিটার দূরে বাজ্‌ভর নামক

স্থানে বীরত্বেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপিত। বিগ্রহের অন্য নাম গজসন্তুর। কথিত যে, পুরাকালে লিঙ্গ মূর্তিতে বীরত্বেশ্বর অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে এক মহাযোগী পুরুষ শিবশক্তির প্রাধান্য বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে শক্তি পরীক্ষা করার জন্য যোগ প্রভাবে একটি মত্ত-মাতঙ্গ সৃষ্টি করেন এবং তাকে মন্দির ধ্বংস করতে আদেশ দেন। ভীমকায় মত্ত গজ বিক্ষিপ্ত পদে মন্দির ভেঙে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শিবলিঙ্গের উপর পদভার রাখে। ক্রোধে ত্রিশূলীর ত্রি-নয়ন জলে ওঠে ধ্বক্ করে, তিনি তৎক্ষণি গজসন্তুর মূর্তি ধারণ করে মাতঙ্গকে সংহার করেন ও তার চর্ম ধারণ করে নৃত্য করতে থাকেন। তখন সৃষ্টির বৈষম্য আশঙ্কা করে দেবী পার্বতী ভীতা হয়ে পুত্র কোলে শিব সম্মুখে কৈলাস থেকে এসে উপস্থিত হলেন। দেবীকে দেখে মহাদেব শান্ত হলেন। ঐ মাতঙ্গ মূর্তি আজও রয়েছে বাজুভর মন্দিরে এবং মহেশ্বরের গজসন্তুর মূর্তিটিও রয়েছে। মন্দির মধ্যে শিব মাহাত্ম্য বিষয়ক কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত আছে, তার মধ্যে বৃকধন ও মোহিনী মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য।

কুম্ভকোণাম্ শিবতীর্থ

মায়াভরন্ থেকে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ রেল পথে কুম্ভকোণাম্ শহর। অতীতে কুম্ভকোণাম্ সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশও মনোরম। কুম্ভকোণাম্ এককালে সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শ স্থান ছিল—সাংখ্য, বেদান্ত, উপনিষৎ ও ব্যাকরণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য কাশীর তুল্য বিখ্যাত ছিল। এখানে বহু দেব-দেবীর মন্দির আছে। স্বচ্ছ সলিলা কাবেরী বক্রভাবে শহরের উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত, শহরের দক্ষিণে আলসার নদী। তাই এখানে প্রায়ই জলপ্লাবন হয়ে থাকে। কুম্ভকোণাম সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, মহাপ্রলয়ের সময় পৃথিবী যখন জলে নিমগ্ন ছিল তখন একটি মৃন্ময় কলস বা ঘট ভেসে এসে এখানে সংলগ্ন হয়, কেবলমাত্র কলসের কানা জলের উপর দেখা যেতে থাকে। প্রলয় শেষে ঐ ঘট ভেঙ্গে ওখানে পড়ে থাকে। তারই উপর ব্যাধরূপ ধারণ করে হর-পার্বতী লিঙ্গ স্থাপন করেন। বর্তমানে কুম্ভকোণামে ১২।১৩ টি বিখ্যাত শিব-দেউল আছে তাদের মধ্যে কুম্ভেশ্বর-নাগেশ্বর প্রসিদ্ধ। প্রবাদ, নাগেশ্বর মন্দিরে সূর্যদেব শিবার্চনা করেছিলেন। মন্দিরটি তৈরী হয়েছে এমন বৈজ্ঞানিক

প্রণালীতে যে, পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত বছরের কয়েকটা দিন মন্দিরের প্রায় দু'হাজার ফিট অর্থাৎ ৬০০ মিটার অভ্যন্তরে পশ্চিম গোপুরমের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি লিঙ্গ মূর্তির উপর পড়ে মূর্তিকে উজ্জ্বল করে তোলে।

দরসূরামের শিব দেউল

কুম্ভকোণামের ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এই মন্দির স্থাপিত। দরসূরাম যোগীদের প্রসিদ্ধ তীর্থ, কারণ পৃথিবীতে এই স্থানে রুদ্রাক্ষ বৃক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল পুরাণে এইরূপ কথিত আছে। পুরাণে বলা হয়েছে যে, এখানে দেবাদিদেব মহাদেব রুদ্রাক্ষ বৃক্ষরূপে প্রথমে আবির্ভূত হন, সেই সময় বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও পত্রগুলি এক একটি যোগী-পুরুষের আকার নিয়ে ছিল। মহাদেবের পরমভক্ত ত্রিপুরাসুর শিববরে ক্ষমতাবান হয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ঘোর অত্যাচারে প্রপীড়িত করছিল। তার ভয়ে ঋষিরা তপস্যা থেকে বিরত হতে বাধ্য হলেন, তা ছাড়া দেশ থেকে যাগযজ্ঞ, ধর্ম-চর্চা, পূজার্চনা লোপ পাবার উপক্রম হল। সমগ্র জগতে অরাজকতা, অনাবৃষ্টি, কলহ ও অকালমৃত্যু দেখা দিল। বিষ্ণু ও ব্রহ্মা সৃষ্টি ধ্বংসের আশঙ্কায় মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এখানে এলেন ও তাঁর ভক্ত ত্রিপুরাসুরের অত্যাচারের বিষয় বললেন। ত্রিপুরা ধর্মের হানি ও দেবতাদের অত্যাচার করছে শোনা-মাত্র মহাদেবের ত্রিনয়ন জ্বলে উঠল ক্রোধে এবং তিন বিন্দু অশ্রু ত্রিনয়ন হতে স্খলিত হয়ে মাটিতে পড়ল। পরে ঐ অশ্রু বিন্দু বীজ স্বরূপে তিন প্রকার রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ উৎপন্ন করে। তার ফল যোগী ও দেবতারা পরম পবিত্র জ্ঞানে অঙ্গে ধারণ করে থাকেন। রুদ্রাক্ষের সচরাচর ১৩ টি করে পল থাকে। রুদ্রাক্ষের পল যত কম থাকবে তার শক্তি ও উপকার তত বেশী হবে।

দরসূরামের মন্দির বহু প্রাচীনকালের সৃষ্ট। কথিত যে, স্বয়ং দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মা এই মন্দির নির্মাণ করেন। এর গঠন প্রণালী ভিন্ন ধরনের।

মালেশ্বর—ইন্দ্রকিলা পর্বত, বেজওয়াদা

ইন্দ্রকিল পর্বত কৃষ্ণানদীর তট ঘেঁষে উঠেছে। প্রবাদ যে, অগস্ত্যমুনি এখানে এসে মালেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে বহুকাল ধরে

তাঁর আরাধনা করেন। মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন বনবাসকালে দুর্যোধনের নিধন কামনায় এই পর্বতে এসে মহাদেবের আরাধনা করেন। কিরাত শবররূপী মহাদেব অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন—পরে সন্তুষ্ট হয়ে পার্বতীসহ নিজ পরিচয় দেন এবং অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। মহাভারতে আছে এ কাহিনী।

সুন্দরেশ্বর—মাদুরা

দক্ষিণ ভারতে মাদুরা একটি পুরাতন ও ঐতিহ্যময়ী নগরী। এই নগরী অতীতে পাণ্ডব রাজাদের রাজধানী ছিল। সুন্দরেশ্বর শিব ও দেবী মীণাক্ষীর মন্দির মাদুরার গৌরব। যুগ-যুগান্তর ধরে সুন্দরেশ্বর জাগ্রত দেবতা হিসাবে এখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মাদুরার দেবালয় দুই ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণ ভাগে মীণাক্ষী দেবীর মন্দির ও উত্তর ভাগে সুন্দরেশ্বরের মন্দির। মন্দিরে চারদিকে চারটি বিরাট গোপুরম আছে। মন্দিরে পাথরের স্তম্ভগুলির উপর সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়। নানারূপ সুন্দর মূর্তি পাথর কেটে খোদাই করা হয়েছে। তোরণ পথের দক্ষিণ দিক থেকেই সুন্দরেশ্বর শিব-দেউলের চূড়া দেখা যায়।

সুন্দরেশ্বর শিবের মূল মন্দির অন্ধকারাচ্ছন্ন। শত শত দীপালোকে মন্দিরকে আলোকিত করে রাখা হয়। মন্দির অভ্যন্তরে গৌরী পীঠের উপর চন্দন ও ফুলমালায় সজ্জিত লিঙ্গমূর্তি স্থাপিত। মূল মন্দির অভ্যন্তরে কেউ প্রবেশ করতে পারেন না। মণ্ডপ থেকে বহির্গত হবায় রাস্তার উভয় দিকের দেওয়ালে উৎকীর্ণ শিব কর্তৃক অসুর বধ ও শিব শক্তির তাণ্ডব নৃত্যের ছবি ভীতি উৎপাদন করে। দেওয়ালের শিল্প সম্ভার দ্রাবিড় কৃষ্টির পরিচয় বহন করছে। পুরাণে কথিত আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিশিরা হত্যা করে ব্রহ্ম হত্যাজনিত পাপের জন্যে ইন্দ্রত্ব হারান। তখন দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশে এখানে এসে পীঠস্থান অনুসন্ধান করে এক অনাদি লিঙ্গের দেখা পেয়ে বহু বর্ষ ধরে তাঁর আরাধনা করেন। শিব ইন্দ্রের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে পাপ মুক্ত করেন। শিবের আশীর্বাদে দেবরাজ স্বর্গরাজ্য ফিরে পান। ইন্দ্রদেব ভাস্কর বিশ্বকর্মাকে সত্বর এই অনাদি লিঙ্গের জন্য একটি সুচারু মন্দির গঠনের আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্মা শীঘ্রই এক অতি মনোহর মন্দির নির্মাণ করলেন ও

এই মন্দিরের পাশে আর একটি মন্দির নির্মিত হয়ে তার মধ্যে দেবী পার্বতী স্থাপিতা হলেন। মন্দিরের সুন্দর গঠনের জন্য শিবলিঙ্গের নাম হল সুন্দরেশ্বর। দেবরাজ স্বর্গে ফিরে না গিয়ে এখানেই সুন্দরেশ্বরের সেবা করে দিন যাপন করতে লাগলেন। একদিন শিব তাঁকে বললেন, "সুরপতি. আমি তোমার পূজায় পরিতুষ্ট হয়েছি ; এখন স্বর্গে অরাজকতা উপস্থিত, তুমি অতি শীঘ্র নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করো। বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে এসে আমার পূজা করলে সম্বৎসরের পূজার্চনার ফললাভ হবে।"—ইন্দ্র শিব-আজ্ঞা শিরোধার্য করে শিবকে প্রণাম নিবেদন করে স্বর্গরাজ্যে ফিরে গেলেন। সেই দিন থেকে প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় বিপুল জনসমাগমের মধ্যে সুন্দরেশ্বরের বিশেষ পূজোৎসব পালিত হয়ে আসছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিব

পশ্চিমবঙ্গের শিবভাবনা ও শিবসাধনা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছু স্বতন্ত্ররূপ নিয়ে বৈশিষ্ট্যময়। মন্দিরের গঠন বৈচিত্র্যে, দেবতার পূজা পদ্ধতিতে অথবা শিব সম্পর্কীয় কিম্বদন্তী ও কল্প-কথায় প্রদেশে প্রদেশে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য মূলগত নয়, আর সে রকম হতেও পারে না কারণ স্বয়ম্ভু শিব এক-মেবাদ্বিতীয়ং—তিনি মহেশ্বর, তিনি বিশ্বনাথ। পশ্চিমবঙ্গে শিবভাবনার স্বতন্ত্রতারক্ষেত্র তার সমাজ জীবনের আঙ্গিনা—তার লোকধর্ম।

বাঙ্গালীর কল্পনায় তার ভাবনায় শিব নানারূপে ভাস্বর হয়ে আছেন যদিও সুদূর অতীতকাল থেকে এ দেশে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতধারা যেমন বৈষ্ণব, গাণপত্য ও শাক্ত এবং অন্য ধর্ম যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সময়ে সময়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। শিব বঙ্গবাসীর প্রাণের আসনে বসে তার প্রাণের পূজা গ্রহণ করে চলেছেন যুগ-যুগান্ত ধরে।

বাঙ্গালীর কাছে শিব যেমন পরম মঙ্গলবিধায়ক সত্য সুন্দর পরমেশ্বররূপে অনুভাবিত তেমনি আবার তিনি বাঙ্গালীর ঘরের প্রিয় দেবতা হয়ে আসন পেতেছেন বাংলার সর্ব শ্রেণীর ঘরে—চাষী হয়ে চাষ করছেন, পশুপালক হয়ে পশু পালন করছেন, পার্বতীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন মানবিক দম্পতির কলহ যেন। আবার ভাঙ্গ খেয়ে নেশা করে বেহুঁশ হচ্ছেন, গাজনে ভক্তজনের সঙ্গে গান গেয়ে আনন্দে নৃত্য করছেন —বাংলার মানবিক মূর্তির সঙ্গে বাংলার গণদেবতা শিবের যেন কোন তফাৎ নেই—জীবনযাত্রা, পেশা, এমন কি নেশাটি পর্যন্ত এক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এ চিত্র শুধু দেখা যাচ্ছে সমাজ জীবনের আচার অনুষ্ঠানে, ছড়ায়-গানে—শিব ভাবনায় কিন্তু মন্দিরে মন্দিরে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই শিব বিরাজ করছেন লিঙ্গরূপেই। বাঙ্গালীর প্রিয় দেবতা শিব—তিনি যেন ঘরের মানুষ হয়ে তার আপনজন। এখানে যিনি শ্রেয় তিনি হয়েছেন প্রিয়। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে মনে হয় এমন কোন গ্রাম বা জনপদ নেই যেখানে শিব মন্দির নেই বা শিবের পূজা হয় না।

এখানে শিবের নামেই বেশ কিছু জায়গার নাম যেমন একেশ্বর, তারকেশ্বর প্রভৃতি। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে শিবের প্রতিষ্ঠা আছে। পশ্চিমবঙ্গে অনাদিলিঙ্গ শিবের আবির্ভাবের সঙ্গে গোপ বা সদ্‌গোপ বা অন্য নিম্ন জাতির প্রায় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থেকে অনুমান করা যায় কি ভাবে বৈদিক দেবতা শিব পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের অন্ত্যজ সমাজে প্রবেশ করেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের মত বঙ্গদেশেও সুদূর অতীতকাল থেকে শৈব ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে আছে। সে সময়ে ছিল অবিভক্ত বৃহৎ বঙ্গ—ছোট সীমারেখায় ঘেরা আজকের পশ্চিমবঙ্গ নয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সময়ে হিন্দুদের মধ্যে সম্ভবতঃ শক্তি উপাসক সংখ্যায় বেশী—কিন্তু শিব শক্তি একই অঙ্গের দুই রূপ বলে তাঁরা শিব উপাসকও। কালী শিবের বুকেই দাঁড়িয়ে আছেন, দুর্গোৎসবে জামাতা শিবকেও সমাদরে পূজা করে বঙ্গবাসী। শক্তিকে ঘিরে পাশে রয়েছেন শিব। এ ছাড়া বারো মাসে শিবের পার্বণ তো এখানে আছেই লেগে নীল পূজা, গাজন-চড়ক ও শিবরাত্রি পালনের মধ্যে। বস্তুতঃ, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখা-ধর্ম যেমন শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপাত্য স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাশাপাশি অবস্থান করলেও সর্বধর্মমতনির্বিশেষে এখানের মানুষের কাছে বিশেষ করে কুমারী ও সন্তানবতী জননীর কাছে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রভাব অবিসংবাদিত।

মহাভারতের যুগে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে শৈবধর্ম প্রচারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শিবভক্ত পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধ। সম্ভবতঃ তাঁর প্রভাবে বৃহৎ বঙ্গে শৈব ধর্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হয়ে থাকবে। জরাসন্ধের পূর্বে বঙ্গে শিব অধিষ্ঠিত ছিলেন না এমন কথা বলাও সম্ভবতঃ ঠিক নয় কারণ সমগ্র বঙ্গদেশে আর্য আধিপত্য বিস্তার বিলম্বে ঘটলেও তার উত্তর ভাগে আর্য-অনার্য মিশ্রিত ভাবধারা দানা বেঁধে ছিল মহাভারতের যুগের আগে থেকেই।

বঙ্গাধিপ মহারাজ শশাঙ্ক ছিলেন শৈব—শিবভক্ত। তাঁর আমল থেকেই হয়তো গৌড়বঙ্গের ঘরে ঘরে শিব গৃহদেবতা। তারপর এদেশে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ এলেন ও কালী এলেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্যের যুগেও বঙ্গদেশে শৈব ধর্মের তেমন প্রচার না হলেও শিব তাঁর গরিমা হারাননি।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন পুঁথি বা কাব্যে যেমন, মনসা মঙ্গল, শিবায়ন,

অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে দেব-দেবীর মন পাওয়ার জন্য দেবতাদের মাহাত্ম্য গাওয়া হয়েছে। সমাজের মঙ্গলের জন্য শিবঠাকুরকে করা হয়েছে একেবারে ঘরের মানুষ। এটিও এক ধরনের শিব-প্রচার। প্রচার করেছেন বর্ণ হিন্দুরাই। তাঁদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। 'শিবায়ন' কাব্যে শিবের চিত্র মানুষের চিত্রই। নেশাখোর শিব ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে, কৈলাসে তাঁর ঘর-সংসার আছে, ছেলে-মেয়ে আছে। বুড়ো বর নিয়ে গৌরীর মহাজ্বালা। অভাবের সংসারে যা হয়—শিব-গৌরীর নিত্য কলহ লেগেই আছে। শেষে স্ত্রীর পরামর্শে শিব মর্তে নেমে চাষ-বাসের কাজে মনোনিবেশ করলেন। ত্রিশূল গালিয়ে লাঙ্গল হল। শিব চাষী হলেন। একেবারে তৎকালীন সামাজিক চিত্র। শিবদুর্গা ঘরের মানুষ। চাষের দেবতা হিসাবে শিবের এই ঘরোয়া রূপ যা সেকালে বাঙ্গালীর জীবনরূপই ছিল তা ফুটেছে শিবায়নে। "অন্নদামঙ্গলে"ও শিব নেশাখোর, আধ পাগল—তবু প্রিয়। বাঙ্গালীর এই শিবভাবনা কিন্তু বৈদিক শিবভাবনা নয়।

শৈব ধর্মের সঙ্গে হিন্দুর অন্য ধর্মমত যেমন বৈষ্ণবধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধ এদেশেও বাঁধেনি তা নয় কিন্তু শিবের অবিসংবাদী প্রভাব সব কিছু ছাপিয়ে অম্লান থেকেছে। এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তি ঘটলেও বৌদ্ধ ধর্মের কিছু রীতিনীতি ও আদর্শ মনে হয় একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি, শিবের মধ্যে বুদ্ধ মিশে গেছেন উভয়ের মধ্যে কিছু গুণগত সাদৃশ্য থাকায়। পরবর্তীকালে দেখা যায় বঙ্গদেশে শিবের মূর্তির মধ্যে ধ্যানী বুদ্ধের ছায়া ফেলেছেন বঙ্গীয় ভাস্করেরা। তারপর বৌদ্ধতন্ত্র যখন হিন্দুতন্ত্রকে পুষ্ট করলো তখনও শৈবতন্ত্র হিসাবে এক তন্ত্র মতের চল রইল বঙ্গদেশে। তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত আলোচনা করলে দেখা যায় শিব ও শক্তি হলেন দুটি অংশ এবং যুগলেই পূর্ণ। শৈবাগম মতে শিব প্রধান ও শক্তি যদিও অপ্রধান তবু শিব ও শক্তি অভিন্ন। শিব শক্তি ব্যতীত অবস্থান করতে পারেন না। লক্ষ্য করার বিষয় তন্ত্র তত্ত্বের আঙ্গিনায় বাংলার শিবভাবনা অন্য বাঁক নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিবমন্দিরে বা শিবতলায় শিবলিঙ্গই বিরাজিত কিন্তু শিবমন্দিরগুলির গঠনাকৃতিতে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। সময়ের পথ ধরে স্থাপত্যরীতি বদলাতে পারে স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু তা নয়, পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় প্রাচীন মন্দির বাংলা রীতি অনুযায়ী তৈরী হয়নি। উত্তর ভারতের 'নাগর' ও দাক্ষিণাত্যের 'দ্রাবিড়' রীতির

সংমিশ্রণে 'রেখ' দেউল হিসাবে গড়ে উঠেছে। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির ও বরাকরের বেগুনিয়া শিব মন্দির হল এর দৃষ্টান্ত। কিভাবে গ্রাম বাংলার বুকে এ ধরনের মন্দিরের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। তাহলে মনে হয় বঙ্গদেশে শিবের আবির্ভাবের ইতিহাসের উপরেও আলোকপাত হবে। জোড়বাংলা মন্দির, চার-চালা মন্দির বা আটচালা মন্দির, কোঠা মন্দির ও আলগোছটুঙ্গী মন্দির অর্থাৎ কোঠা মন্দিরের ছাদের উপর একরত্ন বা এক চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরগুলিই হল বাংলা রীতির মন্দির।

পশ্চিমবঙ্গে কোঠামন্দির ও আটাচলা মন্দিরই বেশী দেখা যায় যত্র তত্র। আটচালা মন্দিরগাত্রে টেরাকোটার অপূর্ব অলঙ্করণ বাংলার নিজস্ব শিল্পবৈশিষ্ট্য। তারকেশ্বর শিবমন্দির একটি অলঙ্করণযুক্ত বৃহৎ আটচালা শিবমন্দির।

আমরা গভীর অভিনিবেশসহ লক্ষ্য করলে দেখবো যে, বেদ পুরাণ ও কাব্যে দেবাদিদেব মহাদেব যেভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত হয়েছেন অথচ অনন্য থেকেছেন অন্য কোন দেবতা সেভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মহিমামণ্ডিত হয়ে দেখা দেননি। বঙ্গদেশেও দেখা যায় শিবের মহিমময় রূপের মাঝেই বিবর্তন ঘটেছে তাই তার শিবভাবনার ক্ষেত্রটি যেমন বিস্তৃত তেমনই ব্যঞ্জনাময়। শিবকে নিয়ে বাঙ্গালীর কল্যাণভূমি পবিত্র তীর্থ আছে, গৃহ মন্দির আছে, গ্রামে-গঞ্জে বুড়ো শিবতলা--পঞ্চানন তলা—মণ্ডেশ্বর তলা—জোড়া শিব মন্দির ও অভ্রংলিহ শিব-দেউল আছে, নীলের পূজা, গাজনের গান আছে, চড়কের মেলা আছে, শিবরাত্রির তপস্যা আছে—আনন্দের মেলা আছে, গম্ভীর ধ্যান আছে জ্যোতির্ময়লোকে আবার তন্ত্রের গোপন সাধনও আছে। শিবঠাকুর বাঙ্গালী প্রাণের ঠাকুর।

বাংলার শিবোৎসব

পশ্চিমবঙ্গে গাজন ও চড়ক শিবের বিশিষ্ট পূজা ও উৎসব। আনন্দময় শিবকে কেন্দ্র করে তাঁর পূজার্চনার মাধ্যমে নৃত্য-গীত সহযোগে এ আনন্দোৎসবও বটে আবার শিবভক্ত "সন্ন্যাস" ব্রতধারীদের ইন্দ্রিয় নিগ্রহের মধ্য দিয়ে শিবসাধনাও বটে—কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে ভোলাবাবার কৃপালাভ। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজনোৎসব

হয়। পশ্চিমবঙ্গে শিবের গাজন গান ও চড়কের মেলা অতিপ্রাচীন লৌকিক উৎসব। এদেশে দেখা যায় যে, সদ্‌গোপ ও গোপ জাতিরাই বেশীর ভাগ শৈব। মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলে শৈব-ধর্মের বহুল প্রচার এঁদের দ্বারাই হয়েছে। কিন্তু গাজন ও চড়ক উৎসবে গ্রামে-গঞ্জে শিব মন্দির প্রাঙ্গণে যারা সক্রিয় অংশ নিত বা আজও নেয় তাদের অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু। বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চলের লৌকিক দেবতা ধর্ম ঠাকুর বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। এঁকে কেন্দ্র করেও গাজনে উৎসব হত এবং আজও হয়।

নরমুণ্ড-নৃত্য বঙ্গের আদিবাসীদের অন্যতম আদিম অনুষ্ঠান এবং পরবর্তীকালে ক্রমে এই অনার্য অনুষ্ঠানই ধর্মঠাকুর ও শিবের গাজনোৎসবের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়েছে। গাজন কথাটি এসেছে গা + জন থেকে। গা অর্থে গ্রাম ও জন অর্থে জনসাধারণ—গাজন হল গ্রামের জনসাধারণের উৎসব। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ স্বনামখ্যাত রামকমল সেন গাজনের এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর লেখা 'চড়কের গাজন' প্রবন্ধে। ধর্মঠাকুর রাঢ়ের অন্যতম গ্রাম্য-দেবতা এবং গাজন গ্রামের জনসাধারণের উৎসব। ধর্মের গাজন গ্রাম-দেবতার লোকোৎসব। ধর্মঠাকুরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র লোক-ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে অথবা বলা যেতে পারে যে, বঙ্গের আদি লোক-ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্মের অনেক ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর গ্রাম-দেবতায় রূপায়িত হয়েছেন এবং তাঁর গ্রাম্য জনোৎসবের নাম হয়েছে 'গাজন'। তারপর ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও শৈবধর্ম প্রচারকগণ জনসাধারণের মধ্যে শিব-প্রভাব বিস্তার মানসে এই গাজনকে শৈব উৎসবে পরিণত করেছেন। শিব ক্রমে প্রধান গ্রাম-দেবতা হয়েছেন ও ধর্মের 'গাজন' শিবের 'গাজন' হয়েছে।

গাজনে নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্য করা যাকে বলা হয় মড়াখেলা তা ছিল ধর্মঠাকুরের গাজনের অঙ্গ। এই বীভৎস ব্যাপারটা অর্থাৎ গলিত নৃমুণ্ড নিয়ে নৃত্য-গীত করা শিবের গাজনেও গৃহীত হল এবং এখনও কোন কোন স্থানে যেমন বর্ধমানের কুড়মুন গ্রামে ঈশানেশ্বর শিবের গাজনে এই নাচ হয়ে থাকে। এই অনার্য ব্যাপার অবশ্য বর্তমানে প্রায় লোপ পেয়ে এসেছে গাজনোৎসব থেকে।

আগেকার দিনে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই গাজনের 'সন্ন্যাসী' হত এবং এখনও সেই প্রথাই চলে আসছে। সন্ন্যাসীদের একমাস

ধরে গৈরিক বস্ত্র পরে শুদ্ধাচারে থাকতে হয় ও 'ভিক্ষে' করতে হয় শিবের নামে যেমন, "বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে" এই কথা বা অন্য নাম বলে। সন্ধ্যার সময় হবিষ্যি খেতে হয়। চড়কের দিন সকালে গাজনের সন্ন্যাসীরা গাজন তলায় গিয়ে বাণ ফুঁড়তো আগে, এখন বাণ ফোঁড়া হয় তবে সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। বাণ ফোঁড়া অর্থাৎ শরীরে তীক্ষ্ণ শলাকা বেঁধানো। এই বাণ ফোঁড়া অনেক রকম আছে যথা, জিব বাণ অর্থাৎ জিবের মধ্যে শলাকা ফোঁড়া, কান বাণ অর্থাৎ কানে লৌহ শলাকা বেঁধানো বা পিঠ বাণ অর্থাৎ পিঠে বাণ বেঁধানো। পিঠে বাণ বেঁধে চড়ক গাছে ঘুরতো 'সন্ন্যাসী'রা আগের দিনে, এখন এই পিঠ বাণ নিষিদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া কাঁটাঝাঁপ আছে।

চড়কের দিনে দেশের বিভিন্ন শিবালয় প্রাঙ্গণে বা চড়ক তলায় 'ঝাঁপ' ও মেলা গাজনোৎসবের এক বিশেষ অঙ্গ। চড়কের কেন্দ্রবিন্দু শিবের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস। তারকেশ্বর, এক্তেশ্বর, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত রত্নেশ্বর ও বর্ধমানের কুড়মুন প্রভৃতি স্থান 'গাজনের' জন্য প্রসিদ্ধ।

গম্ভীরা

মালদহের "গম্ভীরা" নামক লোকসঙ্গীত জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই উৎসব প্রচলিত। প্রতি বছরে চৈত্র মাসের শেষ তিন দিন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি সামিয়ানার নীচে শিবের মূর্তি স্থাপন করে এই উৎসব পালিত হয় এবং বিগত বছরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী নৃত্য-গীত ও অভিনয় সহযোগে সমালোচিত হয়। দিনাজপুর অঞ্চলের শিবভক্ত বাণ রাজা এই উৎসব প্রচলন করেন বলে কথিত। অতীতকালে হিন্দু ও মুসলমানদের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গম্ভীরা রচিত হত। পরে সমসাময়িক সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনও এই গম্ভীরার বিষয়ভুক্ত হয়।

নীলপূজা

পশ্চিমবঙ্গের শিব আরাধনার সঙ্গে নীলের পূজা ও অনুষ্ঠান জড়িয়ে গেছে। নীলের পূজা নীলকণ্ঠেরই পূজা। চৈত্র মাসের শেষ দিকে চড়ক উৎসবের আগের দিন নীলের পূজা করা হয়। মেয়েরাই নীল পূজা করেন। পূর্ববঙ্গে (এখন বাংলাদেশ) এই সময় গ্রামে গ্রামে

নীলের গান হত। যে গান শিব-সম্পর্কীয় লোকসঙ্গীত। পশ্চিমবঙ্গে সন্তানবতী সধবা নারীরা নীলের উপবাস করেন ও শিবের পূজা দেন। পণ্ডিতজনের ধারণা, নীল শিবের আবরণ—দেবতা ও ধর্মঠাকুরের কামিন্যা।

বাংলার শিব ও শিবক্ষেত্র

শিবকথার শুরু আছে কিনা জানা নেই কিন্তু শিবকথার শেষ নেই। পশ্চিমবঙ্গের শিবকথারও তাই অন্ত নেই। পশ্চিমবঙ্গের ষোলটি জেলায় বিভিন্ন স্থানে নানা নামে অনাদি লিঙ্গ বিরাজ করছেন। করুণাময় ভগবান তাঁর করুণা বিলিয়ে আতুর দুঃখী নর-নারীকে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিচ্ছেন—তাদের সঞ্জীবিত করছেন অভয় মন্ত্রে। "নমঃ শিবায়ঃ, নমঃ শিবায়ঃ"—প্রাণের এই প্রণাম জ্যোতির্ময়লোকে নিয়ে যাচ্ছে ভক্তজনকে। শিব সত্য সুন্দর হয়ে এখানে মূর্ত রয়েছেন। ক্লেদ আছে, কলুষতা আছে, দুর্নীতি ব্যভিচার আছে, দুর্বলতা আছে, কাপট্য আছে, হিংসা আছে কিন্তু অভয়ঙ্কর শিবমন্ত্র উচ্চারণে সব ভস্ম হয়ে যায়। এই পুস্তকে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্থিত সকল শিব মন্দিরের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, তাই কেবল কতিপয় শিবলিঙ্গ ও মন্দিরের বর্ণনা করা যাচ্ছে।

দুর্জয়লিঙ্গ, দার্জিলিং

কিংবদন্তী আছে যে, দার্জিলিং-এর অরজরভেটরী পাহাড়ের উপর দুর্জয়লিঙ্গ নামে অনাদি লিঙ্গ শিবের মন্দির ছিল। ইনি অতি জাগ্রত দেবতা হিসাবে বিবেচিত হতেন। শিব মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এখন দুর্জয়লিঙ্গ পাহাড়ের একটি গহ্বরে বিরাজ করছেন। স্থানটি এতই দুর্গম যে, সেখানে মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। অনেকে মনে করেন যে, দুর্জয়লিঙ্গের নাম থেকেই দার্জিলিং নামের সৃষ্টি হয়েছে। শিবরাত্রির সময় এখানকার কুমারী মেয়েরা নিষ্ঠার সঙ্গে শিব পূজা করে থাকে।

জল্পেশ্বর, জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে তিস্তা নদীর অপর পারে জল্পেশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত। এটি একটি

প্রসিদ্ধ শৈব পীঠ। প্রতি বছর শিবরাত্রির মেলায় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। মেলাতে অনেক পাহাড়ীয়া জাতীয় লোক আসে এবং নানাপ্রকার জীব-জন্তুর বেচাকেনাও চলে। জল্পেশ লিঙ্গ ভূগর্ভে প্রোথিত। প্রবাদ যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা জল্পেশ্বর গভীর জঙ্গলের মধ্যে এই দিব্য লিঙ্গকে প্রথম দেখতে পান। বর্তমান গৌহাটি অতীতের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। রাজা মন্দির তৈরী করে শিবলিঙ্গের নাম নিজ নামানুসারে জল্পেশ্বর রাখেন। সেই আদি মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে অনেককাল আগে। তারপর প্রায় তিনশ বছর পূর্বে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ জল্পেশ্বরের বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটি আলগোছটুঙ্গী মন্দির ছিল। শিরোভাগে বতুটি গুম্বজাকার থাকায় এটিকে মসজিদের মত দেখাত। এখন মন্দিরের গঠন পরিবর্তিত করা হয়েছে। মন্দিরটি নিতান্তই আধুনিক বলে মনে হয়। জল্পেশ মন্দিরের প্রথম তলটি চতুষ্কোণাকৃতি এবং প্রত্যেক কোণে আছে একটি করে ঘর।

জল্পেশ লিঙ্গটি ভূগর্ভে প্রোথিত, দেখলে একখণ্ড সামান্য পাথর বলে মনে হয়। অনেকের মতে স্থানীয় আদিবাসীরাই এঁর প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। শিব-শতনাম স্তোত্রে উল্লিখিত আছে "অহং কোচবধূপুরে জল্পেশ্বর ইতীরিতঃ" অর্থাৎ কোচবিহার রাজ্যে আমি জল্পেশ্বর নামে পরিচিত।

কপিলেশ্বর, মুর্শিদাবাদ

বেলডাঙ্গা থানার অধীন ভাগরথীর পশ্চিম তীরে শান্তিপুরে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় লোকে এঁকে অতিশয় জাগ্রত দেবতা হিসাবে মান্য করে।

গঙ্গেশ্বর দেবীপুর ছাউনি

মুর্শিদাবাদের দেবীপুর ছাউনিতে এই প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ বিরাজ করছেন। সাধক-প্রবর রাজা রামকৃষ্ণের উত্তর-সাধক ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এই শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন। এছাড়া এখানে আরও চার পাঁচটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই দেবালয়-গুলিতে আরতি পূজা দেখবার মত।

জলেশ্বর, শান্তিপুর

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়ার মহারাজা রামকৃষ্ণের মাতা-ঠাকুরাণী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দির বাংলা ঢঙে নির্মিত ও অপূর্ব আলঙ্কারিত এর অঙ্গ। জলেশ্বর শিব মন্দির এই অঞ্চলে এক প্রসিদ্ধ শিবস্থান। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ পৌরাণিক চিত্রগুলির শিল্পচাতুর্য অতি চমৎকার।

বুড়োশিব, মাজদিয়া

কলকাতা থেকে উত্তর দিকে প্রায় ১০৫ কিলোমিটার দূরে মাজদিয়া রেলস্টেশন। স্টেশন থেকে শিবনিবাস তিন কিলোমিটার দূরে। শিবনিবাস মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, নসরত খাঁ নামে এক দস্যুকে দমন করবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার এখানে এসে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সকালবেলা যখন তিনি নদীতে হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন এমন সময় একটি রোহিত মৎস জল থেকে হঠাৎ লাফিয়ে তাঁর কোলের উপর গিয়ে পড়লো। এই দেখে রাজজ্যোতিষী বললেন, "মহারাজ রাজভোগ্য রোহিত মৎস যখন নিজে থেকেই আপনার অঙ্গে লাফিয়ে পড়েছে তখন এই জায়গাটিই রাজার বসবাসের একান্ত উপযুক্ত। মহারাজ, আপনি এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করুন।" এই স্থানটির তিন দিকে ইছামতী নদী প্রবাহিতা বলে স্থানটি বেশ সুরক্ষিত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জ্যোতিষীর কথা মত এখানে একটি নগর ও বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করে নাম রাখেন শিবনিবাস। তিনি এখানে ১০৮টি সুদৃশ্য শিব-দেউল স্থাপন করেন কিন্তু এখন সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত, দু-একটি মন্দির ছাড়া। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে শিবনিবাস কাশীর মত গণ্য হত। সেজন্য সে সময় একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত হয়েছিল—

"শিবনিবাস তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা।
উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠঠনা॥"

এখন এখানে একটি সুন্দর মন্দিরে বুড়োশিব নামে প্রায় আড়াই মিটার উঁচু শিবলিঙ্গ বিরাজ করছেন। শিবরাত্রি, চড়ক ও ভৈমী একাদশীর সময় এখনও এখানে বহুলোকের সমাগম হয়ে থাকে।

জলেশ্বর, কৃষ্ণনগর

জলেশ্বর শিব যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর পিতা গৌরমোহন লাহিড়ী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জলঙ্গী নদীর তীরে কৃষ্ণনগরে এঁর বাস ছিল। ইনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ মানুষ, শিবভক্ত ও যোগসাধন-পরায়ণ। ঘূর্ণি অঞ্চলে তাঁর নিজ বাটিতে মহাসমারোহে তিনি শিব-লিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন। জলঙ্গী নদীর জলের ভাঙ্গনে গৌরমোহনের বাড়ী-ঘর নদীর বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তখন তিনি মাতৃহারা পুত্র শ্যামাচরণকে নিয়ে কাশী চলে যান এবং স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তীকালে হরিচরণ মৈত্র নামে কৃষ্ণনগরের এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ একদিন হঠাৎ নদীর জলে নিমজ্জিত শিবলিঙ্গকে পেয়ে তাঁর নিজের বাড়িতে শিবকে প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করতে থাকেন। জল থেকে তুলে এনে শিবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনাদি লিঙ্গের নাম রাখা হল 'জলেশ্বর'। হরিচরণের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি ধ্বংস দশায় উপনীত হলে স্থানীয় অধিবাসীরা 'শ্রীশ্রীজলেশ্বর দেব ট্রাস্ট বোর্ড" গঠন করে মন্দিরের সংস্কার করেন। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস জলেশ্বর শিবলিঙ্গ অতিশয় জাগ্রত। এখানে শিব জলেশ্বর লিঙ্গরূপে তাঁর মাহাত্ম্যে অগণিত নর-নারীকে অমৃতলোকের সন্ধান দিয়ে চলেছেন।

পাণ্ডবেশ্বর

অণ্ডাল জংশন থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে অজয়নদের তীরে পাণ্ডবেশ্বর গ্রাম। পাণ্ডবেশ্বর শিবলিঙ্গ এখানে রয়েছেন। এই বিগ্রহ বহুকালের পুরানো। প্রবাদ যে, বনবাসে থাকার সময় পঞ্চপাণ্ডব এই অঞ্চলে নাকি কিছুদিন ছিলেন। তাঁরাই এখানে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভীমগড় নামে একটি পুরাতন গড়ের ভগ্নাবশেষও এখানে দেখা যায়। জনশ্রুতি যে, মধ্যম পাণ্ডব ভীম এই গড় নির্মাণ করেছিলেন। পাণ্ডবেশ্বর প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ।

ভুবনেশ্বর, ঢেকুর

বর্ধমান জেলায় অজয়নদের তীরে ঢেকুর গ্রামে ইছাই ঘোষের প্রতিষ্ঠিত 'ভুবনেশ্বর' মন্দির বহুকালের পুরাতন। অনেকে অনুমান

করেন, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই শিব-দেউল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি একটি ইঁটের তৈরী সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় রেখ দেউল।

১০৮ শিব মন্দির, বর্ধমান

বর্ধমান শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে নবাবহাটে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত ১০৮টি শিবমন্দির আছে। স্থানটির পরিবেশ বড় শান্ত ও পবিত্র।

১০৯ শিবমন্দির, কালনা

কালনায় বর্ধমান মহারাজের গঙ্গাবাস ও পূজার জন্য ১০৯টি শিব-দেউল প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই মন্দিরগুলি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগুলির শোভা ও স্থানটির পরিবেশ সুন্দর।

বুড়োরাজ, জামালপুর

বর্ধমান জেলার কালনা মহাকুমার পূর্বস্থলী থানার এক অখ্যাত গ্রাম জামালপুর। এখানে বুড়োরাজ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন নিতান্ত আটপৌরেভাবে। শিবলিঙ্গ রয়েছেন সাধারণ একটি চালাঘরে—কোন ইঁট পাথরের তৈরী মন্দিরে নয়। মন্দির করা নাকি দেবতার নিষেধ। নতুন ঘর ছাইলেও নাকি চাল ফুটো হয়ে যায়। বুড়োরাজার আবির্ভাব সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি অন্য কিম্বদন্তী-গুলির মত একই ধরনের—গোপ কর্তৃক শিবলিঙ্গ আবিষ্কারের কাহিনী। একটি দুগ্ধবতী গাভীর দল ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাওয়া ও লিঙ্গ মূর্তির শিরে দুগ্ধ অভিষেক করা এবং গাভীকে অনুসরণ করে গোপের শিবলিঙ্গ আবিষ্কার। প্রবাদ যে, নিমদহের এক সঙ্গতিসম্পন্ন গোপ যদু ঘোষ বুড়োরাজকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন এবং গ্রামের ব্রাহ্মণ ঠাকুর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন অনাদি লিঙ্গের। কিন্তু পূর্ণিমায় পূজার ব্যবস্থা হয়নি—ধর্মরাজের পূজা প্রথা মেনেই পূজার ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যাপারটা হয়তো বুড়োরাজের ধর্মরাজ হতে বুড়ো শিবের রূপান্তরের পথে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য দেবতা ধর্মঠাকুর যে শিবঠাকুরের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মিশে গিয়েছেন তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বুড়োরাজ শিব। ধর্মরাজের রাজ ও বুড়োশিবের বুড়ো এই দুই মিলে বুড়োরাজ হয়েছেন বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানে বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োরাজের পূজা ও গাজন হয়—চৈত্র সংক্রান্তিতে নয়। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন হয়। তাহলে বুড়োরাজ কি ধর্মরাজ? না, তিনি অনাদি লিঙ্গ শিব।

এ ব্যাপারে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বুড়োরাজকে পূজায় যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তার মাঝখানে থাকে একটি দাগ কাটা অর্থাৎ নৈবেদ্যের অর্ধেক ভাগ ধর্মঠাকুরের ও অর্ধেক ভাগ শিবঠাকুরের। একই পাত্রে নৈবেদ্য গ্রহণ করছেন শিব ও ধর্মরাজ, কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা বা দীনতা নেই। শিবের সম্মুখে বলিদান দেওয়া হয় না কিন্তু এখানে একপাশে হাড়িয়ারা শূকর বলি দেয়, মুসলমানেরা পাঁঠা মানত করে—কোন বাধা নেই। এমন সংস্কারমুক্ত ধর্মীয় উদারতার প্রতীক হয়ে বুড়োরাজ বাংলার নিজস্ব লোকধর্মের পটভূমিকায় শিবের সত্যরূপই যেন প্রকাশ করেছেন।

বেগুনিয়া মন্দির, বরাকর

বরাকর নদীর সীমারেখা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের। নদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে বরাকর শহর আসানসোল থেকে বেশী দূর নয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে এই অঞ্চল শৈব ধর্মের এক প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল বলে অনুমিত হয়। মন্দিরগুলিতে শিবলিঙ্গের সঙ্গে দুর্গা ও গণেশের মূর্তি থাকায় বোঝা যায় শিব ও শক্তি উভয়েই পূজিত হতেন এখানে। তবে একটি শিব মন্দির থেকে পঞ্চদশ শতকের হরিশ্চন্দ্র নামে এক শৈব রাজার শিলালিপি পাওয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর রাণী হরিপ্রিয়া ছিলেন শিবের উপাসক। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে এই অঞ্চল শৈব প্রধান ছিল তার প্রমাণ মেলে। তাহলে মন্দিরগুলি অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে তৈরী হলে তখন সেখানে কোন দেবতা ছিলেন? এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, বরাকরে অনেক প্রস্তর নির্মিত জৈন দেবতাদের মূর্তি পাওয়া গেছে, তাই মনে করা অসঙ্গত নয় যে, পাল যুগে বরাকর অঞ্চল সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের

কেন্দ্র ছিল। তারপর শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

তবে এ ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও এখানে মন্দিরে শিবের প্রতিষ্ঠিত থাকা বিচিত্র নয়। কারণ পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও অন্য ধর্মের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন না।

বরাকর নদীর বামতীরে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরগুলি—দূর থেকে মনোরম দেখায়। এগুলি প্রস্তর নির্মিত রেখ দেউল। মন্দিরের শিখরের ক্রমসূক্ষ্মায়মান শুণ্ডাকার গড়ন অনেকটা বেগুনের মত, তাই মন্দিরগুলিকে বেগুনিয়া মন্দিরও বলা হয়। মন্দিরগুলি একটি প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে—তার মধ্যে চতুর্থ মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং অষ্টম শতাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। চারটি মন্দিরে গর্ভগৃহেই অনাদিলিঙ্গ শিব বিরাজ করছেন ও পূজিত হচ্ছেন। তাছাড়া মন্দিরে বৃষ (নন্দী), সিদ্ধিদাতা গণেশ ও জগজ্জননী দুর্গার মূর্তিও রয়েছে।

মন্দিরগুলি ঈষৎ বক্ররেখায় শিখরাকৃতি হয়ে ঊর্ধ্বে উঠেছে—শীর্ষে রয়েছে আমলক ও চূড়া। কিন্তু উড়িষ্যার আমলকের অঙ্গের ধারের মত কনকেভস্ বহির্বর্তুলাকার নয় কিন্তু সুরাটের মত কনভেকস্ অন্তর্বর্তুলাকার তাদের আমলকের সূক্ষ্মাগ্রধারগুলি। এটি বাংলারও শিল্প-বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ বেগুনিয়া মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সৌন্দর্য-মণ্ডিত। এটিকে ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দির পরশুরামেশ্বরের তুল্য বলা যায়। বরাকরের এই মন্দিরগুলি এবং সুন্দরবনের জটার দেউল পশ্চিমবাংলার প্রাচীনতম রেখ দেউলের নিদর্শন।

গোপেশ্বর, বাঘনা পাড়া

ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে ৪৬ কিলোমিটার দূরে বাঘনা পাড়া অবস্থিত। এ অঞ্চল একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট, কিন্তু পূর্বকালে শৈব প্রধান অঞ্চল ছিল। এখানে গোপেশ্বর নামে প্রাচীন এক শিব লিঙ্গের খুব প্রসিদ্ধি আছে। শিবরাত্রির দিন এঁর মন্দির প্রাঙ্গণে বহু ভক্তের সমাগম হয়।

বক্রেশ্বর

বীরভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ শহর দুবরাজপুর। এই স্থানে বহু প্রাচীন শিব মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। দুবরাজপুরের নৈসর্গিক

শোভা অপূর্ব। এ অঞ্চলের বেলে পাথর প্রসিদ্ধ এবং এই পাথর দিয়েই দেবালয়গুলি নির্মিত। দুবরাজপুর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ বক্রেশ্বর অবস্থিত। বক্রেশ্বর শৈবতীর্থও বটে আবার একে শক্তিপীঠও বলা যায়। এ স্থান মহাপীঠ—এখানে সতীর ভ্রূমধ্যভাগ পড়েছিল বলে প্রবাদ। দেবীর নাম মহিষমর্দিনী ও ভৈরব হলেন বক্রেশ্বর বা বক্রনাথ। অতি জাগ্রত দেবতা ইনি। মহাশ্মশানের উপর মহাপীঠ অবস্থিত—এস্থান তন্ত্রসাধনারও পীঠভূমি। বিখ্যাত তন্ত্রসাধক অঘোরী বাবা বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানে তন্ত্রসাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। এখানে সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। দেবী মন্দির প্রাঙ্গণে যে উষ্ণকুণ্ডটি রয়েছে তার নাম শ্বেত সরোবর। এর পবিত্র জলে স্নান করে একটি গহ্বরের মধ্যে বক্রনাথ মহাদেবকে দর্শন করতে হয়।

বক্রেশ্বর তীর্থ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তা হল, পুরাকালে ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করতে ও সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে বিষ্ণু নৃসিংহ অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে বিদীর্ণ করে বধ করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে ভগবান নৃসিংহদেবের নখরে অসহনীয় জ্বালা অনুভূত হতে থাকে। দেব-সমাজে এই কথা জানাজানি হ'লে মহামুনি অষ্টাবক্র সেই জ্বালা নিজ শরীরে গ্রহণ করেন। অষ্টাবক্র মুনিকে নিদারুণ জ্বালায় কষ্ট ভোগ করতে দেখে নৃসিংহদেব তাঁকে বললেন যে, বক্রেশ্বর গিয়ে বক্রনাথ মহাদেবকে স্পর্শ করলেই তাঁর জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হবে। তখন মুনিবর বক্রেশ্বরে উপনীত হয়ে গহ্বর মধ্যে নেমে বক্রনাথকে স্পর্শ করে উপবিষ্ট হলে গুহামধ্যে সর্ব তীর্থবারি এসে তাঁকে অভিষিক্ত করে ও তিনি জ্বালামুক্ত হন।

শ্বেত সরোবর ছাড়া আর যে ৭টি কুণ্ড আছে সেগুলির নাম অগ্নিকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, সৌভাগ্য কুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, জীবনকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড ও খরকুণ্ড। প্রত্যেক কুণ্ড সম্পর্কে প্রচলিত আছে অত্যাশ্চর্য এক এক কাহিনী। সূর্যকুণ্ড সম্পর্কে কথিত আছে যে, একদা দেবর্ষি নারদ বিন্ধ্যপর্বতের নিকট গিয়ে সুমেরু পর্বতের উচ্চতার প্রশংসা করায় বিন্ধ্য অপমানিত বোধ করে স্ফীত হয়ে এতখানি উচ্চে তাঁর মস্তক উত্তোলন করলেন যে, সূর্যদেব পৃথিবীতে আলো ও তাপ দিতে অপারগ হলেন। তখন বিপন্ন সূর্যদেব বক্রেশ্বরে এসে সূর্যকুণ্ডের ধারে বক্রনাথের শরণাপন্ন হয়ে তপস্যা

নিরত হলেন। শিব তুষ্ট হয়ে বিন্ধ্যকে মস্তক সঙ্কুচিত ও অবনমন করতে বাধ্য করলেন।

জীবন কুণ্ডের কাহিনী হল যে, পূর্বকালে সর্ব নামে এক বৃদ্ধ চারুমতী নামে তার স্ত্রীকে নিয়ে ধর্মচর্চার জন্যে সংসার ত্যাগ করে বনে গমন করলে একদিন এক ভীষণাকায় শার্দূল সর্বকে হত্যা করে। চারুমতী স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য শিবের আরাধনা করতে লাগলেন। দুশ্চর ছিল সেই ভক্তিমতীর তপস্যা। তখন মহাদেব প্রীত হয়ে তাঁকে তাঁর স্বামীর দেহের হাড়গুলি একত্র করে বক্রেশ্বরে গিয়ে জীবন কুণ্ডের জলে ধৌত করতে বললেন। শিব-নির্দেশমত চারুমতী ঐরূপ করা মাত্র তাঁর মৃত পতি শরীর ও জীবন পেয়ে চারুমতীর সঙ্গে মিলিত হলেন।

ভৈরবকুণ্ড সম্পর্কে প্রবাদ যে, পূর্বে ব্রহ্মার পঞ্চমুখ ছিল, সেজন্য তিনি আপনাকে শিবের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতেন। এর জন্য শিব একবার বিরক্ত বোধ করে রুষ্ট হয়ে নিজ মস্তক হতে জটার এক টুকরা ছিঁড়ে ভূমিতে ফেললে তক্ষুণি জটা থেকে ভয়ঙ্কর বটুক ভৈরব বিনির্গত হয়ে করজোড়ে শিব-আজ্ঞা প্রার্থনা করলেন। শিব তাঁকে ব্রহ্মার প্রধান মুখটি কেটে ফেলতে আদেশ করলেন। বটুক ভৈরব অবিলম্বে শিবের আজ্ঞা পালন করলেন কিন্তু ব্রহ্মারকর্তিত মুখ আটকে থাকল তাঁর হাতে। ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটনে গিয়েও তিনি হস্তে লিপ্ত মুণ্ডটি হাত থেকে বিচ্যুত করতে পারলেন না। অবশেষে বারাণসীধাম গেলে মুণ্ডটি হাত থেকে পড়ে গেল কিন্তু বটুক ভৈরবের অঙ্গুলের ক্ষতে কষ্ট হতে লাগল। নানাস্থান ঘুরে ফিরে শেষে শিব-নির্দেশে বক্রেশ্বরে এসে এই কুণ্ডে স্নান করে বটুক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন। সেই দিন থেকে কুণ্ডটি ভৈরব কুণ্ড নামে পরিচিত।

উষ্ণকুণ্ডগুলিতে স্নান করলে নানা দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হয়—এদের জলের এমনই মাহাত্ম্য। উপরের কাহিনীগুলির মধ্যে দিয়ে এই সত্যেরই ইঙ্গিত মেলে। তাছাড়া আমাদের ধারণা যে, শিব ভিষক শ্রেষ্ঠ—তিনি সর্বরোগ হর। বক্রনাথ লিঙ্গ সেরূপেই যুগে যুগে মানুষের দুঃখ দূর করে চলেছেন তাকে রোগ মুক্তি দান করে, তা দেহজাত রোগই হোক অথবা ভব রোগই হোক।

শিবরাত্রির সময় বক্রেশ্বরে বক্রনাথের পূজা ধূমধামের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। বহুলোক উৎসবে জমায়েত হয়। শিবরাত্রির মেলায় লোক-

শিল্পের পরিচায়ক কিছু কিছু দ্রব্যও দেখতে পাওয়া যায়।

দুবরাজপুর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে ফুলবেরা গ্রামে দন্তিন দীঘি নামক এক সুবৃহৎ পুষ্করিণীর তীরে সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডেশ্বরীর মন্দির দাঁড়িয়ে। এটি একটি পীঠস্থান এবং সতীর দন্ত এখানে পড়েছিল। প্রবাদ, দিঘীটি প্রতিষ্ঠিত করেন রাজা খগাদিত্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খগেশ্বর শিবলিঙ্গ পাশ্ববর্তী গ্রাম খাগড়ায় পতিষ্ঠিত আছে। খগেশ্বরের মন্দির বৌদ্ধরীতির মন্দির। অনেকটা বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মত কিন্তু এ'টিমাত্র চূড়াবিশিষ্ট। সিউড়ির ৯ কিলোমিটার পশ্চিমে ভাণ্ডীর বনে বিভাণ্ডক ঋষির পূজিত ভাণ্ডেশ্বর শিবের মন্দিরেও বৌদ্ধ রীতি ছাপ আছে।

শ্রীতারকনাথ, তারকেশ্বর

"জয় বাবা তারকনাথ" "ভোলে বাবা পার করো," "তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে"—ভক্তরা কণ্ঠে এই ধ্বনি নিয়ে দূর-দূরান্তর থেকে হেঁটে আসে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে ভক্তের দল। পরণে নব বস্ত্র (সন্ন্যাস যারা পালন করে তারা গৈরিক বস্ত্র পরে), আতুর পা, কাঁধে বাঁক তাতে ঝোলে দুটি মুখ ঢাকা মৃন্ময় ঘট গঙ্গাজলে ভরা। মনের কামনা নিয়ে হৃদয়ডালা ভক্তি পুষ্পে আর শ্রদ্ধার বিল্বপত্রে ভরে অনুরাগের সিঁদুর ও চন্দনে তা চর্চিত করে তপস্যাক্লিষ্ট ভক্তরা ছুটে আসে সবাই। তারকেশ্বর মন্দিরে শিবদর্শনে শিব অর্চনে এই বিশ্বাস যে, ভোলা বাবা দুঃখ তাপ থেকে পার করবেন। কেউ 'হত্যা' দিয়ে পড়ে থাকে প্রাণের আকুতি ঢেলে, "দয়া কর দয়াময় আমার কষ্ট দূর কর ঠাকুর" এই বলে আবার কেউ বা দণ্ডী কেটে আসে। তারকেশ্বর মঙ্গলময় ঈশ্বররূপে যুগ-যুগান্তর ধরে সেখানে অবস্থান করে আতুরের যন্ত্রণা দূর করছেন, ভক্তদের দেহরোগ ও ভবরোগ আরোগ্য করছেন। অতিশয় জাগ্রত এই অনাদি লিঙ্গের মাহাত্ম্যের তুলনা নেই। তাঁর কাছে প্রাণের ভক্তি অর্ঘ নিয়ে এসে দাঁড়ালেই তিনি তা গ্রহণ করেন—মূর্তিমান করুণা হয়ে দেখা দেন তার জীবনে। ভক্তি ও বিশ্বাস আনন্দময় ভগবানকে প্রাণের মন্দিরে প্রাণময় করে তোলে।

পশ্চিম বাংলার শৈবতীর্থগুলির মধ্যে তারকেশ্বর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রধান। জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীরও পূর্বে তারকেশ্বর এক জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি ছিল—নল ও খাগড়ায় পরিপূর্ণ। হাওড়া রেল

স্টেশন থেকে তারকেশ্বরের দূরত্ব প্রায় ৫৮ কিলোমিটার। শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত শাখা রেলপথ বিস্তৃত আছে। অনাদি লিঙ্গ শ্রীতারকনাথের মন্দির ও মঠ রেল স্টেশনের কাছেই। শিবলিঙ্গকে তারকনাথ বা তারকেশ্বর এই দুই নামেই ডাকা হয়। মন্দিরটি একটি সুদৃশ্য বৃহদাকার বাংলারীতির আটচালা মন্দির যার বহির্ভাগে সুন্দর অলঙ্করণ আছে। মন্দিরের পশ্চিমে পূতঃ সলিলে পূর্ণ শিবগঙ্গা যাকে দুধ পুকুরও বলা হয়। দুধ পুকুরের মাহাত্ম্য অসীম। তারকেশ্বরে বছরে তিনটি বড় আকারের মেলা বসে—শ্রাবণ মাসে মাড়োয়ারী মেলা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসে গাজনের মেলায় বহুলোক সমাগম হয়ে থাকে। তারকেশ্বরের গাজনোৎসবই মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় গাজনোৎসব।

যে স্থানে বর্তমান তারকনাথের মন্দিরটি অবস্থিত পূর্বকালে তা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং তার চতুর্দিকের নিম্নভূমি নল ও খাগড়ায় ভর্তি ছিল। উঁচু ভূমিভাগকে লোকে বলতো সিংহ দ্বীপ। এই দ্বীপের মধ্যে তারকনাথ অনাদি লিঙ্গরূপে বিরাজিত ছিলেন।

তারকেশ্বরের প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না—কল্পনা কিম্বদন্তী মিশিয়ে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, এখানে বন জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন রামনগরের রাজপুত বংশীয় ভূস্বামী বরাহমল্ল বা ভারামল্ল। রামনগর তারকেশ্বর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে কানা নদীর তীরে এক জনপদ। ভারমল্ল ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুদাস জৌনপুর জেলার কোন এক গ্রাম থেকে এখানে এসে দেবতার কৃপায় ও মুসলমান নবাবের অনুগ্রহে জায়গীর লাভ করেন।

তারকনাথের প্রকাশ সম্বন্ধে কথিত আছে যে, মুকুন্দ ঘোষ নামে এক শিবভক্ত বর্ধিষ্ণু গোপ প্রথম এই শিবলিঙ্গ জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কার করেন। এ সম্পর্কে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। মুকুন্দের অনেকগুলি গাভী ছিল। গাভীগুলির মধ্যে কপিলা নামে একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রচুর দুধ দিত। কিন্তু একদিন সহসা মুকুন্দ লক্ষ্য করলেন যে, কপিলার দুধ কমে যাচ্ছে সে আর তেমন দুধ দিচ্ছে না। মুকুন্দ ঘোষ এর কারণ অন্বেষণের জন্য তৎপর হলেন। পরদিন অন্য গাভীদের সঙ্গে কপিলাও বনের ধারে মাঠে চরতে গেলে তিনি তাকে অনুসরণ করলেন। এক সময় মুকুন্দ দেখলেন যে, মাঠে ঘাস খেতে খেতে কপিলা হঠাৎ

জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। তিনি গাভীটিকে অনুসরণ করে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে বিস্ময়ে ও আনন্দে তাঁর হৃদয় ভাবাবেগে কম্পিত হয়ে উঠল মনেও জাগলো অদম্য কৌতূহল। মুকুন্দ দেখলেন একটি চমৎকার লিঙ্গাকৃতি কালো পাথর ভূগর্ভে প্রোথিত রয়েছে, পাথরের উপরভাগের মধ্যস্থলে একটি গর্ত, কপিলা পাথরটির গর্তের উপর তাঁর চারটি বাঁট স্থাপন করে দাঁড়িয়ে দুধ ঢালছে—দুধ বাঁট থেকে আপনিই ঝরে পড়ছে। কপিলাকে কিছু না বলে মুকুন্দ ঘোষ জঙ্গল থেকে বের হয়ে এলেন এবং ঐ শিলাখণ্ডটির সম্পর্কে প্রান্তরে ক্রীড়ারত রাখাল বালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। জানা গেল যে, শিলাখণ্ডটি এখানে বহুদিন ধরে পোঁতা আছে আর চাষীরা ধান তোলার পর ক্ষেতে যে ধান পড়ে থাকে রাখালরা সেই ধান সংগ্রহ করে ঐ পাথরের মাথায় ধান পিষে খায়। ঐ কারণে শিলাখণ্ডের উপর দিকে ঘর্ষণের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গর্ত হয়ে গেছে।

সব কথা শুনে মুকুন্দ ঘরে ফিরে গেলেন। সেদিন গভীর রাত্রে তারকনাথ স্বপ্নযোগে মুকুন্দকে নিজের পরিচয় দিলেন ও তাঁকে বললেন সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাঁর কথা প্রচার করতে। মুকুন্দ ঘোষ তারপর থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তারকেশ্বরের সেবায় প্রাণ ঢেলে দিলেন। এই শিবের কথাও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মকুন্দ ঘোষ হতেই তারকনাথের প্রথম প্রকাশ ও তিনিই তাঁর প্রথম সেবক বা পূজক।

মুকুন্দ রাজা ভারমল্লকে তারকনাথের কথা জানালে রাজা শিবলিঙ্গটি এসে দেখেন এবং দেখে এত আকৃষ্ট হন যে, আপন রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে সেই লিঙ্গ মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করতে অভিলাষ করেন। কিন্তু প্রচুর খোঁড়া-খুঁড়ি করেও মূর্তিকে তোলা গেল না। রাত্রে তারকনাথ ভারমল্লকে স্বপ্নযোগে জানালেন যে, তাঁকে এখান থেকে তোলা যাবে না এবং সে চেষ্টা না করে রাজা যেন এখানে মন্দির নির্মাণ করে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজা ভারমল্ল এখানকার জঙ্গল পরিষ্কার করে তারকেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন। তারকেশ্বরের নিকটবর্তী ভারামলপুর গ্রাম আজও এই নৃপতির স্মৃতি বহন করছে।

এই কিম্বদন্তীর মধ্যে একটি বস্তু লক্ষ্যনীয় তা হল গোপ মুকুন্দ ঘোষ দ্বারা তারকেশ্বরের আবিষ্কার ও পূজা। মুকুন্দই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে তারকনাথের পূজা করার প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। পরে মঠ, মোহান্ত

প্রভৃতি সৃষ্টি হলে ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত হন। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলে গোপদের শিব-সাধনা ও শৈবধর্ম প্রচারে এক বিশেষ ভূমিকা ছিল ঘটনাটি যেন সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য শৈবতীর্থ হতে তারকেশ্বরের পার্থক্য রয়েছে এক বিশেষ ক্ষেত্রে।

তারকেশ্বর দশনামী শৈব সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত এখানকার প্রধান মঠ যা মূলতঃ উত্তর ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে—বাংলার শৈব সংস্কৃতির নয়। তারকেশ্বরে রয়েছে মন্দির ও মঠ। মঠের প্রধান পরিচালক হলেন মোহান্ত। এই মঠ ও মোহান্ত সংস্কৃতি বাঙ্গালীর নিজস্ব সংস্কৃতি নয়—বাইরে থেকে অবাঙ্গালীরা এনেছেন। তবু তারকেশ্বরে বাংলার শৈব সংস্কৃতি প্রগাঢ় প্রাধান্য পেয়েছে ও আজও পাচ্ছে তার কারণ এটাই মনে হয় যে, বাংলার লোকধর্মের প্রভাবকে মঠ-সংস্কৃতি মানতে বাধ্য হয়েছে। দশনামী শৈব সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল আদিগুরু শঙ্করাচার্যের চারজন শিষ্যের দশজন শিষ্য হতে—এঁরা দলে দলে ভারতবর্ষের সর্বত্র শৈবধর্ম প্রচার করেছেন ও মঠ স্থাপন করেছেন।

তারকেশ্বরে দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের মঠ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেও যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পরবর্তীকালে তারকেশ্বরের আবির্ভাব ও মঠের সৃষ্টি এই দুই ঘটনাকে যেন মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা নয়, সম্ভবতঃ তারকনাথ শিবের অধিষ্ঠান মঠ সৃষ্টির পূর্বেই এখানে হয়েছিল। পরমেশ্বর শিবের ইচ্ছাতেই তারকেশ্বর তীর্থের সৃষ্টি যা বাংলার লোকধর্মে মূর্ত হয়েছে, এর সঙ্গে মঠ ও মোহান্তের সংস্কৃতিগত কোন সম্পর্ক নেই।

রাঢ় অঞ্চল বরাবরই শৈব প্রধান ছিল। লোকায়ত শৈবধর্ম ধর্ম পূজা ও শিব পূজার মিলনে সৃষ্ট। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন রাঢ়ের অন্যতম লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর শিব সম্পর্কিত কিংবদন্তী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিবের আবির্ভাবের সঙ্গে গোপদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দেখা যায়, তারকেশ্বরে শিবের আবির্ভাবেও গোপ জাতির সঙ্গে জড়িত। গোপ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আচারেরও বিস্ময়কর প্রাধান্য আছে এখানের অনুষ্ঠানাদিতে। তারকেশ্বরের গাজনোৎসবই পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বড় গাজন-উৎসব। তারকেশ্বরের গোপ-কাহিনী, গাজন-উৎসব ও বিভিন্ন লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠান সঙ্গে পশ্চিমবাংলা

ধর্ম-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

মুকুন্দ ঘোষ ভৈরবনাথ নামে তারকেশ্বর মন্দিরের পূর্বদিকে সমাধিস্থ আছেন। গোপদের আনুষ্ঠানিক ভূমিকার গুরুত্ব অনেক প্রথার মধ্যে দেখা যায়। তারকেশ্বর গাজনের মূল পাঁচজন সন্ন্যাসীর মধ্যে চারজন গোপ। এই প্রথা এতদিন ধরে অকারণে প্রচলিত নেই। আসলে লোকায়ত ঐতিহ্যের কাছে হার মেনেই মনে হয় মঠ, মোহান্ত বা ব্রাহ্মণ পূজারীরা ইচ্ছা থাকলেও এই প্রথার পরিবর্তন করতে পারেন নি। তারকেশ্বর মন্দিরের মধ্যে তারকনাথের পাশে বাসুদেব রয়েছেন। তাছাড়া মন্দিরে আছে দুর্গা, অন্নপূর্ণা ও কালীর পট।

এ সকল শক্তিদেবীর পূজা বৈদিক সন্ন্যাসীরা করেন না। কিন্তু তারকেশ্বরে তা বহুকাল ধরে চলে আসছে। যেখানে শিব আছেন সেখানে শক্তি থাকবেনই। কিন্তু এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, মঠ মোহন্তের পূর্বেও বাংলার শৈবধারা এখানে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

কিম্বদন্তী অনুযায়ী দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী মায়াগিরি বহু বছর আগে শৈবধর্ম প্রচারে এখানে এসেছিলেন। তিনি রাজা ভারমল্লকে প্রভাবিত করেন। রাজা তাঁকে গুরু পদে বরণ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তারকেশ্বরের নামে অর্পণ করেন। এইভাবে মায়াগিরি তারকেশ্বরে মঠ সৃষ্টি করেছিলেন।

মুকুন্দ ঘোষ তারকেশ্বরের আবির্ভাবের সঙ্গে জড়িত—তিনিই তারকনাথের প্রথম পুরোহিত আবার মন্দির মঠের পরিচালনায় এলে মুকুন্দই মঠের প্রথম মোহান্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁকে মোহান্ত করা হয়েছিল। পূজার ভার মনে হয় মায়াগিরি ও তাঁর সম্প্রদায়ের শৈব বা ব্রাহ্মণকে দেবার মনস্থ করেন এবং রাজা ভারমল্ল তখন চতুর্ভুজ গাঙ্গুলীকে দেব-বিগ্রহ পূজায় নিযুক্ত করেন। এ সম্পর্কেও প্রচলিত আছে এক প্রবাদ যে, রাজা ভারমল্লকে মন্দির প্রতিষ্ঠা হলে মন্দিরের রক্ষণা-বেক্ষণ ও পূজার জন্য স্বপ্নে তারকনাথ আদেশ দিলেন যে, তাঁর নিত্য পূজা ও সেবার জন্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করতে হবে। তারকনাথ আরও জানান যে, শিংটি নিবাসী চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী হলেন সেই পুরোহিত। ঐ ব্রাহ্মণও ঠিক সেই ধরনের স্বপ্ন পেলেন শিবের কাছ থেকে। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন বলে প্রবাদ। শিবাদেশে রাজা তাঁকে তারকনাথের সেবাইত হিসাবে নিযুক্ত করলেন। শিবের বরে দুধপুকুরে স্নান করলে চতুর্ভুজ তাঁর চোখের আলো ফিরে পেলেন এবং শিব-

সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

এইভাবে ভক্তের দুঃখ কষ্ট দূর করে তাদের কল্যাণে বাবা তারকনাথ এখানে আবির্ভূত হয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষের দেহ রোগ ও ভব রোগ দূর করে তাঁর কাছে টেনে নিচ্ছেন।

মোহান্ত সম্পর্কে অনেকের অভিমত যে, ভারমল্ল প্রথম মোহান্ত হন, কারো মতে মায়াগিরিই প্রথম মোহান্ত। তবে হুগলী জেলার ইতিহাসে পাওয়া যায় মুকুন্দ ঘোষই প্রথম মোহান্ত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মায়াগিরি মোহান্ত হন।

রাজা ভারমল্লের পর বর্ধমানের মহারাজও স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এখানে এসে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন ও দেব সেবার জন্য বহু ভূ-সম্পত্তি দান করেন। তারকনাথের পুরোহিতকেও তাঁর শিব কৃপায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার বৃত্তান্তে মুগ্ধ হয়ে অনেক জমি দান করেছিলেন। এইভাবে তারকনাথের প্রচুর ভূ-সম্পত্তি হয়।

তারকেশ্বর মঠের মোহান্তরা মন্দির ও মঠের বিস্তৃতির জন্য অনেক উন্নতিমূলক কাজ করলেও এই পুণ্যক্ষেত্রের পরিমণ্ডল বেশ কয়েকজন মোহান্তের ব্যাভিচারে দুষিতও হয়েছিল। সে ইতিহাস লেখার স্থান এ-গ্রন্থ নয়। পরে অনাচার দূর হয়েছে, কিন্তু ছোট রকমের দুর্নীতি এখানে যে নিত্য লেগে নেই তা নয়। মানুষের চোখ এড়িয়ে কলুষকর্মও হয়তোবা সঙ্ঘটিত হয়। কিন্তু এই আদর্শ তীর্থে ভালমন্দ সব কিছু ছাপিয়ে পরম কল্যাণময় শিব স্বীয় বিভায় ভাস্বর হয়ে আছেন। মহিমময় তিনি মহেশ্বর। তিনিই আমাদের গতি আমাদের নিয়তি। প্রতিনিয়ত কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে বাবা তারকনাথ ভক্তজনের মঙ্গল করে তার প্রাণে আসন পাতছেন। তিনি বিশ্বাস ও ভক্তির নৈবেদ্য নিয়ে ভক্তের প্রাণে আসছেন। বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা নেই, এর উদ্ভাসিত স্বচ্ছ রূপ হৃদয়ের মণিকোঠায়। এইসব অলৌকিক ঘটনা তারকনাথের জাগ্রত অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। ঘটনাগুলি শুনলে দেবতার মাহাত্ম্যের জাজ্বল্য প্রমাণ পেয়ে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। বাস্তবিক বাবা তারকনাথের মাহাত্ম্যের তুলনা নেই। এ সম্পর্কে আরও জানা যাবে 'বৃহৎ তারকেশ্বর মাহাত্ম্য' গ্রন্থে।

ভদ্রেশ্বর, হুগলী

কলকাতা থেকে ২৯ কিলোমিটার দূরে হুগলী জেলার প্রাচীন শহর ভদ্রেশ্বর। এখানে প্রাচীন শিব ভদ্রেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁর নাম অনুসারেই গ্রামের নাম ভদ্রেশ্বর হয়েছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, কাশীর বিশ্বনাথ ও দেওঘরের বৈদ্যনাথের মত ভদ্রেশ্বর স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গ। শিবরাত্রি, বারুণী ও পৌষ সংক্রান্তির সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বিপ্রদাসের 'মনসা মঙ্গলে' ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ আছে।

ষণ্ডেশ্বরজীউ, চুঁচুড়া

চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বরজীউ নামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় লোকে এঁকে জাগ্রত দেবতা হিসাবে মান্য করে। চুঁচুড়ার অদূরে হুগলীতে 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' এই প্রবাদের পুরুষ গৌরী সেনের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ।

মহানাদের জটেশ্বরনাথ

তারকেশ্বর যাবার পথে পড়ে মহানাদ। অতি প্রাচীন জনপদ। অনেকের ধারণা মহানাদ একসময় পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ছিল। এখানে হিন্দু আমলের পুরাতন কয়েকটি মন্দির, কয়েকটি প্রাচীন দিঘী ও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। গড়পাড়া বা গড়ের বাগান নামক স্থানে রাজা চন্দ্রকেতুর গড় ছিল বলে প্রবাদ। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এখনও গড়ের কিছু চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

মহানাদের জটেশ্বরনাথের পুরাতন মন্দির দেখতে খুবই সুন্দর। প্রবাদ, রাজা চন্দ্রকেতু এই মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শিবরাত্রির সময় এখানে একটি বড় মেলা হয় এবং তা 'মানাদের জাত' নামে বিখ্যাত। মন্দিরের সামনে জাততলায় কতকগুলি সমাধি স্তম্ভ আছে, এগুলি প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ শ্রমণদের সমাধি বলে অনুমিত হয়। একটি সমাধি 'জীবন্ত' সমাধি বলে পরিচিত। লোকের বিশ্বাস এর মধ্যে একজন মহাযোগী নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন আছেন। মনে হয় বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা এই অঞ্চল এক সময় প্রভাবিত ছিল। মহানাদের বশিষ্ঠ গঙ্গা, জামাই জাঙ্গাল ও জীয়ৎ কুণ্ডু প্রসিদ্ধ। জীয়ৎ কুণ্ডু দেবখ্যাত বলে লোকের বিশ্বাস। মুসলমান যুগে এটি অপবিত্র হয় তার আগে

এক জল সিঞ্চনে মৃত দেহের জীবন সঞ্চার হত। রাজা চন্দ্রকেতুর জামাতা ত্রিপুরার রাজপুত্রের অনুরোধে 'জামাই জাঙ্গাল' নামক পথ তৈরী করেন বলে প্রবাদ।

ত্রিবেণীর দেউল শিবালয়'

হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে অষ্টকোণচূড় সপ্ত দেউল শিবালয়গুলি ১৭৬৩ শকাব্দের ২০শে মাঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিবলিঙ্গগুলির নাম এই রকম,—পশ্চিমে শশিশেখর, বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর ও চণ্ডীশ্বর। পূর্বে গঙ্গাধর ও যোগেশ্বর। উত্তরদিকের শিবলিঙ্গের মন্দিরে লিপি নেই। এছাড়া আরও দুটি আটচালা শিব মন্দির লিপিহীন অবস্থায় আছে।

বেণীমাধব, ত্রিবেণী

বেণীমাধব নামটি শিবের স্বাভাবিক নাম নয়। এই নামের শিব-লিঙ্গের মধ্য দিয়ে শিব ও কৃষ্ণের একাত্মতা যেন প্রকটিত করা হচ্ছে। এটি একটি অলৌকিক শিবলিঙ্গ বলে জন-বিশ্বাস। কবে যে এঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার কোন ইতিহাস নেই। প্রবাদ, মনসা-মঙ্গল কাব্যের নায়ক শিবভক্ত চাঁদ সদাগর বেণীমাধবের আরাধনা করতেন। এখানকার জনসাধারণ এই দেবতাকে খুব জাগ্রত বলে মানে। স্থানীয় লোকে বিশ্বাস করে বেণীমাধব ভক্তের ব্যাকুল ডাকে সাড়া দেন। আজও যেকোন আপদ-বিপদে, যেকোন সমস্যার সুরাহার জন্য তারা এই মন্দিরে এসে দেবতার কাছে মানত করে।

বেণীমাধব শিবলিঙ্গের পিনাক নেই। এঁর মধ্যস্থলে বাসুদেব অর্থাৎ নারায়ণ বিরাজমান। তাই বেণীমাধব নাম হয়েছে। এঁর পূজা পদ্ধতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। শিবলিঙ্গের মাথায় বিল্বপত্র ও বুকে যেখানে নারায়ণ রয়েছেন সেখানে তুলসী পত্র দিয়ে পূজা করা হয়। এলাহবাদেও বেণীমাধব শিব আছেন তবে সেখানের বেণীমাধব যুক্তবেণী, ত্রিবেণীতে মুক্তবেণী।

বেণীমাধবের আবির্ভাব সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বহুকাল আগে এই শিবলিঙ্গ লোকচক্ষুর অন্তরালে গঙ্গাতীরে জঙ্গলের মধ্যে ছিলেন। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে ত্রিবেণীর বৈকুণ্ঠপুর নিবাসী অনুকূল চন্দ্র পাঠকের কোন এক পূর্ব পুরুষকে বেণীমাধব স্বপ্নযোগে তাঁর অবস্থানের কথা জানান ও নিত্য তাঁর পূজা করতে বলেন। তখন

গঙ্গাতীরে তিনি শিবলিঙ্গটি আবিষ্কার করেন। ও একটি তালপাতার মন্দির তৈরী করে দেবতাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। তারপর অনেকদিন গত হলে ত্রিবেণী-সঙ্গমে তীর্থ যাত্রায় এসে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব ইঁটের মন্দির গড়ে দেন। বর্তমান মন্দিরটি তাঁরই নির্মিত। সেকালে মন্দিরের পাশেই গঙ্গা বইত, এখন কিছুটা সরে গেছে। মুকুন্দদেব তীর্থ যাত্রীদের জন্য ঘাট বসিয়ে বেণী-মাধবের নামে উৎসর্গ করেন। প্রবাদ স্বয়ং মহেশ্বরের আদেশে এখানে বুদ্ধ পূর্ণিমায় অন্নকূট উৎসব হয়। এই সময় এখানে অগণিত ভক্তের সমাগম হয়। এ ছাড়াও একদিকে যেমন এখানে গাজন, শিবরাত্রি, মকর সংক্রান্তিতে উৎসব পালন করা হয় তেমনই পালন করা হয় জন্মাষ্টমী, রাস, ঝুলন ও রথোৎসব। বেণীমাধব বুঝি ভক্তদের বোঝাতে চান যিনি শিব তিনিই কৃষ্ণ।

ঘণ্টেশ্বর, খানাকুল

আরামবাগ মহকুমায় খানাকুল হাটের কাছে মরা নদী রত্নাকরের তীরে দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টেশ্বর শিবমন্দির। মন্দিরটি উচ্চতায় ৯ মিটার মত হবে—অনেক দিনের পুরানো ঐতিহ্যপূর্ণ শিবদেউল। দারকেশ্বর এখানে রত্নাকর নামে পরিচিত ছিল। ঘণ্টেশ্বর শিবের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। ইনি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বলে লোকের বিশ্বাস। এঁর করুণা লাভের জন্য বহু অসহায় মানুষ এখানে আসে। ভক্তিভরে ধর্ণা দিয়ে ঘণ্টেশ্বরের করুণায় বহু মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করেছেন বলে শোনা যায়।

প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে গাজনের বিরাট মেলা বসে। তীক্ষ্ণ লৌহ কাতান বসানো কাঠের পাটাতনের উপর শুইয়ে উপবাসী সন্ন্যাসীদের স্নান করিয়ে ঘাট থেকে ঘণ্টেশ্বরের মন্দিরে আনা হয়। চারজন ভক্ত নিজেদের ইচ্ছেমত নাচতে নাচতে সন্ন্যাসীকে গাজন তলায় নিয়ে আসে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ধারাল কাতানের উপর থেকেও সন্ন্যাসীর দেহে কোন ক্ষত চিহ্ন দেখা যায় না। এই দৃশ্য দেখে দর্শকের শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। স্থানীয় লোকে ঘণ্টেশ্বরকে জাগ্রত শিব বলে বিশ্বাস করে। গাজনের সময় সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করে এই বলে "ঘণ্টেশ্বরের চরণে সেবা লাগে।". এ ছাড়া হিন্দোলা এই শিবের গাজনের এক আকর্ষনীয় বিষয়।

কামেশ্বরের নেড়াদেউল

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা-কেশপুর পথের নেড়াদেউল গ্রামে একটি দিঘীর ধারে নেড়াদেউল নামে কামেশ্বর শিবের একটি মন্দির আছে। মন্দিরের শীর্ষে আমলক শিলা না থাকায় এর নাম হয়েছে নেড়া-দেউল। কামেশ্বর শিবের লিঙ্গ মূর্তিটি ভেঙ্গে গেছে। এই মন্দিরে জগন্নাথ দেবও অধিষ্ঠান করেন। চন্দ্রকোণার রাজা চন্দ্রকেতু সমগ্র ব্রাহ্মণ ভূমি পরগণা কামেশ্বরের দেবত্র স্বরূপ দান করে ব্রাহ্মণ রাজবংশের আদিপুরুষ কাশ্যপ পালধি বংশীয় উমাপতি দেবের উপর ভার অর্পণ করেন। বাংলা ও উড়িষ্যার সীমায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পথেই বাংলা থেকে পুরীধাম যেতে হত। বাঙ্গালী উড়িষ্যার আড়ম্বর-পূর্ণ দেউলকে একক দেউল রূপে যে অনাড়ম্বর রূপ দিয়েছিল কামেশ্বর মন্দির তার এক দৃষ্টান্ত।

মল্লেশ্বর ও উজ্জনাথ

মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণার দক্ষিণে প্রাচীন হিন্দু রাজাদের দ্বাদশদ্বারী বা বারদুয়ারী নামক গড়ের ভগ্নাবশেষের কাছেই রাজ বংশীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর ও উজ্জনাথ শিব বিদ্যমান রয়েছেন। কথিত আছে যে, কালাপাহাড়ের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্য পুরোহিতগণ মল্লেশ্বরকে পাথর দিয়ে মুড়ে ফেলেন ও উজ্জিনাথকে এক বট বৃক্ষ তলে স্থাপন করেন। মূর্তিমান ধ্বংস কালাপাহাড় শূণ্য মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত করে ফিরে গিয়েছিলেন। মল্লেশ্বরের বর্তমান সুন্দর দেউলটি বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্র নির্মান করেন পুরাতন ধ্বংস প্রাপ্ত মন্দিরের আমূল সংস্কার করে।

১৩ শকাব্দে মল্লরাজগণের দ্বারা বঙ্গোৎকল আদর্শে নির্মিত মল্লেশ্বর মন্দিরে বর্ধমান রাজ তেজচন্দ্রের লিপি ঃ—

> "শাকে ত্রীবহ্নিচন্দ্রে ধনপচন গৃহ সিদ্ধি খাতস্য খাতম্।
> শ্রী (ল) মল্লেশবাসং প্রহরিগণ গৃহং নাট্যযজ্ঞালয়ঞ্চ ॥
> ধর্মজ্ঞোধর্মগেহং নবসদৃশকৃতং সূচ্চ সৌধস্তকার্ষীৎ।
> শ্রীমন্মল্লেশ তুষ্ট নৃপবর সুকৃতী শ্রীযুত স্তেজচন্দ্র ॥"

অর্থাৎ ১৭৫৩ শকে তেজচন্দ্র ধনাগার, সিদ্ধি কুণ্ড, মল্লেশ্বরের মন্দির, প্রহরীদের গৃহ, নাটমন্দির, যজ্ঞশালা, পুরোহিতদের ঘর নির্মাণ করান। মন্দিরটিকে প্রায় নতুন ও অত্যুচ্চ করে তিনি মল্লেশ্বরের তুষ্টি

আশা করলেন।

মল্লেশ্বর আজও প্রস্তরে আবৃত রয়েছেন। এঁর মন্দিরের নিকট একটি বটবৃক্ষতলে উন্মুক্ত আকাশে উজ্জ্বনাথ মহাদেব রয়েছেন। যত-বারই এঁর জন্য মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে আশ্চর্যভাবেই ততবারই হয় বজ্রপাত না হয় ভূমিকম্প এইরূপ কোন না কোন দৈব দুর্ঘটনায় তা ধ্বংস হয়ে গেছে।

এগরা ইটনগরের প্রাচীন শিব

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার পশ্চিমে এগরা থানার ইটনগরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। কথিত যে, উড়িষ্যার শিবভক্ত রাজা গজপতি মুকুন্দদেব শিবের এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি অতিশয় সুন্দর ও একটি 'নাগর' মন্দির। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু লোকের সমাগম হয। শিবমন্দিরের কাছে কৃষ্ণসাগর নামে এক পূতঃ সলিলা জলাশয় আছে।

খড়্গেশ্বর, খড়্গপুর

খড়্গপুর রেল স্টেশনের কাছে ইন্দাগ্রামে খড়্গেশ্বর নামে শিবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। এই মন্দির খড়্গপুর থানার কনাই-কুণ্ডা গ্রামের ধারেন্দার রাজা খড়্গসিংহ তৈরী করান। আবার অন্য মতানুসারে বিষ্ণুপুরের রাজা খড়্গমল্ল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। একটি বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। ঐ প্রান্তরের নাম হিড়িম্বডাঙ্গা। প্রবাদ, বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব এখানে এলে হিড়িম্বরাক্ষসের সঙ্গে ভীমসেনের সংঘর্ষ হয় এবং ভীম হিড়িম্বকে হত্যা করেন। হিড়িম্বর ভগিনী হিড়িম্বা ভীমের রূপে ও বীর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বিবাহ করে। হিড়িম্বর নাম থেকেই "হিড়িম্বডাঙ্গা" নাম হয়েছে। খড়্গেশ্বর এখান-কার প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ।

ঝাড়গ্রামের পাথরের চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ

মেদিনীপুরের অনেক অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য স্থানে এক-মুখ বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ মূর্তি পাওয়া গেছে। ঝাড়গ্রাম থেকে দুটি চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়। এইধরণের মূর্তি গুপ্তযুগেই প্রচলিত ছিল, তবে পালযুগেও বঙ্গে চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্তি পাওয়া গেছে। এই

ধরণের মূর্তি পাওয়ায় মনে করা যেতে পারে যে, প্রাচীনকালে মেদিনী-পুরের ঝাড়গ্রাম, দাতন প্রভৃতি অঞ্চল শৈব প্রভাবিত ছিল। ঝাড়গ্রামেও নিষাদ সংস্কৃতির মূল প্রবাহে শৈবধর্ম স্থান করে নিয়ে ছিল। দাতন অঞ্চল মহারাজা শশাঙ্কের স্মৃতি বিজড়িত স্থান। শশাঙ্ক ছিলেন পরম শৈব। সুতরাং এসব অঞ্চলে তাঁর আমলে শৈবধর্মের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক ছিল।

এক্তেশ্বর, বাঁকুড়া

বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটে প্রাচীন শৈব তীর্থ এক্তেশ্বর। এখানে দেবাদিদেব মহাদেব এক্তেশ্বর রূপে বহুকাল ধরে বিরাজ করছেন। তাঁর নামেই স্থানের নাম। পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে অধিষ্ঠিত দেবতা শিবের নামেই সেই অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে দেখা যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় অঞ্চলটি বহুকাল ধরেই শৈব প্রধান অঞ্চল ছিল।

এক্তেশ্বর সম্বন্ধে কেউ কেউ মনে করেন যে, বেদের দেবতা এক-পাদেশ্বর ক্রমে এক্তেশ্বর হয়েছেন। এই অনুমান কতটা সত্য তা সঠিক বলা না গেলেও মন্দিরটি যে বহুকালের প্রাচীন ও অনেকগুলি সংস্কারের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এক্তেশ্বর সম্পর্কে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একবার সামন্ত-ভূমের রাজার সঙ্গে মল্লভূম বিষ্ণুপুরের রাজার রাজ্যের সীমানা নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধ বাধে। দুই রাজাই ছিলেন শিব উপাসক। স্বয়ং শিব নাকি এই বিরোধের মীমাংসা করেছিলেন। উভয় নৃপতিকেই তিনি স্বপ্নে দর্শন দিয়ে সন্ধি করতে বলেন। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর দুই রাজা সন্ধি স্থাপন করেন। তখন নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে প্রতিষ্ঠিত হন এক্তেশ্বর। তাই জনশ্রুতি যে, দুই রাজ্যের এক্তিয়ারের অভিভাবক তথা ঈশ্বর বলে দেবতার নাম এক্তেশ্বর হয়েছে।

এক্তেশ্বর মন্দিরে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিও আছে। মন্দির অভ্যন্তর গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। শিবলিঙ্গ যেখানে অবস্থিত সেখান থেকে একটি সুরঙ্গ পথ দ্বারকেশ্বর নদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। দ্বারকেশ্বরের জলস্ফীতি ঘটলে এক্তেশ্বর মন্দিরে জল উঠে আসে।

এখানকার শিবের গাজন ও মেলা বহুকালের ঐতিহ্য বহন করে আছে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও এখানে মহাসমারোহে শিবের গাজনোৎসব পালন করা হত ও মেলা বসতো বিরাট আকারে এবং চড়ক

বিভিন্ন রকমের বাণ ফোঁড়া হত—জিব বাণ, কর্ণ বাণ, পিঠ বাণ ইত্যাদি। পিঠ বাণ অবশ্য এখন নিষিদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া আগের কালে গাজনের দিন রাত্রে জ্বলন্ত চিতার মত আগুণ জ্বেলে ভক্তরা "সতীদাহ" উৎসব করতো। সেকালে সতীদাহ একটি পুণ্য প্রথা বলে গণ্য ছিল। বর্তমান সময়ে এখানে আর আগের মত জাঁকজমক করে গাজনোৎসব পালন করা হয় না। এক্তেশ্বর শিবকে এখানকার বহু লোক জাগ্রত বলে মানে।

পশ্চিমবঙ্গে এক্তেশ্বর মন্দিরের মত স্থাপত্য ভঙ্গিমায় বৈশিষ্ট্য যুক্ত মন্দির আর দ্বিতীয় নেই। প্রস্তর নির্মিত বিশাল স্তম্ভের মত মন্দিরটি একটি সুদৃশ্য রেখ দেউল। মন্দিরের গড়ন নিরেট। অনেক পুরাতত্ত্ববিদ অনুমান করেন যে, মন্দিরটি প্রায় ২০০০ বছরের পুরানো। এখানে জৈন ধর্মের কিছু কিছু চিহ্ন দৃষ্ট হওয়ায় মনে হয় অতীতে এখানে জৈনদের কোন মন্দির বা মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে হয়তো সেটি শিব মন্দিরে পরিণত হয়ে থাকবে।

সিদ্ধেশ্বর, বহুলাড়া

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত বহুলাড়া এক ঐতিহ্যময় গ্রাম। এখানে প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দিরটি বহুযুগের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বহুদূর থেকে দেখা যায় সিদ্ধেশ্বরের মন্দির-শিখর। এই মন্দির খাঁটি বাংলা রীতির মন্দির নয় —সুন্দর এক রেখ দেউল। মন্দিরে শিবলিঙ্গের সঙ্গে রয়েছে গনেশ, জৈন দেবতা পার্শ্বনাথ ও মহিষাসুর মর্দিনী।

বহুলাড়ার শিবমন্দির ঠিক কত বছরের প্রাচীন তা নিরূপিত হয়নি। মন্দিরটি সম্পূর্ণ ইঁটের তৈরী ও অপূর্ব কারুকার্যময়। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ শিব দেউল বাঁকুড়া জেলায় আরও আছে যেমন ষাঁড়েশ্বর ও শল্যেশ্বর মন্দির। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। মন্দিরের মধ্যস্থ তিনটি বৃত্তকার 'বন্ধনের' বেষ্টন খাঁটি উড়িষ্যার মন্দিরের মত। বহুলাড়ার এই মন্দির দেখে মনে হয় উত্তর ভারতের শিখর যুক্ত 'নাগর' মন্দিরের একটি প্রধান বিশিষ্ট ধারার বিকাশ ভারতের পূর্বাঞ্চলে উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের মধ্যে হয়েছিল। দ্রাবিড় ও বেসর পদ্ধতির দেবমন্দিরের গঠনরীতির সঙ্গে 'নাগর' মন্দিরের গঠন-রীতির মিশ্রণে 'রেখ' দেউলের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটেছে। উড়িষ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল ছিল

এই স্থাপত্য বিকাশের ক্ষেত্র। সময়টা সম্ভবতঃ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। তারপর উড়িষ্যায় নানা বৈচিত্র্য নিয়ে 'রেখ' দেউলের চরমতম বিকাশ ঘটে, কিন্তু বাংলা মন্দিরে শিল্প মোড় ফেরে তার নিজস্ব রীতিতে যেখানে নিজেদের বাসগৃহের আদলে বাঙ্গালী তার দেবালয় গড়তে আরম্ভ কার—দোচালা, চারচালা, জোড় বাংলা, রত্ন মন্দির প্রভৃতির মন্দির গঠন বৈচিত্র্যের মাধ্যমে।

সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে চৈত্র সংক্রান্তিতে সমারোহের সঙ্গে গাজনের উৎসব পালন করা হয় এবং এখানে তিন দিন ধরে বিরাট মেলা বসে। আগেকার কালে গাজনে কয়েকশ 'সন্ন্যাসী' অংশ গ্রহণ করতেন। পিঠ ফোঁড়া বাণের অনুষ্ঠানও হত সমারোহের সঙ্গে। পিঠে বাণ ফুঁড়ে চড়ক গাছে নিজেদের বেঁধে "ব্যোম্ বোম্ শিব শঙ্কর" বলে পাক খেতেন ভক্তরা। রোমাঞ্চকর দৃশ্য। পিঠে বাণ এখন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে অন্যান্য বাণ ফোঁড়া যেমন জিব বাণ, কপাল বাণ, কর্ণ বাণ এগুলি এখনও অনুষ্ঠিত হয়। গাজনের সময় বহুলাড়াতে অন্যান্য স্থানের মত নিম্ন-জাতীয়রাই 'সন্ন্যাসী' বা ভক্ত হয়ে থাকেন, প্রধান 'ভক্ত' হন নায়েক, খয়রা, বাউরী, ধীবর প্রভৃতির জাতির লোকেরাই বেশী।

মল্লেশ্বর, বিষ্ণুপুর

৯২৮ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মল্লরাজ বীরসিংহ বিষ্ণুপুরে মল্লেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। মল্লেশ্বরের মন্দিরটি একটি প্রাচীনতম আলগোছ টুঙ্গী মন্দির। মন্দির দ্বারের শীর্ষে লিপি আছে আর দরজার নীচে কৃষ্ণ প্রস্তরের তৈরী একটি হাতী ও তার পাশে নারী মূর্তি। মন্দির লিপিটি এই রকম :—

"বসুকর নবগণিতে মল্লশকে শ্রী বীরসিংহেন।
অতিললিত দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু।"

৯২৮ মল্লাব্দ। ভাবার্থ :—বীরসিংহ ঐ অব্দে এই অতি দেবালয় শিবপাদপদ্মে অর্পণ করেন।

মণি মহাদেব, বাঁকুড়া

বাঁকুড়ার মণি মহাদেবের মন্দির একটি বিচিত্র মন্দির। মধ্যে আমলক বিশিষ্ট প্রাসাদ ও দুই পাশে দুটি অর্ধ প্রাসাদ। মধ্যের প্রাসাদে মণি মহাদেব বিরাজিত। স্থানীয় লোকে এঁকে খুব জাগ্রত দেবতা হিসেবে মান্য করে। স্থাপত্যের দিক দিয়ে এই মন্দির একটি রীতি বহির্ভূত শিব দেউল।

আদ্যমহেশ, দক্ষিণ বারাসত

কলকাতা থেকে প্রায় ৪২ কিলোমিটার দূরে ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ বারাসত গ্রামে 'আদ্যমহেশ' নামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। যুগ যুগ ধরে করুণাময় আদ্যমহেশ অসহায় নরনারীকে বিপদ ভয় থেকে রক্ষা করে চলেছেন। এঁর কল্যাণময় রূপ ভক্তজন সর্বদাই অনুভব করে। আদ্যমহেশের আরাধনা করে অনেক ভক্ত পরমমুক্তি অর্থাৎ মোক্ষফল লাভ করেছেন বলেও কথিত আছে। প্রবাদ যে, অন্নদামঙ্গল কাব্যের নায়ক শ্রীমন্ত সদাগর তাঁর পিতা ধনপতি সদাগরের খোঁজে সিংহল যাবার পথে এখানে নেমে আদ্যমহেশের পূজা করেছিলেন। তিনি একশবার এই শিবকে উদ্দেশ্য করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন বলে এই স্থানের নাম "বারাশত" হয়, তার থেকে বারাসত। জেলার অন্যতম মহকুমা সদর বারাসতের সঙ্গে পার্থক্য রাখার জন্য এই অঞ্চলের দক্ষিণ বারাসত নাম দেওয়া হয়েছে। আদ্যমহেশের মন্দিরটি খুব প্রাচীন। কয়েকটি সোপান বেয়ে নীচে নেমে মন্দির গর্ভে শিবলিঙ্গ দর্শন করতে হয়। মন্দিরের কাছে একটি পুকুর আছে। বর্ষাকালে পুকুরটির জল ভরে গেলে মন্দির অভ্যন্তরের শিবলিঙ্গের কুণ্ডটিও জলে পূর্ণ হয়ে জলপ্লাবিত হয়ে যায়। মাটির নীচ দিয়ে গর্ভ মন্দিরের সঙ্গে পুষ্করিণীর যোগাযোগ আছে বলেই এরূপ হয়। আদ্যমহেশ এই অঞ্চলের একটি বিখ্যাত দেবস্থান। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু জনসমাগম হয়।

বদরিকানাথ, বড়াশী

২৪ পরগণার মথুরাপুর রোড স্টেশন থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার পূর্ব দক্ষিণ কোণে বড়াশী মাধবপুর গ্রাম। কলকাতা থেকে ৫৪ কিলোমিটার দূর। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ চক্রতীর্থ অবস্থিত। নিকটেই ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির। বড়াশী গ্রামে বদরিকানাথ নামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ রয়েছেন। মাধবপুরে 'সঙ্কেত মাধব' নামক বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। বদরিকানাথের মন্দির আটচালা মন্দির এবং দেখতে অনেকটা তারকেশ্বরের মন্দিরের মত। একটি উচ্চভূমি খণ্ডের উপর মন্দিরটি অবস্থিত। নিকটেই একটি পুষ্করিণী, তার জল পবিত্র বলে লোকে বিশ্বাস করে। এর নাম শিবকুণ্ড। পুত্রকামিনীরা সুপুত্র লাভের আশায় এই কুণ্ডের জলে অবগাহন করে থাকেন।

বদরিকানাথের প্রাচীন নাম অম্বুলিঙ্গ। বড়াগী মাধবপুর প্রভৃতি গ্রাম পূর্বকালে ছত্রভোগেরই অন্তর্গত ছিল এবং সেকালে এর পাশ দিয়ে বইত গঙ্গানদী। এখনও এই অঞ্চলে গঙ্গার লুপ্তপ্রায় খাল দেখা যায়। অম্বুলিঙ্গ শিবের মন্দির পূর্বে গঙ্গার তীরবর্তী ছিল এবং ঐ স্থান অম্বুলিঙ্গ ঘাট নামে প্রসিদ্ধ হয়। শান্তিপুর থেকে নীলাচলে যাবার পথে শ্রীচৈতন্য অম্বুলিঙ্গ শিবকে দর্শন করেন ও এই ঘাটে স্নান করেন। এখান থেকেই নৌকা যোগে তিনি উড়িষ্যা রওনা হন। চৈতন্য ভাগবতে অম্বুলিঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, পূর্বকালে যখন ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তে আনায়ন করেন তখন শিব দীর্ঘকাল গঙ্গার বিরহে অধীর হয়ে তাঁর অনুসরণ করেন এবং ছত্রভোগের কাছে এসে জলরূপে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হন।

"গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্র ভোগে
বিহ্বল হইয়া অতি গঙ্গা অনুরাগে ॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা ॥
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' করি ঘোষে সর্বজনে ॥"

প্রবাদ যে, গঙ্গার স্রোতধারা অবরুদ্ধ হলে জলময় শিব পাষাণ শিবলিঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করেন।

বদরিকানাথ শিবের মন্দিরের অতি নিকটে প্রাচীন গঙ্গা গর্ভে নন্দা পুষ্করিণী বা চক্রতীর্থ অবস্থিত। এইরূপ কথিত যে, শিবের সঙ্গে গঙ্গার মিলন কালে জলস্রোতের গর্জন স্তব্ধ হলে অগ্রগামী ভগীরথ সংশয়াকুল চিত্তে বার বার শঙ্খধ্বনি করতে থাকেন; তখন গঙ্গা তাঁর হাত উত্তোলন করে হস্তধৃত জ্যোতির্ময় চক্র ভগীরথকে দেখান। শিব ও গঙ্গার মিলন স্থলে এই চক্র প্রদর্শিত হয়েছিল বলে এই স্থান চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী এই তিন তিথিকে নন্দা বলে। এই জন্যে চক্রতীর্থের অপর এক নাম নন্দা। এখন নন্দা বা চক্রতীর্থ একটি সামান্য পুকুর মাত্র।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও যেমন পুরী, কাশী, প্রভাস ও বৃন্দাবনে 'চক্রতীর্থ' এই নামের তীর্থস্থান আছে। তবে অনেকের মতে পুরাণ বর্ণিত 'চক্রতীর্থ' ছত্রভোগেই অবস্থিত। এ সম্পর্কে পুরাণের

আর এক কাহিনী আছে। একবার কর্মদোষে দৈত্যগুরু শুক্রচার্য মহা পাতকের ভাগী হন। পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করেও তাঁর পাপ মুক্তি হলনা, তখন শিবের নির্দেশে এই চক্রতীর্থে স্নান করে তিনি পাপ মুক্ত হন। কথিত যে, শুক্রচার্য যেদিন এখানে স্নান করেছিলেন সেদিন নন্দা তিথির সঙ্গে শুক্রবারের সংযোগ ঘটেছিল এই বিশেষ যোগের নাম ভৃগুনন্দা। এখনও চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথি শুক্রবারে পড়লে এখানে উৎসব হয়। নন্দা স্নান উপলক্ষে বহু পুণ্যার্থীর ভীড় হয় ও সপ্তাহ ব্যাপি এক বিরাট মেলা বসে ছত্রভোগে। অনেকের মতে চতুর্ব্যূহ মহাশক্তির অধিষ্ঠানের জন্যই ছত্রভোগ প্রকৃত চক্রতীর্থ। এই চতুর্ব্যূহ মহাশক্তি হলেন গঙ্গা, সঙ্কেতমাধব, অম্বুলিঙ্গ ও ত্রিপুরাসুন্দরী। বলা হয় যে, দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী বড়াশী গ্রামের বদরিকানাথ মহাদেবের শক্তি।

কেশবেশ্বরের মন্দির, মন্দির বাজার

মথুরাপুর রোড স্টেশন থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে মন্দির বাজার গ্রামে শ্রী কেশবেশ্বর শিবের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। এটি ৩০০ বছরের পুরাতন শিব দেউল। কাছেই জগদীশপুর গ্রামে দুটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীন দেউল দেখা যায়। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে হাউড়ি নামক একজন মহিলা শিবভক্ত এই মন্দির দুটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লাল রংএর লম্বা অথচ হালকা ইঁটের দ্বারা এই মন্দির দুটো তৈরী হয়েছে। দুটি মন্দিরেই পদ্মখচিত কালো কালো পাথরের আসনের উপর আড়াই হাত উঁচু কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

জগদীশপুর পার হয়ে কিছুদূর গেলেই কেশবেশ্বরের মন্দির পড়ে। মন্দিরটি বেশ বড় ও উঁচু। মন্দির হতেই গ্রামের নাম হয়েছে মন্দির বাজার। দুই থাক বিশিষ্ট মন্দিরের চূড়া। উপরের থাকে তিনটি ত্রিশূলযুক্ত কলস বসানো আছে। মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। মন্দিরের তিন দিকে প্রশস্ত বারান্দা ও রোয়াক আছে। প্রধান গম্বুজটি বারান্দাগুলিকে আবৃত করে তৈরী হয়েছে। মন্দিরে নিত্য শিব সেবা হয়। মন্দিরের শিলালিপি হতে জানা যায় যে, ১৬৭০ শকাব্দে শ্রীকেশব নামক এক রাজা বাসুদেব নামক শিল্পীর দ্বারা এই শিবদেউলটি নির্মাণ করান। দু'তিনশ বছর আগে সুন্দরবন অঞ্চলে কেশব নামে কোন

রাজার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে এঁর নাম কেশব রায় চৌধুরী এবং ইনি একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। কথিত যে, স্বপ্নাদেশ পেয়ে শিবলিঙ্গকে তিনি গভীর অরণ্য মধ্যে আবিষ্কার করেন এবং নিজ নামে শিবলিঙ্গের নাম রাখেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে সমারোহের সঙ্গে কেশবেশ্বরের পূজা হয়।

জটার দেউল, লক্ষ্মীকান্তপুর

লক্ষ্মীকান্তপুর হতে কিছুদূরে সুন্দরবনের উপকণ্ঠে 'জটার দেউল' নামে একটি অতি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত রেখ দেউল আছে। মন্দিরটি বেশ উঁচু। এর আকৃতি উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুরূপ। অনেকে বলেন এটি একটি প্রাচীন শিবমন্দির, আবার কেউ কেউ বলেন এটি একটি বৌদ্ধ চৈত্য ছিল।

বোলসিদ্ধির শিব, বাস্থুলডাঙ্গা

কলকাতা থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে বাস্থুলডাঙা রেল স্টেশন। স্টেশন থেকে আড়াই কিলোমিটার দক্ষিণে বোলসিদ্ধি শিবের প্রাচীন মন্দির। গ্রামের প্রান্তে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর মন্দিরটি অবস্থিত। কবে কার দ্বারা এই মন্দির নির্মাণ ও শিবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জানা যায় না। স্থানীয় লোকে এঁকে অনাদিলিঙ্গ মনে করেন। কথিত আছে যে, পূর্বে এখানে গভীর জঙ্গল ছিল। একজন সন্ন্যাসী সেই জঙ্গলে বাস করতেন। তিনি ছিলেন শিব ভক্ত। সন্ন্যাসী নাকি বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি যাকে যা বলতেন তাই ফলত। এইজন্য গ্রামের নাম হয় বাক সিদ্ধি বা বোল সিদ্ধি। গাজন ও শিবরাত্রির সময় এই শিব মন্দিরে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়।

ভাটপাড়ার শিবদেউল

শিয়ালদহ রাণাঘাট রেলপথে নৈহাটী জংশনের দক্ষিণে অনতিদূরে ভাটপাড়া অঞ্চল। বঙ্গে বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাপণার জন্য ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধি আছে। ভাটপাড়ার মধ্যে অনেক প্রাচীন দেবালয় আছে তার অধিকাংশই শিবমন্দির। মন্দিরগুলি প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ বছরের প্রাচীন এবং পণ্ডিতদের প্রতিষ্ঠিত। বাংলা রীতির প্রায় সবরকমের মন্দিরই ভাটপাড়ায় দেখা যায় জোড় বাংলা ছাড়া। বীরেশ্বর

ন্যায়লঙ্কার কর্তৃক তাঁর নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত দুটি বাংলা শিবমন্দির সবচেয়ে প্রাচীন। ১১৩৪ বঙ্গাব্দে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বাগেশ্বর পঞ্চানন ভাঙ্গাঘাটে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দুটি বাংলা শিবমন্দির, ও রামকান্ত সার্বভৌম কর্তৃক সস্ত্রীক একটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির ও একটি নবরত্ন শিবমন্দির ১৭৬৯/১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। রামশঙ্কর তর্কবাগীশ ও ভোলানাথ ঠাকুরও যথাক্রমে দুটি বাংলা শিবমন্দির ও একটি নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শাস্ত্র চর্চার মহাপীঠ নবদ্বীপ বৈষ্ণব প্রধান অঞ্চল আর শাস্ত্রচর্চার অন্য মহাপীঠ ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী শৈব ও শাক্ত প্রধান অঞ্চল।

হালিশহরের শিব দেউল

শিয়ালদহ রাণাঘাট রেলপথে পড়ে হালিশহর। সাধক রামপ্রসাদের সাধন ভূমি। অতি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জনপদ এই হালিশহর। শৈব-শাক্তদের প্রাধান্যের যথেষ্ট পরিচয় আজও হালিশহরে পাওয়া যায়। হালিশহরের অধিকাংশ মন্দিরই শিবমন্দির। এখানে প্রাচীন জীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ শিবালয় গুলিতেও শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। অধিকাংশ মন্দিরই আটচালা মন্দির, তবে রত্ন মন্দিরও আছে। গঙ্গাতীরে বারেন্দ্র গলিতে অনেক শিবমন্দির পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কয়েকটি চারচালা শিব মন্দিরে ইঁটের উপর অপূর্ব কাজ আছে। সবকটি চারচালা বাংলা মন্দিরের অপূর্ব নিদর্শন এবং মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। হালিশহরের কয়েকটি চারচালা শিবমন্দিরের গায়ে ইঁটের উপর পৌরাণিক চিত্রাবলীর অপূর্ব রূপায়ণ এক দুর্লভ স্থাপত্য নিদর্শন।

বুড়োশিব দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ

অতীতে কালী ক্ষেত্র বলতে বোঝাত কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ভূখণ্ড। দক্ষিণেশ্বরের নাম হয়েছে প্রাচীন শিবলিঙ্গ দক্ষিণেশ্বরের নাম অনুসারে, যাঁকে বুড়োশিব বলেই সাধারণ লোকে জানে। দক্ষিণেশ্বরের পাশেই এড়েদ্বীপে অর্থাৎ বর্তমান আড়িয়াদহে এই অনাদিলিঙ্গ বিরাজমান। প্রবাদ যে, শিবভক্ত বান রাজার গৃহদেবতা ছিলেন এই শিবলিঙ্গ বিগ্রহ।

কথিত আছে যে, নিকটবর্তী দেউলপোতার গভীর জঙ্গলে এই শিবের দর্শন পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে প্রচলিত আছে এক কিংবদন্তী। এক

ব্রাহ্মণের গরু হঠাৎ হঠাৎ বনের মধ্যে চলে যেতো আর বনের মধ্যে গেলেই তার দুধ আর পাওয়া যেতো না। ব্রাহ্মণ কৌতূহলী হয়ে তাঁর গরুটিকে একদিন অনুসরণ করে বনোমধ্যে গিয়ে দেখলেন গাভীটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল এবং তারপর ইচ্ছেমত দুধ ঢালতে লাগলো সেখানে। আশ্চর্য হয়ে ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরে এলেন। সেই রাত্রেই স্বপ্নে শিব তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "এখান থেকে গঙ্গা দেখতে পাইনা, তাই গঙ্গার ধারে শ্মশানের পাশে গিয়ে থাকবো, তুমি আমার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করবে।" পরদিন প্রত্যুষে ঘুম ভেঙ্গে গেলেই ব্রাহ্মণ কম্পিত বক্ষে গঙ্গাতীরে শ্মশানের কাছে গিয়ে দেখেন সেখানে একটি শিবলিঙ্গ প্রথিত রয়েছেন।

জানা যায় যে, দেওয়ান হরনাথ ঘোষাল এই বুড়োশিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এই শিবলিঙ্গ অনেকের মতেই বহু প্রাচীনকালের। ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দেউলপোতার একটি পুকুর কাটার সময় মাটিরতলা থেকে ছোট্ট ছোট্ট ইঁটের তৈরী যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রমাণ করে যে, এ অঞ্চল প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ।

কালো পাথরের এই উজ্জ্বল শিবলিঙ্গটি যেটুকু দৃশ্যমান আছে মনে হয় প্রায় ১ মিটার চওড়া ও অর্ধ মিটার লম্বা। প্রবাদ যে, ওয়ারেণ হেস্টিংস লোক মুখে শুনে একবার শিবলিঙ্গটিকে দেখতে এসেছিলেন এবং স্থানীয় লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে লিঙ্গমূর্তিকে অন্য উপযুক্ত স্থানে তুলে নিয়ে গিয়ে মন্দির তৈরী করার জন্য স্থানীয় লোককে সাহায্য করতে চান। তখন মাটি খুঁড়ে সমস্ত শিবলিঙ্গটি তোলার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু দেখা যায় যতই খোঁড়া হয় শিবলিঙ্গও যেন ততই গভীর থেকে গভীরে চলে যান—তাঁর তল পাওয়া যায়না। হেস্টিংস-এর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিশ্বময় যাঁর অস্তিত্ব তাঁর অস্তিত্বকে কি মৃত্তিকা খননে পাওয়া যায়? মনের মাটি খুঁড়লে তবেই বুঝি তাঁর তল মেলে।

দক্ষিণেশ্বরের দেউলপোতা থেকে যে বুড়োশিব আবির্ভূত হয়ে বিরাজ করছেন তাঁর নাম দক্ষিণেশ্বর। এই নামের সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী আছে। কেউ বলেন বাণরাজার রাণী দক্ষিণা দেবী এই শিবের আরাধনা করতেন বলেই এর নাম দক্ষিণেশ্বর। আবার কেউ বলেন দক্ষিণ রায় ছিলেন এঁড়োদ্বীপের অধিবাসী। সেই দক্ষিণ রায়ের নাম অনুসারেই শিবলিঙ্গের নাম দক্ষিণেশ্বর হয়েছে। অন্য মত

বলে যে, দক্ষিণাদেবী বা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে এই নামের কোন সম্পর্ক নেই। যে যুগে বানরাজা এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন বঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে আর কোন শিবের প্রতিষ্ঠা ছিলনা। দক্ষিণ বাংলার শৈবগণের ইনিই ছিলেন একমাত্র আরাধ্য দেববিগ্রহ তাই এই শিবের নাম দক্ষিণেশ্বর। আর বহু প্রাচীন কালে এঁর প্রতিষ্ঠা তাই ইনি বুড়োশিব। দক্ষিণেশ্বরের দাক্ষিণ্য যুগে যুগে ভক্তগণকে সুখশান্তি দিয়ে চলেছে।

কল্যাণেশ্বর বালি

কলকাতার উপকণ্ঠে বালি শহরে প্রাচীন শিবলিঙ্গ কল্যাণেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই শিবমন্দির দর্শন করে কল্যাণেশ্বরের পূজা করেছিলেন। প্রবাদ যে, প্রায় ২৫০ বছর আগে বর্তমান মন্দির যেখানে রয়েছে সেখানে ছিল বেতবন। বেতবনের কাছেই বাস করত এক দরিদ্র বাগ্‌দী। তার একটা গাই গরু ছিল। সেই গাভীটি প্রতিদিন ভোরে গোয়াল থেকে বের হয়ে সেই বেতবনে চলে যেত এবং মৃত্তিকায় প্রোথিত একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর দুধ ঢালতো তার বাঁট থেকে। বাগ্‌দী দুগ্ধ দোহনের সময় কয়েকদিন দুধ না পাওয়ায় একদিন ভোর বেলায় তার গাভীকে অনুসরণ করে দেখল যে, সে বেতবনে ঢুকে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর দুগ্ধবর্ষণ করছে। সে তার গাভীকে বেঁধে রাখলো। গভীর রাত্রে স্বপ্নে বাগ্‌দীকে দর্শন দিয়ে কল্যাণেশ্বর নিজের পরিচয় দিলেন ও তাকে বললেন, "তুমি তোমার গাভীকে বেঁধে রেখনা, সে এখানে আমায় নিত্য দুগ্ধ বর্ষণ করে যায়, আমি এখানে বর্তমান কল্যাণেশ্বর রূপে। "এইভাবে অনাদিলিঙ্গ কল্যাণেশ্বরের প্রচার হল।

কল্যাণেশ্বর লিঙ্গের মাথায় একটি মণি জ্বলত। একবার এক নাগা সন্ন্যাসী এখানে আসে এবং মণিটি দেখে তার লোভ হয়। সে শিবলিঙ্গের চারিদিকে ঘুঁটের পোর দিয়ে মণিটি পৃথক করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। তখন লোভে জ্ঞান হারিয়ে সেই সাধু বেশী অসাধু নাগা কল্যাণেশ্বরের দিব্যলিঙ্গ বিগ্রহে যেমনি আঘাত করল তক্ষুণি মণিটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এই কর্মের ফলে নাগা সাধু রক্তবমণ করে প্রাণত্যাগ করে।

এই ঘটনার পর কল্যাণেশ্বর বালির ছয় আনি জমিদার ভগবতী

প্রসন্ন রায়কে স্বপ্নে তাঁর জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করে দেবার নির্দেশ দিলেন। জমিদার মহাশয় তখন লোক লাগিয়ে বেতবন কাটিয়ে ফেললেন এবং অনাদিলিঙ্গের পরিমাপ জানার জন্য তার চারিদিক খনন করতে আরম্ভ করলেন। অনেকদূর ভূগর্ভে খনন করার পরে কল্যাণেশ্বর স্বপ্নে তাঁকে জানালেন "খনন করে আমার তল পাবেনা। বৃথা পরিশ্রম করোনা। এখানেই আমার মন্দির তৈরী কর।" কল্যাণেশ্বরের আদেশ পেয়েও জমিদার ভগবতী প্রসন্ন মন্দির নির্মাণ করবার কোন প্রয়াস করলেন না। তখন কল্যাণেশ্বর মাহেশের অধিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র বসুকে মন্দির নির্মাণ করার জন্য স্বপ্নে আদেশ দিলেন। সেইমত কৃষ্ণচন্দ্র কল্যাণেশ্বরের জন্য মন্দির নির্মাণ করতে লাগলেন। কিন্তু মন্দির তৈরী হয়ে গেলে পর জমিদারের কর্মচারীরা তাদের মনিবের আদেশে বসু মহাশয়কে মন্দির প্রতিষ্ঠিত করতে দিল না। এমনকি তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত না হলে প্রহার করা হবে এই ভয়ও দেখানো হল। তখন কৃষ্ণচন্দ্র বসু উপায়ন্তর না দেখে রাতারাতি মন্দিরের চূড়াতে বস্ত্র বেঁধে গঙ্গার পশ্চিম কূলে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাস ঘোষাল কল্যাণেশ্বরের সেবাইত নিযুক্ত হন। আজও তাঁরই বংশধরেরা এই অনাদিলিঙ্গের পূজা করে আসছেন।

স্থানীয় অধিবাসী ও দূরদূরান্তর হতে আগত নরনারীরা এই মন্দিরে কল্যাণেশ্বরেকে দর্শন ও অর্চণ করে শান্তিলাভ করে আসছেন। করুণাময় কল্যাণেশ্বর তাঁর কৃপায় কত শত মানুষের কল্যাণ করে চলেছেন।

ভোটবাগান মঠ ও মন্দির, ঘুস্থুরী

হাওড়া জেলার বালির দক্ষিণে ঘুসুরীতে তিব্বতী মঠ ভোটবাগান। এই মঠের এক মন্দিরে বাণেশ্বর লিঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম যুগে ওয়ারেণ হেস্টিংস-এর আনুকুল্যে তিব্বতী লামা তাশীলামার প্রচেষ্টায় ও দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী পুরাণগিরির পরিচালনায় ভোটবাগান মঠ তৈরী হয়েছিল। কলকাতার কাছেই এর অবস্থান। হাওড়া স্টেশন থেকে বাস যোগেও এখানে যাওয়া যায়।

ওয়ারেণ হেস্টিংস, সন্ন্যাসী পুরাণগিরি এবং ভোট বা তিব্বতী ধর্মগুরু পাঞ্চেন লামা এই তিন বিভিন্ন ধর্মীয় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী পুরুষের বিচিত্র যোগাযোগের ফলে মঠটি গড়ে উঠেছিল। বাহ্যত ধর্মাচরণের জন্য

স্থাপিত হলেও মনে হয় এর আসল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ-তিব্বতী বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা। তিব্বত ও ভূটানের প্রতি ওয়ারেণ হেস্টিংসের বরাবরই নজর ছিল।

ভূটান ও কোচবিহারের মধ্যে যুদ্ধ লাগলে হেস্টিংস সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ১৭৭২—৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে তিব্বতরাজ হেরে গিয়ে ধর্মগুরু পাঞ্চেন লামার মধ্যস্থতায় সন্ধি প্রস্তাব করেন। পুরাণগিরি তখন তিব্বতে ছিলেন। ধর্মগুরু তাশীলামা পুরাণগিরি ও পাইমা লামাকে সন্ধিপত্রসহ ওয়ারেণ হেস্টিংস-এর কাছে পাঠালেন। তাশীলামার মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপিত হলে তাঁর অনুরোধে এখানে ওয়ারেণ হেস্টিংস মন্দির নির্মাণে সাহায্য করেন। বাংলা দেশের মন্দিরের মত এর গড়ন, ছাদ ও মন্দিরগাত্রে তিব্বতীয় মূর্তি উৎকীর্ণ। তাশীলামা মন্দিরের জন্য বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ ও পূজার উপকরণাদি পাঠিয়েছিলেন এবং শৈব সান্ন্যাসী পুরাণগিরিকে মঠের মোহান্ত নিযুক্ত করেন।

ভোট বা তিব্বতী মঠরূপে স্থাপিত হলেও এই মঠ এখন পুরোপুরি তারকেশ্বর মণ্ডলের অধীন দশনামী সম্প্রদায়ের এক শঙ্কর মঠে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে পুরাণগিরির সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ তাছাড়া আছেন নারায়ণ শিলা, বালগোপাল, পার্বতী এই সব বিগ্রহ।

দুর্গেশ্বর, নিমতলা—কলকাতা

কলকাতার বৃহত্তম শিবলিঙ্গ দুর্গেশ্বরের আটচালা মন্দির নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের শেষভাগে গলির মধ্যে অবস্থিত। স্থানীয় প্রসিদ্ধ ধনী দত্ত বংশীয়রা এই দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির লিপি ঃ—

"অঙ্গোযধীশ ধরণীধর সিতরশ্মি।
প্রখ্যাতশাক সময়ে পিতুরাজ্ঞয়ৈতৎ সংস্থাপিতং
মদন মোহন দত্ত পুত্রৈ দুর্গেশ্বরাখ্য শিবলিঙ্গমভূৎ সুসৌধে।"

অর্থাৎ পিতা মদনমোহন দত্তের আদেশে তাঁর পুত্রগণ ১৭১৬ শকাব্দে এই উত্তম মন্দিরে দুর্গেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করলেন। বর্তমানে মন্দিরটি অসংস্কৃত অবস্থায় রয়েছে। শিবলিঙ্গটি এত বড় যে, একটি সিঁড়ির উপর উঠে মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে হয়।

ভূকৈলাস শিব, খিদিরপুর

কলকাতার খিদিরপুরের ভূকৈলাসে শিবগঙ্গা জলাশয়ের উত্তর দিকের ঘাটের দুপাশে দুটি বৃহৎ আটচালা শিবমন্দির আছে। এই শিবদেউল দুটির মধ্যে নিমতলার দুর্গেশ্বর শিবলিঙ্গের মতই দুটি বৃহৎ লিঙ্গ মূর্তি আছে—এখানের দেবার্চনার সময় সিঁড়ির উপর উঠে শিবলিঙ্গের মাথায় জলাভিষেক করা হয়। শিবগঙ্গার পূর্বদিকে মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের জননীর নামানুসারে রক্ত কমলেশ্বরের বৃহৎ আটচালা মন্দির স্থাপিত হয়েছে।

মন্দিরের দ্বার শীর্ষে অর্ধচন্দ্রাকার একটি কালো পাথরের ফলকের উপর লেখা :—

"চৈত্রেঽঙ্ক পক্ষগণিতেঽহনি পূর্ণিমায়াং।
শাকেঽক্ষিশূণ্য জলধীন্দুমিতে গৃহেঽস্মিন্
শ্রীযুক্ত রক্তকমলেশ্বর নামলিঙ্গম্।
বারে রবেঃ পশুপতেঃ কৃপয়াবিরাসীৎ।"

[শকাব্দা : ১৭০২]

পশ্চিমদিকের ঘাটে পিতার নামানুসারে কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর লিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরের লিপিটির অর্থ হল ১৭০২ শকাব্দের চৈত্রমাসের ২৯ তারিখে রবিবারে পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকমলেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান হলেন।

শোভাবাজারের নন্দরাম সেনের শিবালয়

শোভাবাজারের নন্দরাম সেন স্ট্রীটে নন্দরামের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ আটচালা শিবমন্দিরে তিনটি কক্ষ আছে। মন্দিরগাত্রে লেখা আছে :

সন ১০৬২. সুতানুটি।

নন্দরামের আদি বাড়ি ছিল দেগঙ্গা বা দীর্ঘ গঙ্গা গ্রামে। তিনি সেকালের কলকাতার সর্ববৃহৎ সপ্ততল অট্টালিকা স্থাপন করেন।

বাগবাজারের দোচালা শিবমন্দির।

বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীটে দুর্গাচরণের শ্বশুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দোচালা শিবমন্দিরটি প্রায় পৌনে তিনশ বছরের প্রাচীন। বিখ্যাত রূপচাঁদ পক্ষীও এই মন্দিরের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। মন্দির মধ্যে দুই পাশে দুটি মর্মর নির্মিত শিবলিঙ্গ ও মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরের শিব-লিঙ্গ স্থাপিত।

এছাড়া বাগবাজারের মোড়ে একটি বৃহৎ আটচালা শিবমন্দির আছে। এই শিবলিঙ্গটিও প্রাচীন। মন্দিরগাত্রের লিপিটি এই রকম :—

"শাকে বিলেশয় বিলর্ত্তু বিধৌ বিবর্ষে।
চিত্তে বিলাস ফলদং গুরু পাদ পদ্ম॥
মাবাস্তকংশিতি ভূতো বিষ্ণুরামোহকার্ষীদ্ধি
মন্দিরমিদং পরমত্রকাঙ্ক্ষী॥ শকাব্দা : ১৬০৮॥"

অর্থ :—দ্বিজ বিষ্ণুরাম পরকল্যাণ কামনায় সুখদ গুরু চরণ চিন্তা করে ১৬০৮ শকাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করান।

পশ্চিমবঙ্গে বহুস্থানে তিনটি, ছয়টি বা বারোটি করে শিবমন্দির পাশাপাশি অবস্থিত দেখা যায় এবং এগুলির অধিকাংশই প্রসিদ্ধ শিব দেউল। এই শিব দেউলগুলি সচরাচর কোন প্রসিদ্ধ দেবীমন্দিরের সংলগ্ন দেখা যায়। যেখানে শিব সেখানে শক্তি, যেখানে শক্তি সেখানে শিবের অধিষ্ঠান। দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরের পশ্চিমে ভাগীরথী তীরবর্তী দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, কোন্নগরে গঙ্গাতীরে কলকাতার হাটখোলার দত্তবংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত 'বারো মন্দির' প্রসিদ্ধ। শ্যামনগরে ব্রহ্মময়ী মন্দিরের দুইপাশে ছ'টি করে বারোটি শিব দেউল প্রতিষ্ঠিত আছে। চুঁচুড়ার ব্রহ্মময়ী মন্দির প্রাঙ্গণে পাশাপাশি তিন প্রাচীন শিব দেউলে লিঙ্গমূর্তি প্রত্যহ পূজিত হচ্ছেন। হাওড়ায় শিয়াখালার চণ্ডীতলার কাছে বাক্‌সায় ঈশাণেশ্বর শিবমন্দিরের সংলগ্ন দ্বাদশ শিব দেউল খুবই প্রসিদ্ধ। টিটাগড়েও গঙ্গাতীরে বারোটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে শিবলিঙ্গ নিত্য পূজিত হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেকের গৃহে যে সকল উল্লেখযোগ্য শিবলিঙ্গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন সে সম্পর্কে কিছু কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এখানে প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠে মাতৃ মন্দিরের পাশে অন্য মন্দিরে তাঁর ভৈরবও বিরাজ করেন—এগুলি সেই পীঠস্থানের বিখ্যাত শিবলিঙ্গ মূর্তি। এগুলির মধ্যে কতিপয় শিবলিঙ্গের নামোল্লেখ করা হল।

(১) নকুলেশ্বর :—দেবী কালিকার ভৈরব—কালীঘাট।
(২) ভীরুক :—দেবী বহুলার ভৈরব কেতুগ্রাম, বর্ধমান।
(৩) বিশ্বেশ :—দেবী ফুল্লরার ভৈরব—লাভপুর, বীরভূম।
(৪) রুরু :—দেবী বেদগর্ভার ভৈরব—কোপাই, বীরভূম।
(৫) নন্দিকেশর :—দেবী নন্দিনীর ভৈরব—সাঁইথিয়া, বীরভূম।
(৬) যোগীশ :—দেবী ললাটেশ্বরীর ভৈরব—নলহাটি, বীরভূম।

(৭) সম্বর্ত্ত :—দেবী কিরীটেশ্বরীর ভৈরব—লালবাগ, মুর্শিদাবাদ।

বর্তমানে চট্টগ্রাম বাংলাদেশে অবস্থিত। এই অঞ্চলের শৈবতীর্থ ও শিব মন্দিরগুলি প্রসিদ্ধ। পূর্বে চট্টগ্রাম ভারত ভূমিরই অংশ ছিল। চট্টগ্রাম থেকে পূর্ব সীমানা ঘিরে উত্তরমুখী বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে যেখানে মিজোরাম, মণিপুর, আসাম প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত সেখানেও কোথাও কোথাও শৈবধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

মণিপুরে শিবের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এই রাজ্য সম্পর্কে এক পুরাণকাহিনী প্রচলিত আছে।

একদা এক মধুমাসে পার্বতীর ইচ্ছা হল পতির সঙ্গে কোন এক নতুন জায়গায় বাস করবেন কিছুদিন। মহাদেব অনেক জায়গা খুঁজলেন কিন্তু মনোমত স্থান পাওয়া গেল না। শেষে নারদ এসে এই স্থানের কথা জানানোয় শিব তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন স্থানটি পরিদর্শন করতে। সাতটি পাহাড় একে অন্যকে অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে আছে—নীচে নীলাম্বুরাশি আছড়ে পড়ে যেন পাহাড়গুলির পদচুম্বন করছে। প্রাণবন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই দেশ দেখে শিবের পছন্দ হল। ত্রিশূলের অগ্রভাগ দিয়ে সমস্ত জলকে সঙ্কুচিত করে এক বিরাট জলাশয়ে বদ্ধ করলেন মহাদেব যার নাম লোকতাক্ হ্রদ। মহাপবিত্র এই হ্রদের জল। এই স্থানের নাম হল মণিপুর—যাকে নাভিতীর্থও বলে পুরাণে। শিব-পার্বতী রইলেন সেখানে। আনন্দময় মহেশ্বরের নৃত্যলীলায় মেতে উঠলো সঙ্গীতময় হয়ে মণিপুর—যার রেশ আজও অম্লান মণিপুর-বাসীদের নৃত্যগীতে। আজও এই পৌরাণিক কাহিনীকে উপলক্ষ করে শিব-পর্বতে উৎসব হয়।

বৈশাখ মাসে শিব-গৌরী কৈলাসে শিবালয়ে ফিরে গেলেন। মহাদেব যাবার সময় অনন্তনাগকে ষোলশ প্রমিলাসহ এই রাজ্য পরিচালনের ভার দিয়ে গেলেন। তাই মণিপুরের অন্য এক নাম প্রমিলা রাজ্য। কথিত যে, লোকতাক্ হ্রদের পবিত্র জলে শিব পূজা করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।

মণিপুরের রুদ্রেশ্বর শিব বিখ্যাত। এই অনাদিলিঙ্গের পূজা প্রায় সকল হিন্দু মণিপুরবাসীই করে থাকে। তবে এখানে রাধাকৃষ্ণেরও অনেক মন্দির আছে ও তাঁদের নিত্য পূজা হয়।

মণিপুরে চৈত্রমাসে "চম্পক চতুর্দ্দশী" এক উল্লেখযোগ্য শিবোৎসব। এই দিনে হিন্দু রমণীরা চম্পক গুচ্ছে নিজেরা সাজে ও দেবতাকেও

সাজায়। তাছাড়া শিবের মাথায় জল দেওয়া এই দিনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। পাহাড়ের উপর দুগ্ধ-ধবল রুদ্রেশ্বর শিবেরমন্দির বড় সুন্দর। প্রবাদ, একদা এক ব্রাহ্মণ কুমারী রুদ্রেশ্বরের পূজা করতো। তার প্রাণঢালা পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব রুদ্রেশ্বরের রূপে তাকে দেখা দেন এই চম্পক চতুর্দ্দশীর দিনে। আজও সেই স্মৃতি বহন করে রুদ্রেশ্বরের পূজা অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সমারোহে। একটি বৃহদাকার তাম্রপাত্রে লোকতাক্ হ্রদের জল ভরে চম্পক পুষ্প রাখা হয়, সঙ্গে থাকে কলাপাতায় তৈরী একটি চামচ। এই তাম্রপাত্র থেকে চামচেতে জল তুলে শিবের মাথায় জলাভিষেক করে পুণ্যার্থীরা মন্দিরে সমবেত হয়। শিবমন্দিরের সম্মুখে সারিবদ্ধ ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে স্থানটিকে আলোকময় করে রাখে। অপূর্ব ভাবগম্ভীর স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে রুদ্রেশ্বর যেন কল্যাণ আশীর্বাদ নিয়ে সকলের মাঝে প্রতিভাত হন।

এই অনাদিলিঙ্গ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছেন আর তাঁর চারপাশ থেকে দেওয়াল তুলে মন্দির তৈরী হয়েছে—মন্দিরের ভিত নেই।

মণিপুরের মৈতাই-জাতি (যাদের ধর্ম এখনও আদিম) ঘোর শৈব। এরা ভৈরব ও সূর্যদেবের পূজক। এখনও আদিম প্রথায় এদের পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

আসাম প্রদেশের গৌহাটি শহরের অনতিদূরে কামাখ্যা পর্বতের শীর্ষে মহাশক্তি পীঠ কামাখ্যা দেবীর মন্দির। এরই কিছুদূরে ব্রহ্মপুত্রের বুকে উমানন্দ শিবের মন্দির। ইনি দেবী কামাখ্যার ভৈরব। কামাখ্যা মন্দিরের প্রাঙ্গণের বহির্দেশে আম্রতারকেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কামেশ্বর শিবের মন্দিরগুলি বহু প্রাচীনকাল থেকে রয়েছে। কামেশ্বর শিবেরমন্দির অভ্যন্তরে গঙ্গা অর্থাৎ ঝরণার জল সর্বদা প্রবাহিত। প্রদীপের সাহায্যে এই অন্ধকার মন্দিরে দেব দর্শন করতে হয়। শিবমন্দিরগুলি সবই প্রস্তর নির্মিত।

উমানন্দ শিবের মন্দির যে পাহাড়ে অবস্থিত কামাখ্যা পাহাড় থেকে তার দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার। জলযানে এখানে আসতে হয়। হরিৎবর্ণ বৃক্ষরাজি শোভিত উমানন্দ দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ। শিবদেউলটি এক চূড়া বিশিষ্ট মন্দির। গুহামধ্যে নেমে দীপালোকের সাহায্যে দেব দর্শন করতে হয়। শিবলিঙ্গ পিতলের তৈরী পঞ্চমুখী ডেকচির দ্বারা আবৃত থাকে। মন্দির গহ্বরে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ড যার নাম ভোগবতী গঙ্গা।

শিবঠাকুর অন্য দেশে

ভারতবর্ষের বাইরেও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও নেপালে শিব মন্দির আছে এবং সেখানে হিন্দুরা উল্লেখযোগ্যভাবে শিব পূজা করে থাকেন। বাংলাদেশ পূর্বে ভারত ভূখণ্ডের অন্তর্ভূক্ত ছিল, সুতরাং এখানে শিবমন্দির ছিলই। নেপালেও শিবের অধিষ্ঠান প্রায় সর্বত্র। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অবস্থিত দু একটি প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ও শৈবতীর্থের বর্ণনা করা হচ্ছে।

চন্দ্রনাথ

বর্তমান বাংলাদেশে পড়েছে এই প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ। লাকসাম ও চট্টগ্রাম জংশন থেকে যথাক্রমে ৯৩ কিলোমিটার ও ৩৭ কিলোমিটার দূরে সীতাকুণ্ড। সীতাকুণ্ড স্টেশন থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে শৈব মহাপীঠ চন্দ্রনাথ পাহাড়। পাহাড়ের উচ্চতা তিনশ ছেচল্লিশ মিটার। পাহাড়টি সর্বোচ্চ চূড়ায় চন্দ্রনাথ মহাদেবের নবরত্ন মন্দির এবং ঠিক পাশের চূড়ায় বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দির বহুদূর থেকে দেখা যায়। যদিও চন্দ্রনাথ মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে অবস্থিত তবু দেশের হিন্দু ও অহিন্দু অনেকের কাছে চন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য আজও অম্লান রয়েছে। শাস্ত্রানুসারে কলিযুগে চন্দ্রশেখরই মহাদেবের আবাসভূমি। "কলৌ বসামি চন্দ্রশেখরে।" পূর্বকালে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠার রাস্তা বড়ই দুর্গম ও কষ্টকর ছিল কিন্তু এখন পাহাড়ের গায়ে বহু স্থানে সোপান নির্মিত হয়েছে। সেজন্যে মানুষের পক্ষে চন্দ্রনাথ দর্শনও সহজসাধ্য হয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশে বা সমতল ভূমি হতে শিখর পর্যন্ত প্রায় ৭০০ সোপান আছে।

চন্দ্রনাথ মন্দিরে উঠার পথে অনেকগুলি তীর্থ পড়ে। প্রথমে পড়বে ব্যাস কুণ্ড বা ব্যাস সরোবর। কথিত আছে যে, মহামুনি ব্যাসদেব তপস্যা করতে বারাণসীধাম গেলে মহর্ষি ভৃগু ও অন্যান্য মুনি ঋষিরা তাঁকে মৎস্য গন্ধার পুত্র নীচকুল সম্ভূত বলে অপমান করেন। অপমান ও দুঃখে ব্যাসদেব তখন একটি নতুন কাশী সৃষ্টি করার সঙ্কল্প নিয়ে কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর তপে শিব তুষ্ট হলেন। কলিযুগে শিব ভারতের অগ্নিকোণে স্থিত চট্টলে চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে (এখন অবশ্য স্থানটি বিদেশের অর্থাৎ বাংলা দেশের অন্তর্গত) অবস্থান করবেন এই আশ্বাস পেয়ে শিবেরই উপদেশ মত এখানে এসে ব্যাসদেব নতুন কাশীধাম প্রতিষ্ঠা করেন।

মহামুনি ব্যাস তপোবলে অন্যান্য তীর্থগুলিকে চন্দ্রনাথে নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে তিন কোটি দেবতা এসে এখানে হাজির হলেন। চন্দ্রনাথ সর্বতীর্থসার মহাতীর্থে পরিণত হলে ব্যাসদেবের স্নান তর্পণের জন্য মহাদেব ত্রিশূল নিক্ষেপ করে ব্যাসকুণ্ডটি সৃষ্টি করেন। পরে নৈমিষারণ্য থেকে ব্যাস শিষ্য সূত মুণি চন্দ্রনাথ এসে ব্যাসকুণ্ডটি খনন করিয়ে বর্তমান সরোবরে পরিণত করেন। ব্যাসকুণ্ডের পশ্চিম তীরে মন্দির অভ্যন্তরে ব্যাসেশ্বর শিব, ভৈরব, ব্যাসদেব ও চণ্ডিকা দেবীর মূর্তি আছে। এই মন্দিরের পাশেই বটুক বৃক্ষ বা অক্ষয় বটের অবস্থান। ব্যাস সরোবরের কিছু দূরে হনুমান মন্দির ও তারপর সীতাকুণ্ড। কথিত যে, বনবাসকালে রামচন্দ্র যখন এখানে এসেছিলেন তখন মহর্ষি ভার্গব সীতাদেবীর স্নানের জন্য এই কুণ্ড সৃষ্টি করেন।

সীতাকুণ্ডের পর ভবানী দেবীর মন্দির। এটি পীঠস্থান। এখানে সতীর দক্ষিণ বাহু পড়েছিল।

ভবানী দেবীর মন্দির থেকে ৪৯টি সিঁড়ি অতিক্রম করে উপরে উঠলে স্বয়ম্ভুনাথ মহাদেবের মন্দির পড়ে। এঁর অপর নাম ক্রমদীশ্বর। মন্দিরের উত্তর দিকে নব ভৈরব ও মন্দির দ্বারে দ্বারপাল ভৈরব অবস্থিত। স্বয়ম্ভুনাথের ভিতর থেকে সর্বদা জল নির্গত হচ্ছে। এঁর পাশেই আছেন সাক্ষী শিব।

স্বয়ম্ভুনাথের প্রকাশ সম্পর্কে প্রবাদ যে, চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কাছে শম্ভু নামে এক রজক বাস করতো। তাঁর একটি গাভী, কপিলা নাম, গ্রামে প্রচুর আহার পাওয়া সত্ত্বেও পাহাড়ের দিকে কোথায় পালিয়ে যেত ও রাত্রে গৃহে ফিরে আসত। একদিন রজক গাভীটিকে অনুসরণ করে দেখলো যে, সে পাহাড়ে উঠে একস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়াল ও তার স্তন হতে দুগ্ধ ঝরে পড়তে লাগলো সেখানে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর। রজক বিস্মিত হয়ে কম্পিত বক্ষে ফিরে এলো এবং সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখলো শিব যেন তাঁকে বলছেন, যে পাথরটির উপর কপিলার দুধ ঝরে পড়ছিল তাতে তিনি অবস্থান করছেন এবং এই অনাদিলিঙ্গের নাম স্বয়ম্ভুনাথ। রজক পরদিন থেকে স্বয়ম্ভুনাথের পূজার ব্যবস্থা করলো। প্রবাদ যে, স্বয়ম্ভুনাথের মাহাত্মের কথা শুনে ত্রিপুরার রাজা এঁকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে যাবার ইচ্ছায় স্বয়ম্ভুনাথের চারিধার খনন করে বিফল হন। যতই খোঁড়া যায় তল পাওয়া যায় না শিবলিঙ্গের। হাতীর সাহায্যে শিবলিঙ্গটি উঠাবার চেষ্টা করেও কোন ফল হয় না।

রাত্রে রাজা স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, তিনি স্বয়ম্ভুনাথকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার আশা ত্যাগ করেন এবং এখানে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিকটস্থ মহামায়ার মূর্তিকে নিয়ে যান। রাত্রিকালে মহামায়াকে নিয়ে গিয়ে যেখানে রাত্রি প্রভাত হবে সেখানেই যেন দেবীকে স্থাপন করেন। ত্রিপুরাধিপতি তখন স্বপ্ন-নির্দেশমত এখানেই স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির নির্মাণ করিয়ে তাঁর পূজার জন্য বহু সম্পত্তি দান করেন এবং আদ্যাশক্তি মহামায়াকে নিয়ে পার্বত্য পথে রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন। রাজধানী থেকে বহুদূরে যেখানে রাত্রি প্রভাত হল দেবীকে সেখানেই প্রতিষ্ঠা করে মন্দির নির্মাণ করলেন। দেবীর নাম হল ত্রিপুরেশ্বরী। সূর্যোদয় হওয়ায় এই স্থানের নাম হয় উদয়পুর। এটি একটি পীঠস্থান, সতীর দক্ষিণ চরণ এখানে পড়েছিল।

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির থেকে চন্দ্রনাথের পথে পড়ে গয়াকুণ্ড। এখানে গয়ার মতই লোকে পিতৃ পুরুষের পিণ্ডদান করে। কিছুদূর গিয়ে ১৫৭টি সোপান অতিক্রম করে রাস্তার সঙ্গম স্থলে আসতে হবে। এখানে দক্ষিণ দিকের একটি ক্ষুদ্র সেতু পার হয়ে সোজা চন্দ্রনাথ শিখরে উঠার ৫৪৯টি সিঁড়ি পড়বে এবং এই পথের সমস্তটাই খাড়াই। বামদিকে উত্তরমুখী আর একটি পথ আছে। ঐ পথে উনকোটি শিব ও বিরূপাক্ষ হয়ে চন্দ্রনাথ শিখরে যাওয়া যায়।

উনকোটি শিবের পথ ধরে কিছুদূর গেলেই দক্ষিণ দিকের পর্বতটি ঠিক যেন একটি গোলাকৃতি বৃহৎ ছত্রের আকার ধারণ করে। এই জন্য একে ছত্রশিলা বলে। ছত্রশিলার পরেই পথের বামদিকে একটি বিশাল প্রাচীন বৃক্ষের পাদদেশে প্রকাণ্ড কোটর আছে। প্রবাদ যে, মহর্ষি কপিল এই কোটরে তপস্যা করতেন। এস্থানের নাম সেজন্য কপিলাশ্রম। কপিলাশ্রম থেকে কিছুদূর গেলে পথ একটি ছোট পর্বত গুহায় শেষ হয়েছে। এই গুহার ভিতর শিবলিঙ্গের আকারে বহু প্রস্তর খণ্ড পর্বতগাত্রে ও গুহার ছাদে সংলগ্ন আছে। গুহার অভ্যন্তর হতে অবিরত জল নিঃসৃত হয়ে লিঙ্গাকৃতি পাথরগুলিকে ধুয়ে দিচ্ছে। এগুলিই 'উনকোটি' শিব নামে খ্যাত। তার পরই পড়বে বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দির।

বিরূপাক্ষ থেকে চন্দ্রনাথের মন্দির বেশিদূর নয়। চন্দ্রনাথের পুরাতন মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেছে, এখনকার মন্দিরটি পাঁচরত্ন মন্দির। মন্দির স্থাপত্যে বৌদ্ধরীতির মিশ্রণ আছে। চন্দ্রনাথ মন্দির থেকে

সম্মুখের বঙ্গোপসাগর ও সন্দ্বীপ দ্বীপের দৃশ্য বড় নয়নাভিরাম। একদিকে অদূরে সাগর অন্যদিকে তরুবিথী শোভিত পর্বতমালার গম্ভীররূপ। বিরূপাক্ষ থেকে চন্দ্রনাথ যাওয়ার পথে পাতালপুরী তীর্থ পড়ে। এখানে বৃষেশ্বর শিব, গোপেশ্বর শিব, রুদ্রেশ্বর শিব ও অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহ আছে।

শিবরাত্রির সময়ে চন্দ্রনাথে মহামেলা হয়। চন্দ্রনাথ পাহাড় বৌদ্ধদের কাছেও তীর্থস্বরূপ। এখানে বুদ্ধদেবের আঙ্গুলের অস্থি সমাহিত আছে বলে জনপ্রবাদ। অনেকের ধারণা যে, পূর্বে এখানে বৌদ্ধ মন্দির ছিল।

আদিনাথ

চট্টগ্রাম থেকে জলপথে স্টীমার যোগে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ আদিনাথে যেতে হয়। এই শৈবতীর্থ মহেশখালি বা মহিষখালি নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনার কাছেই মহেশখালি বা মহিষখালি নামক দ্বীপে মৈনাক পর্বতের উপর অবস্থিত। সমতল ভূমি থেকে অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করে মৈনাকের শীর্ষদেশে আদিনাথ শিবের মন্দিরে পৌঁছুতে হয়। শিবরাত্রির পর বহু লোক চন্দ্রনাথ হয়ে আদিনাথ মহাদেবের দর্শন করে। অতীতে এখানে এক সপ্তাহ ধরে মেলা বসতো। এই তীর্থে আদিনাথ মহাদেব ও অষ্টভুজা দুর্গা বিরাজিত। পার্বত্য প্রকৃতি, নদী ও সম্মুখের সমুদ্র পারিপার্শ্বিক দৃশ্যকে মনোরম করেছে। এই অস্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে প্রাত্যহিক পূজারতির শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি তীর্থযাত্রীর মনে অপূর্ব আনন্দ সঞ্চার করে।

প্রবাদ আদিনাথ লঙ্কেশ্বর রাবণের কাঁধে চড়ে তাঁর বসত বাটি মৈনাকে এসেছিলেন। এখানে তিনি বহুকাল গুপ্ত অবস্থায় ছিলেন। কিম্বদন্তী যে, অনেকদিন আগে স্থানীয় কোন মুসলমান চাষী কাঠ কাটতে জঙ্গলে গিয়ে একটা বেলগাছে উঠতে গেলে একটি জ্যোতির্ময় পদার্থ গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। সে তখন কৌতুহলী হয়ে নিকটে গিয়ে দেখে যে, পদার্থটি একটি উজ্জ্বল সুন্দর পাথরের টুকরো। অস্ত্রে শান দেবার জন্য পাথরটি কুড়িয়ে কৃষক বাড়ি নিয়ে গেলো। তার দুই পায়ে কাঁটা ফুটে ছিল বলে পাথরটি দিয়ে পায়ের তলা ঘষে কাঁটা বার করলো। রাত্রে সে ও তার স্ত্রী নানা ধরণের ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে অস্থির হয়ে উঠলো। পরের দিন তার একমাত্র পুত্র বিসূচিকায় মারা যায়। তখন

কৃষক ভীত হয়ে মহেশখালির জমিদারণী প্রভাবতী ঠাকুরাণীর কাছে গিয়ে সব কথা বিস্তারিত বললো। তারপর প্রভাবতী দেবী আদিনাথকে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর নিত্য পূজার ব্যবস্থা করলেন।

বাংলাদেশে শ্রীহট্ট জেলার শায়েস্তা গঞ্জের কাছে খোয়াই নদীর তীরে বৃহদাকৃতি তুঙ্গেশ্বর মহাদেব সুপ্রসিদ্ধ। কথিত যে, এখানে সতীর নয়টি অঙ্গুরীয় পড়েছিল। তাই এই স্থানকে নবরত্ন উপপীঠ বলে। তুঙ্গেশ্বর মহাদেবের কোন মন্দির নেই। প্রবাদ একবার মন্দির নির্মাণের আয়োজন করা হলে পূজারী স্বপ্ন দেখেন মহাদেব যেন তাঁকে বলছেন যে, তিনি মন্দিরে থাকতে ভালবাসেন না। জনশ্রুতি যে, বহুকাল পূর্বে শম্ভুনাথ বাচস্পতি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই শিবের প্রকাশ করেন। এঁর সম্পর্কেও কপিলা গাভীর উপাখ্যান প্রচলিত আছে। লোকের ধারণা এই শিব ক্রমশ বাড়ছেন। ৮০০ বছরে ইনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হতে প্রায় তিন হাত উঁচু ও পাঁচ হাত পরিধিতে পরিণত হয়েছেন। কালাপাহাড় তুঙ্গেশ্বরের দক্ষিণ দিক নাকি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। শিবের ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে বলে এই ভগ্ন স্থান নাকি ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হয়ে আসছে।

পশুপতিনাথ, নেপাল

ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ নেপাল। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে প্রসিদ্ধ শিব-বিগ্রহ পশুপতিনাথের মন্দির। ভারতবর্ষের বাইরে অবস্থিত হলেও ইনি প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দুর নমস্য। মানুষকে ত্রিতাপ হতে মুক্ত করতে গরিমাময় বিভূতি নিয়ে স্বর্ণময় মন্দিরে যুগ যুগান্তর ধরে পশুপতিনাথ বিরাজিত। মন্দিরে শুধুমাত্র হিন্দুর প্রবেশের অধিকার। ফটক খুললেই সামনে পড়বে মন্দিরের বিরাট চত্বর। চত্বর পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মন্দির অভ্যন্তরে পশুপতিনাথ দর্শনে যেতে হয়। মন্দির সম্মুখে রয়েছে বিরাটাকার স্বর্ণময় বৃষভ (নন্দী) মূর্তি। এখানে ছোট ছোট গেলাসের মত প্রদীপ বিক্রী হয়। এই প্রদীপ জ্বেলে শিবের উদ্দেশ্যে আরতি করা হয়।

পশুপতিনাথ মন্দিরের গঠন সচরাচর যে ধরণের হিন্দু মন্দির দেখা যায় তার মত নয়। অনেকটা বৌদ্ধ প্যাগোডার মত। এই মন্দিরের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। মন্দির আয়তনে বেশ বড় ও কারুকার্যময়। মন্দিরের উপরের দিক সোনার পাত দিয়ে মোড়া তাতে আছে ঘন কাজ। মন্দিরের চূড়ায় পশুপতিনাথের ত্রিশূল প্রোথিত। এখানে চারটি দেউল

দ্বার—বিগ্রহেরও চারটি মুখ। প্রতিটি দরজা ভারী ও সুদৃশ্য, মনে হয় সোনার পাতলা পাত বসানো। উপরের দেওয়ালে সুদৃশ্য কারুকাজ।

পশুপতিনাথের মূর্তি অভিনব। শিবলিঙ্গের চারটি মুখ। সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে এই ধরণের শিবলিঙ্গের প্রথম কল্পনা করা হয়। সোনার চোখ পরানো, নাক, ঠোঁট সবই চিহ্নিত। তাঁর চার দ্বারে চার পুরোহিত থাকেন রক্তাম্বর পরিহিত, কণ্ঠে ও শিরে রুদ্রাক্ষ মালা বিভূষিত। এঁরা তীর্থ যাত্রীদের পূজার্ঘ দেবতার চরণে নিবেদন করেন। সকালবেলা পশুপতিনাথকে স্নান করানো হয়। তখন ভক্তরা বহু সমারোহের সঙ্গে তাঁর মাথায় দুধ ও জল অভিষিক্ত করে। অবশ্য পূজা-উপাচার দ্বার থেকে নিক্ষেপ করতে হয়, ফুলও ছুঁড়ে দিতে হয়। মন্দিরের মধ্যে আছে এক বিশাল ঘণ্টা। এই ঘণ্টাধ্বনিতে পশুপতিনাথের জয়গান গায় ভক্তরা।

সন্ধ্যায় দেব বিগ্রহকে রাজবেশে সজ্জিত করা হয়। শিবলিঙ্গের সমস্ত অঙ্গ ঢেকে লাল জামা পরান হয়, শুধু মুখগুলি উন্মুক্ত থাকে। চার মাথায় সোনার ছাতা, সব থেকে উপরে একটি বড় ছাতা। মাথার উপরিভাগ ফুলে ঢাকা থাকে। এখানে একরকম হলুদ রংএর ফুল পাওয়া যায়—তাই দিয়েই পূজা করা হয়। নেপালে বেলপাতা পাওয়া গেলেও পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না তাই বেলপাতার মতন একরকম পাতা দিয়েও কখনো শিবের অর্চনা করা হয়। পাতাটিকে 'পাতি' বলে, স্বাদ তিক্ত।

আরতির সময়. পশুপতিনাথের চারটি মুখের সামনেই আরতি করা হয়। আগুনে দীপ্ত আভায় পশুপতিনাথকে অপূর্ব প্রভাময় দেখায়—যেন জীবন্ত মনে হয়। শিবমূর্তিকে ঘিরে তখন দিব্য মহিমা বিরাজ করে। এই মহিমময় পরিবেশে সত্য সুন্দর শিবের মহিমা প্রাণে জেগে উঠে। একটা স্বর্গীয় আবেশে প্রাণ মন স্থির হয়ে থাকে। আরতির শেষে দীপশিখার তাপ নেবার সময় ভক্তজনের ব্যোম, ব্যোম, শব্দ সমগ্র পরিমণ্ডল ভরিয়ে তোলে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস পশুপতিনাথ জাগ্রত দেবতা। পশুপতিনাথে বিশ্বাস নিয়ে এদের অনেকেই প্রতিদিনের জীবনচলে। শিবরাত্রির দিন সারা রাত্রি ব্যাপী পূজা ও উৎসব পশুপতিনাথের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

শিবনামায়ণ, শিবরাত্রি মাহাত্ম্য ও শিবপূজা

শ্রীচৈতন্যদেব বলে গেছেন কলিযুগে হরিনামই সার এছাড়া অন্য গতি নেই। ঈশ্বরের নাম জপেই ঈশ্বর সাধন; তাঁর নাম-শক্তির প্রভাবেই জীবের সাযুজ্য লাভ—তার মুক্তি। ঈশ্বর লাভের সহজতম উপায় তাঁর নাম জপ—অমোঘ শক্তি এই নামমন্ত্রের। তাঁর নামের মধ্যে অ-নামা তিনি প্রতিভাত হন।

ঈশ্বরের নাম জপ বা নামগানের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন যে, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে একবার ডাকলেই তিনি আসবেন। তবে অন্তরে ব্যাকুলতা চাই ও তাঁরই নামে বিভোর হয়ে তাঁকে ডাকা চাই।

ভগবানের নামের শক্তি অসীম। কৃষ্ণনাম, কালীনাম বা শিবনাম একাগ্রচিত্তে জপ করলে ঈশ্বরীয় শক্তি তরঙ্গের প্রভাবে মানুষ পরাশক্তি লাভ করে, দেহে মনে চিন্ময় হয়ে ওঠে। তার প্রাণের কোষে কোষে পরমানন্দের তরঙ্গ-কম্পন স্পন্দিত হতে থাকে। নাম জপের মাহাত্ম্য এমনই। এ যেমন ভক্তি, বিশ্বাস, জীবন-কর্ত্তব্য বিবেচনা করে কর্মে নিরত হওয়া ও একাগ্রতার বস্তু, তেমনই ভগবানের প্রতি প্রাণের ভালবাসা ঢেলে অনুশীলনের বস্তু।

যুক্তিবাদী ও তথাকথিত বাস্তববাদীদের কাছে এই নাম জপ ব্যাপারটা ভাবের আতিশয্য বলে মনে হতে পারে। বস্তু-বিজ্ঞানীর কাছে ব্যাপারটা উপেক্ষার বস্তু হতে পারে কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির কাছে যুক্তি তর্ক ও অবিশ্বাসের কাঠিন্য জনিত বেদনার চেয়ে ভক্তি ও বিশ্বাসে পেলব আশ্বাস-মৃত্তিকা ঢের বেশি বাঞ্ছনীয় ও বাস্তব। এখন প্রশ্ন, এই বিশ্বাস, ভক্তি এবং সাকারভূত ঈশ্বরের নাম জপের প্রতি স্পৃহা জাগলে তবে তো তার অনুশীলন। বিজ্ঞান দেয় পার্থিব সুখ—যুক্তি বিচার তার সঙ্গী। ঈশ্বর আছেন একথা না দেখে না জেনে সংশয় ব্যাকুল মন মানে কি করে, তাছাড়া সংস্কার ও কুসংস্কারে মূর্তিগুলিও ঈশ্বরকে মনের মধ্যে ঘুলিয়ে দেয় অন্যপক্ষে বস্তু-বিজ্ঞান লব্ধ আত্ম-অহমিকাতো তাঁকে অস্বীকার করতে পারেই। এগুলি আয়ত্ত করে খুব একটা উন্নতমানের স্তরে উঠেছে মানুষ এ ধারণা করলেও এগুলি কিন্তু বাস্তবিকই নিম্নমানের বোধ। একমাত্র বিশ্বাসই ঈশ্বর আছেন এই সত্য বোধ সহজে প্রাণে জাগাতে সক্ষম বলে মনে হয়। কিন্তু যুক্তি

তর্ক বলবে কোথায় প্রমাণ এতো নিছক গল্প—কল্প কথা। অসহায় মানুষের ভয় ও বিপদ হতে রক্ষার মিথ্যা অবলম্বন ঈশ্বর। তাই যদি যথার্থ তবে জগতের তাবৎ মহাপুরুষেরা ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল হলেন কেন যাঁকে তাঁরা পরম সত্য বলে বুঝেছেন? মনে হয় সাধারণ স্তরে প্রকৃত মানুষের প্রাণে ঈশ্বর-বোধ তখনই জাগতে পারে যখন সরলতা, পবিত্রতা ও প্রেমের আনুকুল্যে সে সত্য পিয়াসী হয়। এগুলি কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক সম্পদ—এ সম্পদের যে ঠিক ঠিক ব্যবহারী সে সৌভাগ্যবান, যে তা নয় সে দুর্ভাগা। কিন্তু পার্থিব সুখ সম্পদে বিহ্বল মায়া করলিত মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে এই সৌভাগ্যকে এড়িয়ে চলতে চায়।

পূর্বকালে শিবসাধক সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণ এই সত্য উপলব্ধি করে ছিলেন ঈশ্বর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। তাঁদের কল্পনায় ও ধ্যানে পরমেশ্বর পরিপূর্ণরূপে শিবমূর্তিতে সাকারভূত হয়েছেন। তাই মহেশ্বরের মহানরূপটি সাধারণ মানুষের মধ্যে গেঁথে দেবার জন্য তাঁরা নানাভাবে তাঁদের কল্পনা ও সত্য উপলব্ধির আলোকে শিব-ভাবনাকে পার্থিব ও অপার্থিব লাভের মধ্যে মিশিয়ে শিব-প্রচার করেছেন। সমাজকে শুদ্ধ করার জন্য, মানুষকে ভয়ে শ্রদ্ধায় ঈশ্বরমুখী করার জন্য হয়তো শিবকে কেন্দ্র করে নানা কল্পনার মালা গাঁথতে হয়েছে। কিন্তু শিব বা পরমেশ্বর সত্য এই বোধ জ্যোতির্ময় হয়ে ভাস্বরই রয়েছে। তাই শিব পূজায় কেউ আস্বাদন করেন পার্থিব লাভজনিত তৃপ্তি আবার কেউ শিবকেই লাভ করে পরম মুক্তি পান।

শিবনাম জপ বা তাঁর স্তব পাঠকে বলা হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ শিব-সাধনা। স্বয়ং মহাদেবের মুখ থেকেই শাস্ত্রের মাধ্যমে একথা উক্ত হয়েছে। সাধকের উপলব্ধির মূর্ত রূপও হতে পারে এটি। শিব-নামাবলী প্রাণে পরিধান করলেই শিব হয়ে যাবে—এই চেতনার সার্থকতা কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর একটাই—দেখনা প্রাণ মন ঢেলে তাঁর নাম জপ করে, বারংবার করনা তাঁর অনুশীলন। একটি লৌহ-খণ্ডকে একই দিকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে অন্য লৌহখণ্ড দিয়ে ঘর্ষণ করলে তা চুম্বকে পরিণত হয়। কেমন করে হয় তা, এ শক্তি কোথা থেকে আসে? লৌহখণ্ডের মধ্যে অণুগুলি একটি বিশেষ রূপ নেয় এবং ঐ বিশেষ আভ্যন্তরীণ গঠনই নতুন শক্তির প্রকাশ। ঠিক তেমনি ভগবানের নাম-গানের স্পর্শে দেহমনের কোষে ঘটে যায় পরিবর্তন—জন্ম হয় নতুন শক্তির যার তরঙ্গ পরাশক্তির সঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিত

হয়ে সেই মহাশক্তির চেতনা বয়ে আনে প্রাণে।

শিবের নামজপ বা নামস্তোত্র পাঠ করলে মানুষের সর্বমোহ ঘুচে যায়, জ্যোতির্ময় সূর্যালোক যেমন অমা বিদূরিত করে। শিবনামে মানুষের সর্বপ্রকার দুর্বলতার নাশ হয়। এই অভী নামমন্ত্রে মহাবীর্য ও মহাজ্ঞান লাভ করে মানুষ শিবস্বরূপ হয়ে শিবের মাঝে বিলীন হয়—শিবত্ব লাভ করে।

বোধের বৈচিত্র্য এই বিশ্ব আর বিশ্বের যিনি নিয়ন্তা ও বিশ্বই যাঁর অবয়ব তিনি বিশ্বনাথ। এই বিভিন্ন বৈচিত্র্যের নানা রূপ, নানা অভিধা, নানা নাম। একই ভগবান যেমন লীলাবিলাস নিমিত্ত বহু হয়েছেন তেমনই তিনি বহু নামে অভিহিত—নানা নামে বিশ্বনাথের নামায়ণ। কিন্তু যে নামেই তাঁকে ডাকা যাক না কেন, যে নামের মন্ত্রই জপ করা যাক না কেন তিনি সেই নামেই প্রতিভাত।

শিবনামে আছে এমনই শক্তি-রস যে, এই নামোচ্চারণেই মানুষের পাপ দূর হয়ে যায়। একবার সকল দ্বিধা মুক্ত হয়ে নির্ভয়ে 'শিব' 'শিব' বললেই সব অশিব ভস্মসাৎ হয়ে যায়।

পুরাণে কথিত আছে যে, একদা দুর্গাসহ মহাদেব সুমেরু পর্বতে গেলে দেবতারা ও ঋষিরা তাঁকে বহুবিধ উপাচারে পূজা করেন, তাতে শিব মৃদু হেসে ছিলেন। মহাদেব কেন দেব ও ঋষিদের পূজার্চনায় হাসলেন দেবর্ষি নারদ একথা জিজ্ঞাসা করলে শিব বললেন :—

"শুন ঋষি বলি হে তোমারে।
করিতেছ স্তববটে সকলে আমারে॥
শত নামে আমি কিন্তু যত তুষ্ট হই।
অন্য স্তবে তত তুষ্ট কখনই নই॥

শিববাক্য শ্রবণে পার্বতীসহ দেবঋষিগণ বিস্মিত চিত্তে মহাদেবকে নিবেদন করে বললেন, "হে দিগম্বর, আপনার শতনাম স্তোত্রে যদি আপনি এত তুষ্ট তাহলে নিজ মুখে, হে শূলপাণি, আপনার শতনাম আমাদের শোনান।"

শিব স্মিত মুখে শতনাম স্তোত্র পাঠ করে পার্বতী ও দেবঋষিদের শোনালেন।

শ্রীমহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শিব-পার্বতী সংবাদেও বর্ণিত হয়েছে যে, শিব নিজ মুখে তাঁর শতনাম শোনাচ্ছেন পার্বতীকে।

শতনাম স্তোত্রম্

পার্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণব তারক।
শিবলিঙ্গার্চনং সর্বং শ্রুতং তব মুখাৎ প্রভো॥
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শিবস্য শত-নামকম্।
যস্য শ্রবণ মাত্রেন মুচ্যতে ভব বন্ধনাৎ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যস্য স্মরণ মাত্রেন সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥
অতিগুহ্যং মহাপুণ্যং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং যথা তথা॥
মম নাম পরার্দ্ধঞ্চ তথৈব কথিতং ময়া।
তেষাং মধ্যে সহস্রঞ্চ সারাৎসারং পরাৎপরম॥
তত্র সারং সমুদ্ধৃত্য কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে।
মম নাম শতঞ্চৈব কলৌ পূর্ণ ফল প্রদম্॥
কেবলং স্তব পাঠেন মম তুল্যো ন সংশয়ঃ।
পীঠাদিন্যাস সংযুক্ত মৃষ্যাদিন্যাস পূর্বকম্॥
দেবতা বীজ সংযুক্তং শৃণুত্ব পরমাদ্ভূতম্।
নারদোহস্য ঋষিঃ প্রোক্তশ্ছন্দঽনুষ্টু পুদাহৃতম॥
সদাশিব মহেশানি দেবতা পরি কীর্তিতা।
ষড়ক্ষরং মহাবীজং চতুর্বর্গ প্রদায়কম্॥
সর্বাভীষ্ট প্রসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাশূন্যে মহাকালো মহাকলীযুতঃ সদা॥
দেহমধ্যে মহেশানি লিঙ্গাকারেণ বেষ্টিতঃ।
মূলাধারে স্বয়ম্ভুশ্চ কুণ্ডলীশক্তি-সংযুতঃ॥
স্বাধিষ্ঠানে মহাবিষ্ণু স্ত্রৈলোক্য-পালকঃ সদা।
মণিপুরে মহারুদ্রঃ সর্ব সংহার-কারকঃ॥
অনাহতে ঈশ্বরোঽহং সর্বদেবৈর্বলিষেবিতঃ।
বিশুদ্ধাখ্যে ষোড়শারে সদাশিব ইতি স্মৃতঃ॥
আজ্ঞাচক্রে শিব সাক্ষাৎ চিতিরূপেণ সংস্থিতঃ।
সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণ নিলয়ান্তরে॥

বিন্দুরূপো মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ।
বাহ্যরূপে মহেশানি নানারূপধরোহ্যহম্॥
কৈলাসে জ্যোতিরূপেন কৈলাসেশ্বর-সংজ্ঞকঃ।
হিমালয়ে মহেশানি পার্বতী-প্রাণবল্লভঃ॥
কশ্যাং বিশ্বেশ্বরশ্চৈব বাণেশ্বর স্তথৈব চ।
শম্ভুনাথশ্চন্দ্রনাথ শ্চন্দ্রশেখর-পর্বতে॥
আদিনাথ সিন্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ।
নেপালে পশুপতিনাথঃ কেদারে পাবকেশ্বরঃ॥
হিঙ্গলায়াং কৃপানাথো রূপনাথস্তদূর্দ্ধতঃ।
দ্বারকায়াং হরশ্চৈব পুষ্করে প্রথমেশ্বরঃ॥
হরিদ্বারে মহেশানি গঙ্গাধর ইতি স্মৃতঃ।
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশো বৃন্দারণ্যে চ কেশবঃ॥
গোকুলে গোপেশপূজ্যো গোপেশ্বর ইতীরিতঃ।
মথুরায়াং কংসনাথো মিথিলায়াং ধনুর্দ্ধরঃ॥
অযোধ্যায়াং কৃত্তিবাসাঃ কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ।
কাঞ্চীনগর মধ্যেতু মন্নাম ত্রিপুরেশ্বরঃ॥
চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়ো যোগীন্দ্রো বিন্ধ্যপর্বতে।
বাণলিঙ্গো নর্মদায়াং প্রভাসে শূলভৃৎ সদা॥
ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ায়াঞ্চ গদাধরঃ।
ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর তথৈব চ॥
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ।
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর নদীতটে॥
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ।
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যাণেশ্বর এব হি॥
নকুলেশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।
কোচবধূপুরে চাহং জল্পেশ্বর ইতি স্থিতঃ॥
উৎকলে বিমলাক্ষেত্রে জগন্নাথো হ্যহং কলৌ।
নীলাচলারণ্যমধ্যে ভুবনেশ্বর ঈরিতঃ॥
রামেশ্বর সেতুবন্ধে লঙ্কায়াং রাবণেশ্বরঃ।
রজতাচলমধ্যে তু কুবেরেশ্বর ঈরিতঃ॥
লক্ষ্মীকান্ত মহেশানি সদা শ্রীশৈলপর্বতে।
ত্র্যম্বকো গোমতীতীরে গোকর্ণে চ ত্রিলোচনঃ

বদরিকাশ্রমমধ্যে কপিনাথেশ্বরো হ্যহম্।
স্বর্গলোকে দেবদেবো মর্ত্যলোকে সদা শিবঃ ॥
পাতালে বাসুকিনাথো যমরাট কালমন্দিরে।
নারায়ণশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলকে হরিহরস্তথা ॥
গন্ধর্বলোকে দেবেশি পুষ্পদন্তেশ্বরো হ্যহম্।
শ্মশানে ভূতনাথশ্চ গৃহে চৈব জগদ্গুরুঃ ॥
অবতারে শঙ্করোঽহং বিরূপাক্ষস্তথৈব চ।
কামিনীজনমধ্যে তু কামেশ্বর ইতীরিতঃ ॥
চক্রমধ্যে কুলেশশ্চ সলিলে বরুণেশ্বরঃ।
আশুতোষ ভক্তমধ্যে শত্রূণাং ত্রিপুরান্তকঃ ॥
শিষ্যমধ্যে গুরুশ্চাহং তথৈব পরমো গুরুঃ।
চন্দ্রলোকে সোমনাথঃ স্বর্ভানুর্ভানুমণ্ডলে ॥
ত্রৈলোক্য লোকনাথোঽহং রুদ্রলোকে মহেশ্বরঃ।
সমুদ্রমথনে চাহং নীলকণ্ঠ স্ত্রীলোকজিৎ ॥
জম্বুদ্বীপে জগৎকর্তা শাকদ্বীপে চতুর্ভুজঃ।
কুশদ্বীপে কপর্দ্দীশঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে কপালভৃৎ ॥
মীনদ্বীপে মীননাথঃ প্লক্ষদ্বীপে কলাধরঃ।
অহঞ্চ পুষ্করদ্বীপে পুরুষোত্তম ঈরিতঃ ॥
দেবমধ্যে বাসুদেবো গুরুমধ্যে নিরঞ্জনঃ।
পুরাণে পরমেশানি ব্যাসেশ্বর ইতীরিতঃ ॥
আগমে নাগভট্টোঽহং নিগমে নাদরূপধৃক্।
সর্বজ্ঞো জ্যোতিষাং মধ্যে যোগেশো যোগশাস্ত্রকে
দীনমধ্যে দীননাথ উমানাথ স্তথৈব চ।
রাজরাজেশ্বরশ্চৈব নৃপাণাং নগনন্দিনি ॥
পরংব্রহ্ম সত্যলোকে হ্যনন্তোঽস্মি রসাতলে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং লিঙ্গরূপী হ্যহং প্রিয়ে ॥
ইতি তে কথিতং দেবি মম নাম শতোত্তমম্।
পঠনাৎ শ্রবণাচ্চৈব মহাপাতককোটয়ঃ ॥
নশ্যন্তি তৎক্ষণাদ্দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
অজ্ঞানিনাং জ্ঞানসিদ্ধি র্জ্ঞানিনাং পরমধনম্ ॥
অতিদীন দরিদ্রাণাং চিন্তামণি স্বরূপকম্।
যোগিনাং পাপিনাঞ্চৈব মহৌষধমিতি স্মৃতম্ ॥

যোগিনাং যোগসারঞ্চ ভোগিনাং ভোগ মোক্ষদম্ ।
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং বা পঠেদ্ যদি ॥
অথবা রজনীকালে নির্জনে শিবসন্নিধৌ ।
যঃ পঠেৎ সাধক শ্রেষ্ঠঃ স এব শ্রীসদাশিবঃ ॥
কৃষ্ণাং চতুর্দশীং প্রাপ্য পঠেদ্ভক্তি পরায়ণঃ ।
স এব সর্বসিদ্ধীশো জায়তে ভূমিমণ্ডলে ॥
চতুর্দশ্যামমায়াং বা সোমবারে বিশেষতঃ ।
যঃ স্বয়ং তৎপ্রদোষে তু পূজয়িত্বা স্তবং পঠেৎ ॥
তস্য সঙ্গে মহেশানি তিষ্ঠামি চ সদা প্রিয়ে ।
যং যং কাম মুপস্কৃত্য পঠেৎ স্তোত্রমনুত্তমম্ ॥
তং তং কামম বা প্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে বিদেশে শত্রুসঙ্কটে ॥
বনমধ্যে রণমধ্যে সভামধ্যে তথৈব চ ।
রাজদ্বারে মহারোগে মহাশোকে মহাভয়ে ॥
সর্বত্রৈবাশুভং হন্তি স্তবপাঠ প্রসাদতঃ ।
আকর্ষণবশীকার্য মারণোচ্চাটনাদিকম্ ॥
শান্তি পুষ্টি স্তম্ভনানি পাঠমাত্রং প্রজায়তে ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥
বহু কিং কথ্যতে দেবি শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ।
অসাধ্যং সাধয়েৎ সর্বং স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥
অহঞ্চ জগদাধারো মমধারস্ত্বমেব হি ।
তৎসমা প্রকৃতির্নাস্তি মৎসমো নাস্তি পুরুষঃ ॥
তব যোনিং সমাসাদ্য সর্বমেব করোম্যহম্ ।
এতজ্ জ্ঞানং মহেশানি পাষণ্ডে মা বদেৎ ক্বচিৎ ॥
মূর্খায় ভক্তিহীনায় দুষ্টায় সুদূরাত্মনে ।
শিবভক্তি বিহীনায় শক্তিনিন্দাপরায় চ ॥
ন প্রকাশ্যং মহাদেবি প্রকাশাচ্ছিবহা ভবেৎ ।
শিবায় ভক্তিযুক্তায় শিববিষ্ণু পরায় চ ॥
শতনাম মহাস্তোত্রং দেয়ং পণ্যং মহেশ্বরি ।

ওঁ নমঃ শিবায়ঃ

শিবরাত্রি মাহাত্ম্য

শিব একদা পার্বতীকে বলেছিলেন, "দেবি! গৌণ ফাল্গুণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির অন্ধকারময় রাত্রিকে 'শিবরাত্রি' বলে। এই দিন, যে ভক্ত উপবাসে থেকে আমার পূজা করে সে আমাকে নিশ্চয়ই পরিতুষ্ট করে থাকে। এই শিবরাত্রি তিথিতে উপবাসী থেকে ব্রত-উদ্যাপন করলে আমি যেমন তুষ্ট হই তেমন স্নানেও হই না, বস্ত্রেও হই না, ধূপেও হই না, পূজাতেও হই না এবং পুষ্পেও হই না। পূর্ব দিন ত্রয়োদশীতে স্নান করে ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হয়ে ভক্ত নিরামিষ বা হবিষ্য একবার মাত্র আহার করে শুদ্ধ শরীর হবে ও সর্বদা আমার ভাবনায় শুদ্ধ মনা হবে। আমার পূজায় সর্বপ্রকার পুষ্পের চেয়ে বিল্বপত্রই শ্রেষ্ঠতম। বিল্বপত্রে আমার যেমন তৃপ্তি হয় অন্য কোন বস্তুতে তেমন হয় না। রাত্রে পাষাণ নির্মিত অথবা মৃন্ময় বা ধাতুময় শিবলিঙ্গে চার প্রহরে চারবার পূজা করতে হয়। প্রথম প্রহরে দুগ্ধ, দ্বিতীয় প্রহরে দধি, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত ও চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে স্নান করিয়ে স্নানান্তে অর্ঘ প্রদান করতে হবে। কেবলমাত্র জল ও বিল্বপত্রেও পূজা করা চলে। দশোপচারে পূজা করে বিসর্জন কার্য করতে হয়। পাষাণ নির্মিত লিঙ্গে বিসর্জন করতে নেই। বিসর্জনের পর শিবরাত্রি ব্রতকথা শ্রবণ করে ব্রতের দক্ষিণান্ত করতে হয়। পরদিন ভক্ত সদাচার ব্রত ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে নিজে পারণ (উপবাস ভঙ্গ) করবে। সেদিনেও সংযত জীবন-যাপন করতে হবে—সংযত আহার গ্রহণও করণীয়।

পরিষ্কার বোঝা যায় এই পূজা বিধি মানুষকে নিষ্ঠাবান করার জন্য আচার বিচারের নিগড় দ্বারা বদ্ধ করা এক পদ্ধতি। আন্তরিক ভক্তির উপাচারেই আসলে শিব তুষ্ট হন।

শিবপুরাণে শিবরাত্রির পৌরাণিক উপাখ্যান বিবৃত আছে। ঋষিগণ ব্যাসশিষ্য সূতমুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সর্বপ্রথম এই শিবরাত্রি ব্রত কে উদ্যাপন করেন। তাঁরা আরও জিজ্ঞাসা করলেন যে, অজ্ঞানতা-বশতঃ যদি কেউ শিবরাত্রিতে এই ব্রত করে তবে তার কি ফল হয়। ঋষিগণের জিজ্ঞাসার উত্তর হিসেবে মুণি সূত তাঁদের গুরুদ্রুহ ব্যাধের কাহিনী শোনালেন।

বহুকাল আগে গুরুদ্রুহ নামে এক নিষাদ অরণ্য মধ্যে আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে বাস করত। নিষাদ শিকারী ছিল আবার লুঠেরাও ছিল। মৃগয়া দ্বারা যেমন সপরিবারে জীবন নির্বাহ করত তেমনই অরণ্য মধ্যে

পথিককে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার সর্বস্ব লুঠ করে নিত। গুরুদ্রুহ জীবনে কোন ভাল কাজ করেনি তবে কপটচারী ছিল না। একবার ছিল মহাশিবরাত্রির পবিত্র দিন। নিষাদ এ দিনের মাহাত্ম্য জানতো না ও সে শিবভক্তও ছিল না। গৃহে তার মাতা-পিতা, স্ত্রী সকলে বলল যে, তারা ক্ষুধার্ত, সে যেন শীঘ্র কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে আনে। নিজ পরিবারের লোকেরা ক্ষুধার্ত আছে জেনে গুরুদ্রুহ মৃগয়ার জন্য ধনুক বাণ নিয়ে বনে গমন করল। অরণ্য মধ্যে বিস্তর ঘুরে ফিরেও দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন কোন শিকারের দেখা সে পেল না। যখন সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে অরণ্য গভীর অন্ধকারে ছেয়ে গেছে তখন গুরুদ্রুহ সচকিত হল—তাই তো এখন সে কি করবে কোথায় যাবে, পিতা-মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রী গৃহে ক্ষুধায় কাতর হয়ে কষ্ট পাচ্ছে—হায় দুর্ভাগ্য তার, এখনও কোন আহার্য জোগাড় করা গেল না। কিন্তু এদের জন্য কিছু আহার্য নিয়ে যেতেই হবে তাকে। এই কথা ভাবতে ভাবতে একটু এগিয়ে যেতেই নিষাদ সম্মুখে এক জলাশয় দেখতে পেল। তখন সে চিন্তা করল যে, এখানে রাতে শ্বাপদরা নিশ্চয়ই জল পান করতে আসবে আর তখন সে তাদের বাণবিদ্ধ করে আহার্য সংগ্রহ করতে পারবে। মনে এই চিন্তা করে গুরুদ্রুহ একটি ভাণ্ডে কিছু পানীয় জল নিয়ে নিকটে এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করে শিকারের অপেক্ষা করতে লাগল। ঐ বেল গাছের গোড়ায় এক শিবলিঙ্গ প্রোথিত ছিলেন। ক্রমে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হল। একটি মৃগী দেখা গেল সরোবরে জল পান করতে আসছে। মৃগী জলাশয়ের কাছে এলে উৎফুল্ল ব্যাধ ধনুকে টঙ্কার দিয়ে শর-সন্ধানে নিযুক্ত হল। সে গাছের উপর নড়াচড়া করায় পাত্র থেকে কিছু জল ও গাছ থেকে কিছু বিল্বপত্র নীচে শিবলিঙ্গের শিরোপরি পড়ল। এ ভাবেই অজ্ঞাতে উপবাসী ব্যাধের শিবরাত্রির প্রথম প্রহরের শিবপূজা হয়ে গেল। ধনুকের টঙ্কারে চমকে উঠে হরিণী দেখলো যে, এক ভয়ঙ্কর ব্যাধ তাকে বধ করার জন্যে উদ্যত হয়েছে। তখন ভয়ার্ত মৃগী ব্যাধকে উদ্দেশ্য করে বলল, "হে ব্যাধ, আপনি কি কারণে আমার প্রাণ হরণে উদ্যত হয়েছেন?"

ব্যাধ বলল, "আজ গৃহে আমার পরিজনরা অভুক্ত রয়েছে। আমি তোমার মাংসে তাদের ক্ষুধা দূর করবো।"

মৃগী ভাবলো যে, তার বাঁচার জন্য কোন রাস্তা বার করা দরকার। সে বিনীত কণ্ঠে ব্যাধকে জানাল, "হে নিষাদ শ্রেষ্ঠ! আমার এই অপ-

দার্থ শরীর যদি আপনার উপকারে লাগে তো তার তুল্য আমার পুণ্য-কর্ম আর কি আছে! কিন্তু আপনার কাছে আমার একটি বিনীত নিবেদন যে, আমি আমার বাচ্চাদের একা ফেলে এসেছি, তাদের আমার ভগিনী কিম্বা স্বামীর কাছে রেখে আসতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দিন, আমি কার্য সমাধা করেই ফিরে আসব।"

মৃগীর এই ব্যাকুল প্রার্থনায় ব্যাধের মন টলেনা, সে শর নিক্ষেপে তৎপর হয়। তখন অনন্যোপায় মৃগী মিনতিমাখা কণ্ঠে বলে, "হে নিষাদ! আমি শপথ করে বলছি যে, আমার কথার নড়চড় হবেনা। যদি আমি আমার বাক্য পালন না করি তবে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা আহ্নিক না করা জনিত পাপ, পত্নীর পতি-আজ্ঞা পালন না করা জনিত পাপ এবং শিব সমক্ষে প্রতারণার জন্য যে পাপ, আমি সে সকল পাপের ভাগী হব।" হরিণীর এই কথা শুনে গুরুদ্রুহ তাকে বিশ্বাস করে গৃহে যেতে দিলে সে জল পান করে প্রসন্নচিত্তে ফিরে গেল।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলে হরিণীর ভগিনী তার অন্বেষণে সেই জলাশয়ের ধারে এল। তাকে দেখে ব্যাধ শর নিক্ষেপে তৎপর হল। এবারেও নড়াচড়ায় গাছ থেকে বেলপাতা ও জলপূর্ণ পাত্র থেকে কিছু জল নীচে শিবলিঙ্গের উপর পড়ল। এইভাবে অজ্ঞাতে শিব রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের পূজা হয়ে গেল। ধনুকের টঙ্কার শুনে দ্বিতীয় মৃগী ব্যাধকে বলল. "হে নরবর! আপনি কি করছেন? আমাকে কি হত্যা করতে চান? ব্যাধ তাকে পূর্ববৎ বলল, "তোমার শরীরের মাংসে, আমার ও পরিজনের ক্ষুধার নিবৃত্তি করব।"

ব্যাধের কথা শুনে মৃগী বলল, "ওহো আমার কি সৌভাগ্য! এ ছার শরীর ধারণ করা আজ যথার্থ সফল হবে কারণ অকিঞ্চিৎকর এ দেহ আপনার কাজে লাগবে। কিন্তু, হে নিষাধ শ্রেষ্ঠ! তার আগে আপনার কাছে আমার এক সামান্য নিবেদন আছে। আমার বাচ্চারা অসহায় অরক্ষক অবস্থায় রয়েছে, আমি তাদের আমার স্বামীর কাছে রেখে এখনই ফিরে আসছি। অনুগ্রহ করে আমায় আপনি গৃহে যাবার অনুমতি দিন।" তার কথা শুনে গুরুদ্রুহ ব্যাধ বিরক্ত হয়ে বলল, যে সে এসব অবান্তর কথা শুনতে চায় না এবং সে এখনই তার প্রাণ সংহার করবে। তখন হরিণী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বিনম্র বচনে বলল, "হে ব্যাধ! আমি আমার কথা মত যদি না ফিরে আসি তবে মাতা-পিতাকে সেবা না করলে, বিবাহিত হয়ে পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হলে ও

শিবনিন্দা করলে যে সকল ঘোর পাপ হয় আমি সেই সকল পাপের ভাগী হব। আমার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হবে।" হরিণীর এইরূপ শপথ পূর্ণ বাক্য শুনে ব্যাধ ধনুক বাণ নামিয়ে বলল, "আচ্ছা যা, তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু।" হরিণী জল পান করে গৃহে ফিরে গেল।

এদিকে হরিনীদের না ফিরতে দেখে গুরুদ্রুহ সংশয়-ব্যাকুল চিত্তে কালগুণতে লাগল এবং স্থির করল বৃক্ষ হতে অবতরণ করে ওদের অন্বেষণ করবে। ঠিক সেই সময় সে একটি মৃগকে আসতে দেখলো। হৃষ্টপুষ্ট মৃগটি কাছে এলে সে তাকে ঠাহর করে ধনুক বাণ উত্তোলন করল। নড়া-চড়ায় এবারও গাছ থেকে বিল্বপত্র ও গাছের উপর রাখা জলপাত্র হতে জল নীচে শিবলিঙ্গের শিরোপরি বর্ষিত হল। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় প্রহরও শেষ হল রজনীর। এভাবে অজ্ঞাতসারে তৃতীয় প্রহরের পূজা সমাপণ করল নিষাদ গুরুদ্রুহ। ধনুকের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে মৃগ দেখল ব্যাধ শরসন্ধানে রত। তাড়াতাড়ি মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল, "হে ব্যাধ শ্রেষ্ঠ! এ আপনি কি করছেন। দয়া করে আমার প্রাণ হরণ করবেন না।" ব্যাধ সে কথা শুনে উত্তরে বলল, "হে বনচর পশু। আমি আমার পরিবারবর্গের পোষণের জন্য তোমায় হত্যা করে তোমার দেহমাংস আহরণ করতে চাই।" নিষাদের কথা শুনে মৃগ প্রসন্ন চিত্তে বলে, "আমার কি সৌভাগ্য! এই ভঙ্গুর শরীর মহৎ কাজে লাগবে এই কথা জেনে আমি কৃতার্থ হলাম। যার দ্বারা কারও কোন উপকার হয়না তার জীবন ব্যর্থ। তবে আপনার কাছে আমার এক সামান্য প্রার্থনা আছে। আমি আমার বাচ্চাদের ও স্ত্রীকে কিছু উপদেশ দিয়ে আসতে চাই যাতে আমার অবর্তমানে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। আপনি দয়া করে আমায় গৃহে যেতে আজ্ঞা করুন।"

মৃগের কথা শুনে ব্যাধ পরুষ কণ্ঠে বলে, 'এর আগে আরও দুই হরিণী আমাকে এই রকম কথা বলেছে—আমি তাদের ছেড়ে দিয়েছি ঘর থেকে আবার ফিরে আসবে এই কথা পেয়ে। কিন্তু কই এখনও তাদের দেখা নেই। তুইও আমায় বোকা বানিয়ে চলে যাবি, না তোকে ছাড়বো না। তুইও প্রাণ সঙ্কট দেখে অসত্যের আশ্রয় নিয়ে পালাতে চাস! হে বনচর হরিণ, তুইই বল এভাবে আমার জীবনইবা চলবে কি ভাবে?"

ব্যাধের কথা শুনে মৃগ বলল, "হে ব্যাধ! আমি কখনও অসত্য বলিনা কারণ মিথ্যাবাদীর সমস্ত পুণ্যফল নষ্ট হয়। সত্যের প্রবল

প্রভাবেই অখিল ব্রহ্মাণ্ড চলছে। সন্ধ্যার সময় মৈথুনে রত হওয়া, শিব-রাত্রিতে ভোজন করা ও শিবাচর্ণ না করা জনিত মহাপাপ যেন আমায় স্পর্শ করে, যদি আমি আমার কথা না রাখি।"

মৃগের কথা শুনে ব্যাধ বলল, "বেশ তুই তবে ঘরে যা, শিগ্‌গির ফিরিস কিন্তু।" মৃগ জলপান করে তার আস্তানায় ফিরে গেল। সেখানে তুই হরিণী ও হরিণ তিনজনই ব্যাধের কথা আলোচনা করল এবং তারা স্থির করল যে, সত্য পালনের জন্য তাদের তিনজনেরই ব্যাধের কাছে ফিরে গিয়ে নিজেদের সমর্পণ করা উচিৎ। এই মনস্থ করে তারা নিজেদের শিশুসন্তানগুলিকে প্রতিবেশীদের কাছে সমর্পণ করে নিষাদ গুরুদ্রুহের কাছে ফিরে চলল। এদিকে সন্তানরাও স্থির করল যে,তাদের পিতা-মাতার পদাঙ্ক তারাও অনুসরণ করবে। এই স্থির করে তারাও সেই জলাশয়ের দিকে চলতে লাগল।

সরোবরের দিকে হরিণগুলিকে আসতে দেখে ব্যাধ শর নিক্ষেপের জন্য ধনুক উত্তোলন করলে এবারেও তার নড়াচড়ায় গাছ থেকে বেল পাতা ও মৃৎভাণ্ড থেকে জল পড়ল শিবলিঙ্গের মাথায়। এইভাবে চতুর্থ প্রহরের শিবপূজাও সমাপন করল ব্যাধ নিজের অজ্ঞাতে। এই সময় মৃগরাও সেখানে এসে উপস্থিত হল ও ব্যাধের উদ্দেশ্যে বলল, "হে ব্যাধ শ্রেষ্ঠ! আমরা এসেছি, এখন আপনি আমাদের দেহগুলি গ্রহণ করুন।

হরিণগুলির ফিরে আসা ও তাদের এ-ধরনের কথা শুনে শিবার্চন প্রভাবে পরিবর্তিত হৃদয় নিষাদ বড়ই আশ্চর্য বোধ করল। অজ্ঞাতে হলেও শিবপূজন হেতু তার দুর্লভ আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। সে মনে মনে চিন্তা করল যে, পশুযোনিতে উৎপন্ন হলেও এই মৃগদের জন্ম সার্থক, কারণ সত্য পালনের এক স্বাভাবিক প্রেরণা রয়েছে এদের আর এরা অন্যের উপকারের জন্যে জীবনদানেও উন্মুখ। অন্যপক্ষে নিষ্ঠুর প্রাণ সে অন্যকে ধ্বংস করে নিজেকে ও পরিবারবর্গকে জীবিত রাখতে উৎসাহী! ছিঃ ছিঃ, কি ঘোর স্বার্থপরতার ও পাপের কাজ সে করে চলেছে! ধিক্ তাকে! শুদ্ধচিত্ত ব্যাধ মৃগগুলিকে বলল, "তোমাদের সত্যনিষ্ঠায় আমি জ্ঞান লাভ করলাম আমারও চোখ খুলল। আমি এখন থেকে পাপাচরণে বিরত হলাম। তোমাদের মুক্তি দিলাম। তোমরা ফিরে যাও ঘরে।" এই কথা বলে গুরুদ্রুহ ধনুকবান ভূতলে নিক্ষেপ করলো। নিষাদ যখন এই কথা বলল তখনই শঙ্কর ভগবাণ প্রসন্ন হয়ে তাকে দর্শন দিয়ে বললেন, "বৎস গুরুদ্রুহ তোমার শিবরাত্রের ব্রত পালন ও

শিবপূজনে আমি তুষ্ট হয়েছি, প্রীতিলাভ করেছি তোমার আত্মিক ঊর্ধ্বগামিতায়, তুমি বর প্রার্থনা কর।"

শিবদর্শনেই নিষাদের চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়েছে। সে কৃতাঞ্জলি-পুটে বলল, "প্রভু, আপনার দর্শন পেয়ে আমার সবই লভ্য হয়েছে। আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই। আমি আপনার কৃপা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি।"—মহাদেব নিষাদের উপর আরও প্রসন্ন হয়ে গুরুদ্রুহকে দিব্য বর দিলেন ও বললেন, "হে ব্যাধসুত। আজ থেকে তোমার নাম 'গুহ' হল। এই শৃঙ্গবেরপুরে রাজধানী স্থাপন করে রাজ্য কর। ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র তোমার গৃহে পদার্পণ করবেন।"

হরিণ ও হরিণীরাও শিব দর্শন করে শিব লোকে গেল। ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে ব্যাধেরও মুক্তি হল। বিল্ব বৃক্ষের নীচে যে শিবলিঙ্গ অবস্থিত ছিলেন তাঁর নাম হল ব্যাধেশ্বর। অজ্ঞাতভাবে শিবরাত্রি ব্রত উদযাপন করে নিষাদ গুরুদ্রুহের মুক্তি লাভ বা শিবত্ব প্রাপ্তি হয়েছিল। তাহলে যাঁরা শিবপরায়ণ ভক্ত তাদের শিবরাত্রে শিবপূজায় পরমকল্যাণময় মহেশ্বরের আশীষ লাভে ঈশ্বর লাভ হবে সে বিষয়ে আশ্চর্যের কি আছে!

কাহিনীটিকে যদি শুধুমাত্র কল্পকথা মনে করা হয় বা যদি কেবল শিব মাহাত্ম্য প্রচারের গাল্পিক যন্ত্র ভাবা হয় তবে সে সিদ্ধান্ত যথার্থ নাও হতে পারে। শিব ও শিবরাত্রির মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করাই হয়ত কাহিনীর উদ্দেশ্য—মানুষের পাপবোধ জাগ্রত করে তার থেকে বিরত হতেও হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে এ ইঙ্গিত দেয় বা শিবরাত্রি উদযাপনের মধ্য দিয়ে সমাজ ও মানবের কল্যাণকর দিকের দিকে পথ নির্দেশ করে। কিন্তু এ কাহিনীর একটি বিশিষ্ট দিকও আছে। জীবের মধ্যে যে শিব সদা স্থিত রয়েছেন তার আভাষ জগতের সর্বস্তরে। সর্বত্র শিব বিরাজিত তাঁরই মধ্যে জগৎ সংসারের অবস্থিতি। পরমেশ্বর তিনি—তাঁর চিন্ময় বিভূতিই মহাশক্তির বিকাশ এবং সেই শক্তি তরঙ্গে জীব-জগৎ ভেসে চলেছে মহাকালের ভেলায়। জাগতিক বিভিন্ন শক্তির অভিব্যক্তিই মহাশক্তির বিকাশ—আবার মহাশক্তি তরঙ্গের সঙ্গে মিলনেই তার চরম পরিণতি যা হল সাযুজ্য লাভ—ঈশ্বর প্রাপ্তি—অশেষত্ব।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে যে ব্যাধ ও বনচর প্রাণী নিয়ে গঠিত কাহিনী জাতি ও শ্রেণীধর্ম নির্বিশেষে শিব যে এই চৈতন্যময় বিশ্বের আকর বিশ্বনাথ এ ইঙ্গিত যেমন দেয় তেমনই শিব

বনবাসী অ-নার্য দেবতা তেমন একটি ইঙ্গিতও যেন প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে।

শিবরাত্রির ব্রত হিন্দুদের সকল পূজা ও পার্বণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই কথা বলেছে শাস্ত্র। নরনারী নির্বিশেষে নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে এই ব্রত উদ্‌যাপন করলে চিন্ময়সত্তা বিশিষ্ট হয়ে অবশ্যই সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রাণে পেয়ে থাকে ও মুক্ত হয়। পার্থিব কামনা নিয়ে শিবব্রত করলে শিব তার সে কামনাও পূর্ণ করেন। এই ব্রতে দুঃখ, দৈন্য ও অশান্তি দূর হয়।

পুরাণে কথিত আছে একদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা মহাদেবকে শ্রেষ্ঠ আসনে অভিষিক্ত করে পূজা করেছিলেন। শঙ্কর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বলেছিলেন, "আজ এই মহা পুণ্যদিনে আপনাদের পূজায় ও উৎসবে আমি পরম তৃপ্তি লাভ করেছি। এইদিন মহা পবিত্রদিন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এই তিথি আমার প্রিয়। তাই 'শিবরাত্রি' নামে অভিহিত হবে। এই সময় যে আমার লিঙ্গমূর্তির পূজা করবে সে জগতের সর্ববিধ কর্ম করতে সক্ষম হবে। নিরন্তর এক বর্ষ আমার আরাধনা করলে যে ফললাভ হয় একদিন 'শিবরাত্রি'র পূজায় সে একই ফল লাভ হয়।"

মহেশ্বর আরও বললেন, "যেমন চন্দ্রকরে সমুদ্র স্ফীত হয় সেইরূপ শিবরাত্রি আমার বৃদ্ধির সময়। স্তম্ভরূপে আমার আবির্ভাব মার্গশীর্ষ আদ্রানক্ষত্রে সুতরাং মার্গশীর্ষ আদ্রানক্ষত্রে যে পার্বতীসহ আমার লিঙ্গমূর্তি দর্শন করে সে আমার প্রিয় হয়।"

এদিন শিবলিঙ্গ পূজার ফল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যে ব্যক্তি লিঙ্গতে আমার লিঙ্গেশ্বর ভাবনা রেখে অর্চনা করে সে সালোক্য সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তির ফল লাভ করে।

শিবপূজা

পূজা বা অর্চনা করা অর্থে বোঝায় কোন বিশেষ শক্তি বা ভাবকে মূর্ত করে প্রাণের মধ্যে তাকে গ্রহণ করা। হৃদয় বীণার তারে তারে সেই ভাব কম্পনকে মিলিয়ে অনুরণন তুলে তারই অনুরূপ হয়ে উঠা। মহৎ গুণান্বিত কোন বিরাট সত্তাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে সত্য-শিব-সুন্দরকে উপলব্ধি করা—সৎচিৎ আনন্দকে অনুভব করা যাকে বলে ভূমা উপলব্ধি। ভক্তি বিনম্র চিত্তে নিবেদিত

প্রাণ হয়ে সেই মূর্ত প্রতীক বিগ্রহের চৈতন্যময় সত্তাকে অনুভব করা। কিন্তু এ কার্য কেন সমাধা করবে মানুষ? প্রশ্নের উত্তর হল জীবনকে সার্থক করার গরজেই তাকে এ কাজ করতে হবে। ঈশ্বর লাভই মানব জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য—ঈশ্বর যিনি সত্য-শিব-সুন্দর, যিনি সচ্চিদানন্দ। পরমব্রহ্ম ঈশ্বরই জগৎ-কারণ ও জগৎ-কারক। আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়েই তিনি উপলব্ধ হন আর ঈশ্বরের প্রতীক মূর্তিকে পূজা বা উপাসনা করা অত্মোপলব্ধির এক সহজ সোপান। জগৎলীলায় ঈশ্বরই মূর্তি বা প্রতীকরূপে মূর্ত হয়েছেন—তিনিই মানুষের প্রাণে পূজার প্রেরণা জাগাচ্ছেন, পূজোপকরণ যোগাচ্ছেন আবার তিনিই তাঁর পূজা গ্রহণ করছেন, তাঁরই সৃষ্ট জীবের কাছ থেকে তার প্রাণে তাঁরই স্বরূপ প্রকটিত করে। এই চেতনার স্পর্শে অন্তর আলোকিত করে ভাবমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন.—

"ফুলের মত আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ, এই তো তোমার দান!
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি,
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি'।
তুমি নিজ হাতে তারে তুলে লও স্নেহে হাসি',
দয়া করে প্রভু রাখো মোর অভিমান।"—

পরমব্রহ্ম ঈশ্বর আবাঙ্ মানস গোচর অ-রূপ ও নির্গুণ সত্তা বিশিষ্ট, কিন্তু এই নির্গুণ ব্রহ্মকে সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করা সাধারণ নরনারীর পক্ষে সহজ সাধ্য নয়। মন ও ইন্দ্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করতে পারে না। তাই ঈশ্বর মানবের কল্পনায় সাকার ভূত হলেন যে রূপ-পূজায় মানুষ নির্গুণ পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করল। তাই ভগবানের সাকার ও নিরাকার রূপ দুইই সত্য। মূর্তি বা প্রতীক-উপাসনার মধ্য দিয়ে নিজ ধ্যান রূপকে মূর্ত করে মানুষ সাযুজ্য লাভ করল। এখন জিজ্ঞাস্য প্রতীকোপাসনার আঙ্গিকে ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য তাঁর পূজা করা কেন? কারণ পূজা বা উপাসনা বা স্তবার্চনার দ্বারা মন এক পবিত্র অধ্যাত্ম পরিমণ্ডলের মধ্যে একাগ্রতা নিয়ে তাঁর ধ্যানে সহজে নিমগ্ন হতে পারে।

পরমেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব মূর্তি বা লিঙ্গ প্রতীকে আমাদের মাঝে প্রতিভাত হয়েছেন তাঁকে অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে পূজার মাধ্যমে আমরা যেন সহজে উপলব্ধি করতে পারি এরই জন্য। শিবপূজা দেবাদিদেব

মহাদেবের পূজা যিনি বিশ্বেশ্বর, জগৎ সংসার যাঁর মধ্যে ওতঃ প্রোত— যিনি জগতের সঙ্গে একীভূত। সেই বিরাটকে পূজা করা আসলে প্রাণে তাঁকে আবাহন করা।

শিবপূজার রূপ ও ভাবকে দুই বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই স্তর বিভাগে মূলগত পার্থক্য কিছু নেই—প্রকৃতিগত ও তাৎপর্যগত পার্থক্য আছে। এই দুই স্তর-বিভাগ হল :—

(১) স্থূল রূপ ও স্থূল ভাবের পূজা।

(২) সূক্ষ্ম রূপ ও সূক্ষ্ম ভাবের পূজা।

ভয় বা আশঙ্কায় কম্পিত হয়ে আপনাকে রক্ষার জন্য ঈশ্বরের যে পূজা, পার্থিব কামনা বাসনা পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা এগুলি স্থূলরূপের পূজারতি কিন্তু অলীক বা নিস্ফল কিছু নয়। পূজা যদি আন্তরিক হয় তবে ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। এপূজাও নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে শান্তম্‌কে চিনিয়ে শিবম্ অর্থাৎ মঙ্গলকে আনে আমাদের জীবনে। আর নিষ্কাম পূজারতি শুধু প্রাণে শিবকে প্রতিষ্ঠিত করে অদ্বৈতম্‌কে লাভ করা নয় নিজেই শিব হওয়া। মানুষের বোধে বা তার পূজার্চনায় পরমেশ্বরের সাকাররূপ মূর্ত হয়ে তাকে স্বরূপোলব্ধির মধ্যে দিয়ে অদ্বৈতমকে চিনিয়ে দেয় এই শিবারতি।

স্থূলরূপের পূজায় দেবতার প্রত্যক্ষ সাকাররূপ আবাধিত, বিশেষ পূজোপকরণ অর্পিত যে গুলিকে মনে হয়েছে ঈশ্বরকে নিবেদন করলে তিনি প্রীত হবেন ও সে নিজে ধন্য হবে। আর তার সঙ্গে আছে প্রাণের ভক্তি পীযুষ, কিছু আচার ও বিচার সংস্কার যা তার ভাবনার রূপ এছাড়া আছে শিবমন্ত্র-শিবস্তোত্র। এই সংস্কার বদ্ধ পূজানুষ্ঠান নানা বিধি-নিষেধের নিগড়বদ্ধ নিয়ম নিষ্ঠার শান্তি জলে পরিষিক্ত তাই ভক্তি উপাচারের মধ্যে প্রাণে সত্যম শিবম্‌কে পরিস্ফুট করে। হয়ত মহাশক্তির তরঙ্গ মালায় বিভিন্ন শক্তির বিকাশ এভাবেই ঘটে থাকে যা জড় ও জীবনে সমাহিত।

সূক্ষ্মরূপের পূজায় হৃদয়ের অমলিন ভক্তি ছাড়া যোগ্য উপাচার আর কিইবা আছে। মানস পূজাও এ ধরণের পূজার অঙ্গ। ধ্যানের মধ্যে, প্রার্থনার মধ্যে প্রাণের গভীরে প্রত্যক্ষ হন বিশ্বম্ভর শিব।

সে জন্য শিব অর্থাৎ পরমেশ্বরকে শান্তি ও কল্যাণের মধ্য দিয়ে লাভ করার জন্য তাঁর পূজার্চণার রীতি পদ্ধতি, ক্ষেত্র ও সময় বা লগ্ন যেগুলি প্রচলিত আছে সেগুলি যেমন পালণীয় (সেগুলি আচার বিচারের

মধ্য দিয়ে উৎপন্ন কুসংস্কারের কর্দমে যদি কলঙ্কিত হয়ে থাকে তবে সে কুসংস্কারকে যুক্তি ও ভাববিহ্বলতা মুক্ত ভক্তির আলোয় শুদ্ধ করতে হবে) তেমনই ভক্তি ভালবাসার নৈবেদ্য সাজিয়ে মহেশ্বরের পূজা সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালে ও সর্বক্ষণে হাঁ—নার শত শাসন না মেনেও করা যায় এবং সে পূজাও যেমন স্বাভাবিক তেমনি পরম বরণীয়। তাঁকে প্রাণের মধ্যে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ডাকাই সেখানে নিয়ম, প্রাণের গভীরে অনুভব করে তাঁকে পাওয়াটাই সেখানে একমাত্র কাম্য। জীবের এই কৃত্যের জন্য শিব স্বয়ং আকাঙ্খিত— দুহাত ভরে আমাদের হৃদয়ের ভক্তি পুষ্পের অঞ্জলি গ্রহণ করবেন বলেই তিনি দু'হাত বাড়িয়ে আছেন—এতো তাঁরই লীলা বিলাস।

তিনি বহু হয়েছেন আবার এক হবেন বলে—বিশ্ব পিতার এ লীলায় জীব জগতের প্রতিটি অণু পরমাণুই অংশী। এ নিমিত্তই আমাদের শিব আরাধনা। এই রহস্যময় সত্য একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে যার সেই মানুষের প্রাণেই উদ্ভাসিত হয়।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শিবলিঙ্গের পূজা বহুকাল ধরে চলে আসছে। স্কন্দ পুরাণে লিঙ্গ শব্দের অর্থ এইরূপ আছে ঃ—

"আকাশং লিঙ্গ নিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গ মুচ্যতে।"

আকাশকে লিঙ্গ বলা হয়, পৃথিবী তার আসন। সর্ব দেবতার আলয় ও লয় স্থান বলে লিঙ্গ শব্দে অভিহিত করা হয়। বেদে পৃথিবী মাতা ও আকাশ, পিতা রূপে কল্পিত হয়েছে—দৌঃপিতা পৃথিবী মাতা। আকাশ সর্বব্যাপি এবং সূক্ষ্মতম মহাভূত। আকাশকে জগৎ পিতার প্রতীক ও পৃথিবীকে জগৎ মাতার প্রতীক বলে উপাসকগণ বিশ্বব্যাপি লিঙ্গে বিশ্বের জনক জননীর অর্থাৎ শিব শক্তির পূজা করে আসছেন। যজুর্বেদ সংহিতায় উল্লিখিত আছে—

"অশ্মা চ মে, মৃত্তিকা চ মে, গিরয়শ্চ মে, পর্বতাশ্চ মে, সিকতাশ্চ মে, বনস্পতয়শ্চ হিরণ্যঞ্চ মে, অপশ্চমে, শ্যামংচ মে, লোহঞ্চ মে, সীসঞ্চ মে, ত্রপুচ মে, যজ্ঞেন কল্পতাম্।" প্রস্তর, মৃত্তিকা, গিরি পর্বত, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি, শিলা ও ধাতু দ্বারা নির্মিত হবে তাঁর মূর্তি এই তাঁরা বেদের পরমপুরুষের আদেশ হিসেবে জানিয়েছেন।

প্রস্তর বা ধাতু মূর্তিতে শিবের আরাধনা করায় এই প্রস্তর বা ধাতুময় বিগ্রহকে শিবলিঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে। শিবলিঙ্গ রহস্য

সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। অথর্ববেদে ঋষি প্রার্থনা করেছেন, এহ্যশ্মানমাতিষ্ঠাশ্মা ভবতু হে তনুঃ"—হে পরমেশ্বর! তুমি এই শিলাখণ্ডে এসে বিরাজিত হও, এই পাষাণ তোমার চৈতন্য-শরীর হোক। প্রস্তরলিঙ্গ নিম্নপ্রকার ভাগে ভাগ করা হয়।

বাণলিঙ্গ

পুণ্য সলিলা নর্মদার জলে যেসকল বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায় সেগুলিকে শাস্ত্রে বাণলিঙ্গ আখ্যা দেওয়া হয়েছে; যথাঃ—নর্মদা জল মধ্যস্থং বাণলিঙ্গ মিতি স্মৃতম্।" আবার অপর এক শ্লোকে বলা হয়েছে—"নর্মদা দেবিকায়োশ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা।" সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি সম্মুখে।" অর্থাৎ নর্মদা, দেবিকা, গঙ্গা ও যমুনা এই সকল নদীতে বাণলিঙ্গ বিরাজিত।

অনাদিলিঙ্গ

সাধারণ প্রস্তরখণ্ড ও বাণলিঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের বহুস্থানে অনাদি-লিঙ্গ শিবের উপাসনা চলে আসছে। কোন কোন পুণ্য স্থানে প্রোথিত কোন লিঙ্গরূপ বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডের কোন আদি বা তল খুঁজে পাওয়া যায় না। পরমপুরুষ শিব সেই প্রস্তরখণ্ডে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। এইরূপ শিবলিঙ্গই আনাদিলিঙ্গ। অনাদিলিঙ্গের পূজার প্রবর্তন স্বয়ং স্বয়ম্ভু শিবই করে আসছেন।

জ্যোতির্লিঙ্গ

বিশিষ্ট দ্বাদশটি শিবলিঙ্গকে জ্যোতির্লিঙ্গ বলা হয় যেগুলিতে অনন্ত জ্যোতির্ময় শিব জগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে বিরাজিত। লিঙ্গমূর্তিতে শিবপূজা করা ছাড়াও শিবের অন্যরূপ মূর্তি যথা সাধারণ মনুষ্য মূর্তি শিব, শান্ত মূর্তি শিব, রুদ্র মূর্তি শিব, নটরাজ শিব, ত্রিমুখ-বিশিষ্ট শিব, চতুর্মুখী শিব, পঞ্চানন শিব, অর্ধনারীশ্বর শিব প্রভৃতি মূর্তিতেও শিব-আরাধনা করা হয়।

শিবপূজার বিধি

শাস্ত্রীয় দেবদেবীর জন্য শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী যে পুজা বিধি দেবাদিদেব মহাদেবের পূজাও সেই রকম শাস্ত্রীয় বিধিবদ্ধ। সোমবার

শিবপূজা প্রকৃষ্ট দিন হিসেবে মানা হয়েছে। বলা হয় সোমবার 'বাবার বার'। সোমবার মৌলবার অর্থাৎ চন্দ্রের বার। সেজন্য শস্ত্রাণুসারে মৌলবার অর্থাৎ সোমবারই শিবপূজার প্রকৃষ্ট দিন। বিশেষ করে যে সোমবার পূর্ণিমা দিন হয় সেটি শিব আরাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন

'কেদার মহাত্ম্যমে' [illegible] ত্রৈলোক্যনাথ শিবভক্ত মহারাজ মান্ধাতাকে সোমবারের পূজা [illegible] বলেছেন, "হে মান্ধাতা! প্রতি সোমবারে সোমব্রত অনুষ্ঠান [illegible]মার অত্যন্ত প্রিয়। মুক্তিলাভেচ্ছু মানুষ শ্রাবণের শুক্লপক্ষীয় সো[illegible]ব্রত পালন করবে, তা যদি সম্ভব না হয় তবে একটি সোমব্রত [illegible]দ্যাপন করবে তাহলে আমায় নিশ্চয়ই লাভ করবে।"

এ সম্পর্কে শিব পার্বতীকেও [illegible]—

"সোমবারে মহা পূজা লব্ধা[illegible] মানবৈঃ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো দেবী [illegible]াগমঃ"॥

—দেবি! তুমি বিশেষ করে পূ[illegible] সোমবারে শিবের মহা পূজা করো। মানবগণ যদি একটি [illegible] শিবপূজা করে তবে সব অপরাধ হতে মুক্ত হয় এতে কোন সন্[illegible]

([illegible] মাহাত্ম্যম ১ম খণ্ড)

সোম চন্দ্রের নাম—তিনি সোমনাথ [illegible]প্রিয়। চন্দ্র তাঁর শিরভূষণ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সূর্য[illegible]ন্দ্রকে জীবনদায়ী ও তমোনিবারক দেবতা হিসাবে পূজা করে এসে[illegible] বৈদিক যুগের আদিতে সূর্য রুদ্রদেবের আসন নিয়েছেন। পরবর্তীকালে শিবরূপে চন্দ্রশেখর চন্দ্রকে শিরভূষণ করেছেন। 'সোমরস' বৈদিককালে উৎসব ও পূজার অন্যতম প্রধান উপাচার ছিল। তাছাড়া সেযুগে চন্দ্র বংশীয়দের দ্বারা শিবের আবিষ্কার ও শিবপ্রচার ঘটে থাকলে চন্দ্র বা সোম শিব পূজার পক্ষে তাৎপর্যময় হতে পারে।

তবে শাস্ত্রমতে ও শিব-ইচ্ছায় সোমবার শিবপূজার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ দিন হলেও মনে হয় শিব-অর্চ্চনার জন্য যে কোন দিন, যে কোন সময়ই উপযুক্ত। আশুতোষ তাঁর সর্ববিধ পূজায় সদা সন্তুষ্ট। অবশ্য এই বোধ মানব-চেতনায় তখনই পরিস্ফুট হয় যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শিবময় মনে হয়। অন্যথায় নিয়ম আর সংস্কারের গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে পূজার ক্ষণ।

সোমব্রতের শাস্ত্রীয় বিধি হল ব্রত উদ্যাপনের পূর্বদিন নখ কেটে

গঙ্গা মৃত্তিকা দেহে লেপন করে স্নান করতে হয়। সেদিন নিরামিষ আহার বাঞ্ছনীয়। ব্রতের দিন ব্রহ্মচারী হিসাবে যাপন করা বিধেয়। সংযুক্ত চিত্তে প্রাতঃ স্নান ও প্রাতঃ সন্ধ্যা করে সংকল্প করতে হবে। ব্রতের দিন পূজার্চনার পর সর্বদা শিবধ্যানে কাটাতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিবপূজা ও ভোগের পর [illegible]ন্য ফলাহার করা চলে।

শিবপূজা উত্তরাস্য হয়ে করা [illegible]ধি। শিবলিঙ্গ না থাকলে জলেই পূজা করা চলে কিন্তু তাতে [illegible]ন বা বিসর্জন করতে হবে না। পাথরের শিবলিঙ্গে বিসর্জন করতে [illegible]। প্রথমে নিম্নোক্ত শিবধ্যান করতে হবে :—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং [illegible]রিলিভং চারুচন্দ্রা বতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জলাঙ্গং [illegible] বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সম [illegible]গণৈ র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজ[illegible]ভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্।

তারপর বিল্বপত্র, [illegible]প্রদান করে মন্ত্রোচারণে শিবপূজা করা হয়। শিবপূজা শেষে [illegible]কে প্রণাম নিবেদন করা হয় এই মন্ত্রোচ্চারণে :—

(ওঁ) মহ[illegible]হাত্মানং মহাযোগিমহেশ্বরম্।
মহাপাপ [illegible] মবারায় নমোনমঃ॥
(ওঁ) [illegible] বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুবে।
নমঃ পি[illegible]হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নমঃ [illegible]শূলহস্তায় দণ্ডপাশাসি পাণয়ে।
নমঃ স্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
ওঁ নমস্তে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামাণাং কামপুরামরাঙ্ঘ্রিনাম॥
ওঁ নমঃ শিবায়

শিবপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের কাছ থেকে তাঁর পঞ্চকৃত্যের বিষয় জানতে চাইলে শিব বলেছিলেন যে, তাঁর কৃত্য ও জ্ঞান দুর্লভ। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব, ও অনুগ্রহ এই তাঁর পঞ্চকৃত্য যা নিত্য সিদ্ধ। জগৎ-জীবনের উৎপত্তি হল সৃষ্টি,

সৃষ্টির বৃদ্ধি হল স্থিতি ; বহুত্ব, বিভেদত্ব ও মায়ার বিলয়ই হল সংহার এবং তাদের অবলুপ্তিই হল তিরোভাব অর্থাৎ নামহীন বা অস্তিত্বহীন হয়ে লয় প্রাপ্ত হওয়া। তারপর অনুগ্রহ অর্থাৎ শিবত্ব লাভ—আত্মার পরমাত্মায় লীন হওয়া। জগৎলীলায় জগদীশ্বরের এই পঞ্চকৃত্য। প্রথম চারটি কৃত্য জগতের কর্মধারার সৃ[illegible] অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ক্রিয়াশীল আর পঞ্চম যা মুক্তির কারণ স্বরূপ তা শি[illegible]ধ্যই স্থিতিশীল।
জলে স্থিতি, হুতাশনে সংহার[illegible] তিরোভাব ও আকাশে অনুগ্রহ—শিবের পঞ্চকৃত্যের এই পঞ্চ[illegible]। এই পাঁচ কৃত্যের কারণ স্বরূপ শিবের পঞ্চমুখ। উত্তর, দক্ষি[illegible]ও পশ্চিম এই চারিদিকে চার মুখ ও পঞ্চম আনন মধ্য ভাগে।

শিবের পঞ্চমুখ থেকে ও[illegible]মন্ত্রের উৎপত্তি যে দিব্যমন্ত্র সর্ব অহমিকা বিনাশ করে ও প্রকটিত[illegible] শিবস্বরূপ। উত্তর দিকের মুখ হতে আ-কার, পশ্চিম মুখ থেকে [illegible], দক্ষিণাস্য থেকে ম-কার, পূর্ব মুখ থেকে বিন্দু ও মধ্যের আনন থেকে নাদের উৎপত্তি যাদের সমাহার হল ওঁঙ্কার—বিশ্ববোধ প্রণব। অ-কারাদির ক্রমানুযায়ী অ-কার থেকে ন-কার, উ-কার থেকে ম-কার, ম-কার থেকে শি, বিন্দু থেকে 'বা' ও নাদ থেকে 'য়' এর সৃষ্টি—এই পঞ্চাক্ষর যে মন্ত্রের সৃষ্টি করছে তা হল—"ওঁ নমঃ শিবায়"।

শিব আরাধনার সার্থকতা

শিবরাত্রি বা সোমব্রতাদি উদ্‌যাপন অথবা নিত্য শিবার্চনা করা আমাদের স্বরূপোলব্ধির সহজতম পথ যার মাধ্যম চিন্ময়ী মহাশক্তি (যাঁকে শিব লহরিত করছেন আবার গুটিয়ে নিচ্ছেন) আমাদের আত্মশক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান পরমকাঙ্ক্ষিত মহান সত্যের জ্যোতির্লোকে। এই শিবারতি যদি ক্ষণকালের জন্যও করা হয় তা হলেও বহির্বিষয় হতে সুখ আহরণে বিরত থেকে ক্ষণকালের জন্য হলেও, মন শিব ভাবনায় একাগ্র হয়ে বহির্বিশ্বের সংস্পর্শ ছাড়াও অনাস্বাদিত আনন্দের আস্বাদ পায়। তখন তার দৃষ্টি যায় অন্তরের ভাঁড়ার ঘরে যে আনন্দময় পুরুষ সমাসীন তাঁর দিকে। সেই আনন্দময় পুরুষই হলেন মানুষের নিজ স্বরূপ আর তিনিই শিব। এই সত্য দৃষ্টি ও আনন্দের আস্বাদন একবার লাভ হলে সেটাই আমাদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে

গ্রন্থপঞ্জী

	পুস্তকের নাম		লেখকের নাম/প্রকাশন সংস্থা
১।	শ্রীশ্রীবদরীকেদার মাহাত্ম্যম্	—	স্বামী জ্ঞানানন্দ ভারতী।
২।	ঋগ্বেদ সংহিতা	—	রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত ও সম্পাদিত (২য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯০৯।)
৩।	যজুর্বেদ সংহিতা	—	হরফ প্রকাশনী কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত।
৪।	শিব পুরাণম্	—	
৫।	লিঙ্গ পুরাণম্	—	
৬।	স্কন্দ পুরাণম্	—	
৭।	পদ্ম পুরাণম্	—	
৮।	বাংলায় ভ্রমণ (১ম ও ২য় খণ্ড) ১৯৪০	—	পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে প্রচার বিভাগ।
৯।	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	—	বিনয় ঘোষ
১০।	মন্দিরময় ভারত (৩য়)	—	অপূর্বরতন ভাদুড়ী।
১১	বাংলার মন্দির	—	পঞ্চানন রায়।
১২	পুরাতনী (১ম)	—	হরিহর শেঠ।
১৩	বাংলার পাল পার্বণ	—	উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।
১৪	রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড)	—	
১৫	বৃহৎ বঙ্গ	—	দীনেশচন্দ্র সেন।
১৬	তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব	—	
১৭	The history of the rise of Mohamedan Power in India.	—	Furishtah (Translated by Brigs)
১৮।	Early Wooden Temples of Chamba.	—	Hermann Goetz.
১৯।	Indian Historical Quarterly— (Vol II, March 1932, No 2 P-143)		
২০।	Hindu Civilization (2nd Indian edition, 1950, P-10)	—	ডাঃ রাধাকুমুদ বন্দ্যোপাধ্যায়
২১।	সত্য দর্শন	—	কালিকানন্দ স্বামী।
২২।	চণ্ডীমঙ্গল কাব্য	—	কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

পুস্তকের নাম		লেখকের নাম/প্রকাশন সং
২৩। শিবায়ণ	—	রামেশ্বর চক্রবর্তী।
২৪। প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় (কথায় ও চিত্রে)	—	হরিহর শেঠ।
২৫। মুর্শিদাবাদ কথা	—	শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২৬। বাংলার সাধনা	—	ক্ষিতিমোহন সেন।
২৭। দেবী ভাগবত	—	
২৮। বাংলার পাল পার্বণ	—	চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।
২৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	—	সুকুমার সেন।
৩০। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী	—	স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।
৩১। বায়ুপুরাণ	—	বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা
৩২। মহাভারত	—	কাশীরাম দাস।
৩৩। তীর্থ দর্শন	—	বরদা বসু।
৩৪। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ	—	মন্মথনাথ দে।
৩৫। শ্রীবদ্রিনাথ কেদারনাথ	—	জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩৬। মধ্যভারত	—	জলধর সেন।
৩৭। মণি মহেশ	—	উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
৩৮। উদ্বোধন পত্রিকা ৫৩ তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা কার্তিক ১৩৫৮	—	
৩৯। উপাসনা রহস্য	—	শ্রীধরচন্দ্র ভক্তিরত্ন সিদ্ধান্ত
৪০। স্তবকবচ মালা	—	বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৩৩৪
৪১। বেদ পুরাণ সম্মত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস	—	গৌর গোবিন্দ গুপ্ত।
৪২। উদ্বোধন পত্রিকা ৫৮ তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ১৩৬৩।	—	
৪৩। শ্রীশ্রী তারকেশ্বর	—	সুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
৪৪। The Art of Indian Asia		